দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে
সি পি এম অনুপ্রবেশ!

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

জুলাই ১৯৮৮, মূল্য ৮.০০

জাতিস্মর দোলনচাঁপাকে দিয়ে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত?

বিতর্কে:
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
বনাম দশ জন
বিজ্ঞানী

এলাহাবাদের
ঐতিহাসিক নির্বাচন

নির্বাচনী ফল ও
সর্বভারতীয় রাজনী
ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ
যাত্রা
ভিসা পাসপোর্ট
কেলেঙ্কারি

আনিলাম
অপরিচিতার নাম:
সোনম

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

নিখুঁত তুমি সৌন্দর্য্যে মোড়া

অনন্য অন্তরে

অনন্য বাহিরে

কোয়ার্টজ্

ভারতের সর্ব্বাধিক বিক্রীত কোয়ার্টজ্ ঘড়ি

R K SWAMY/HAL/5827/BEN

আপনার সন্তানকে
বুদ্ধিমান করে তুলুন
ওকে দিন
চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক
(ছয় খণ্ডে)
সাফল্য আর জনপ্রিয়তার নতুন ধারা সৃষ্টিকারী এক অপরিহার্য শিক্ষামূলক সিরিজ
এই বই শিশুর মস্তিষ্কে টনিকের মতো কাজ করে
যে-মুহূর্তে একটি শিশু চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার মনে জাগতে থাকে কৌতূহল। তার চারপাশের এই সুন্দর পৃথিবী সম্পর্কে জমা হতে থাকে নানান বিস্ময়। তার মনে 'কীভাবে' আর 'কেন' — এই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করে। সে এসব প্রশ্নের উত্তর চায়, কিন্তু সহজে পায় না। সঠিক সময়ে প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে গেলে তার জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায়। তার মন হয়ে ওঠে আরও উৎসুকী; উপলব্ধি করার ক্ষমতাও বেড়ে ওঠে, তাকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে। অন্যদিকে, প্রশ্নগুলির উত্তর না পেলে তার বুদ্ধি ভোঁতা হতে শুরু করে। তখন সে বিষয়টি না বুঝেই মুখস্থ করতে শুরু করে দেয়। এর ফলে তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
বৈশিষ্ট্য :
৬ খণ্ডের একটি সেটে আছে—
১৩০০ বড়ো সাইজের পৃষ্ঠা
১১০০ ছবি
৫,০০,০০০ শব্দ
১০৫০-এরও বেশি 'কীভাবে' এবং 'কেন' আর
সেটটি ভরা আছে একটি
গিফট বক্সে
PRICE:
Paperback Student Edition: Rs. 24/- each
Postage: Rs. 4/- each
Full Set: Rs. 144/- Postage Free
Hard Bound Gift Edition: Rs. 30/- each
Postage: Rs. 5/- each
Full Set: Rs. 180/- Postage Free
Also available in English.
Six Vols. Price same
'র‍্যাপিডেক্স' ইংলিশ স্পীকিং কোর্স
3,00,00,000
তিন কোটিরও বেশি
পাঠকের পছন্দ
New Addition
LETTER
WRITING
মূল্য 30/-
ডাক মাশুল
5/- অতিরিক্ত
It's really a good book to learn spoken English —Kapil Dev
কনভেন্ট স্তরের 'শুদ্ধ ও অনর্গল ইংরাজী' শেখাবার এমন বই —যা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যাকে সমাজের সর্বস্তরের এবং সব ভাষাভাষি লোক আপন করে নিয়েছে।
Price
Rs. 15/-
Postage
Rs. 4/-
each
101 সাইন্স গেমস
যখন শিশুরা বিজ্ঞানের সাধারণ ও সহজ সূত্রগুলি শিখছে অন্যদিকে তারা সঙ্গে সঙ্গে এও শিখছে রকমারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার বিধি যেমন ব্যারোমিটার, বৈদ্যুতিক চুম্বক, হেক্টোগ্রাফ, বাষ্প চালিত টারবাইন, ইলেকট্রোস্কোপ ইত্যাদি।
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
একটা মজার ব্যাপার কোন পার্টিতে, জলসায়, ঘরোয়া জমায়েতে অথবা ভ্রমণকালে কেড়ে নেওয়ার জন্য নতুন মজাদার হাত সাফাই-এর খেলা দেখিয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আনন্দ দাও।
বাংলা হিন্দী
লার্ণিং কোর্স
Price 30/-
Postage
Rs 5
AVAILABLE at leading bookshops, A.H. Wheeler's and Higginbothams Railway Book Stalls throughout India or if not available ask by V.P.P. from:
PUSTAK MAHAL
Khari Baoli, Delhi-110006
Show Room: 10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi-110002.

তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা জুলাই ১৯৮৮

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপসম্পাদক: হাবিব আহসান
গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দ্রাবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সচ্চি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিসুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি
অঙ্গসজ্জা: অপূর্ব গোস্বামী
দিল্লি কার্যালয়:
কে·এল· তলোয়ার: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৬০৫ রোহিত হাউস, ৩, তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৯২৮৫
টেলেক্স: ০৩১৬১৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ ভুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮৯০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীমান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭ গ্রাম: মায়াকহানি
টেলেক্স: ০১১২৫৫৭ মায়া ইন
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯–৯০৩৫
টেলেক্স: ০২১৫১৭৩
ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক: শুভাশিস মজুমদার
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন: প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪০২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট–সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silcher, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shillong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

পশ্চাদপট ৪১

দক্ষিণেশ্বরের কার পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড়াতেই বিধায়ক অশোক ঘোষ ঘেরাও হলেন চাঁদা আদায়রত কিছু সি পি এম যুবকের। শুধু তিনিই নন-ইদানীং সব পুণ্যার্থীই এমনিভাবে বিড়ম্বিত হচ্ছেন পার্টি চাঁদার জুলুমে। ধর্মমন্দিরেও কি তাহলে অনুপ্রবেশ ঘটল মার্কসবাদের? কি এর ভবিষ্যৎ? এবিষয়ে রামকৃষ্ণের উত্তরসুরীরাই বা কি ভাবছেন? নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

৪২

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যাপক তনয়া দোলনচাঁপা মিত্রের দাবি-তিনি আসলে বর্ধমানের বিখ্যাত দে পরিবারের মৃতপুত্র নিশীথ। তাঁর এই জাতিস্মরতাকে সমর্থন করেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। অথচ যুক্তি তর্কে তাঁর কথা নিতান্তই কথার কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতার দশ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানবেত্তা প্রবীর ঘোষ। দোলনচাঁপা-কাহিনী, বিজ্ঞানবাদীদের যুক্তি এবং তথ্য নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

বিশেষ প্রতিবেদন

৯৪

গত এক মাস ধরে শুধু সারা দেশই নয় বিশ্বের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক আর মিডিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এলাহাবাদের দিকে। শ্রীমতী গান্ধীর এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে পরাজয় থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের নতুন রাজনৈতিক ইতিহাস। আর এবার? ভি·পি·সিং-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত বিরোধী ঐক্য কি এই ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলের পর ভারতের রাজনীতিকে এক নতুন মোড় দিতে চলেছে?

গত সংখ্যায় আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনী 'সতী-অসতীর ধর্মদ্বন্দ্ব' আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে, এই পুরুষশাসিত সমাজের কাছে, কতগুলো জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল। নারীর প্রতি যুগযুগান্তবাহী অবহেলা আর অবিচারের ধারাবাহিকতাকে ধর্মের প্রলেপ লাগিয়ে যেভাবে সমাজমান্য করে তোলেন আমাদের ধর্মীয় আর সামাজিক গুরুমশাইয়েরা, তার প্রতি সাহসী প্রতিবাদ উত্থাপন করেছিলাম আমরা। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠিতে সেই প্রচেষ্টার প্রতি অভিভূত সমর্থন পেয়েছি আমরা। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল।

বর্তমান সংখ্যা 'আলোকপাত'-এর প্রচ্ছদ-কাহিনীতে আমরা একটি অন্যতর বিষয়ের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করার চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন দার্শনিক–আধিভৌতিক প্রস্তাবনার আভাস পাই সমাজের বিভিন্ন সম্মানীয় মহল থেকে। এরকমই একটি ঘটনা জন্মান্তর, পুনর্জন্ম এসবকে জড়িয়ে ঘিরে আছে আমাদের সংস্কারকে। সম্প্রতি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈকা তরুণীকে বর্ধমানের এক মৃত কিশোরের জন্মান্তর বলে দাবি করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠবর্গ। এই বিষয়কে সমর্থন করেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা আর বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীরা এই দাবিটিকে মানতে নারাজ। তাঁরাও শানিয়েছেন তাঁদের যুক্তিবাণ। দুই পক্ষের বক্তব্যকেই বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করে আমরা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি—এই জন্মান্তরবাদের তত্ত্বের মূলে কি আছে, যুক্তি না অন্ধবিশ্বাস! এই বিতর্কে পাঠকদেরও রইল সাদর আমন্ত্রণ।

এলাহাবাদের উপ-নির্বাচন ভারতের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে একটি বহুচর্চিত বিষয়। এই নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের অভূতপূর্ব বিজয় শাসক কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে এক শক্তিশালী প্রতিবাদ। এই বিজয়কে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি অন্যতর মোড় নিতে চলেছে? এ বিষয়ে একটি সরজমিন বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে এই সংখ্যায়।

রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অনুপ্রবেশ ঘটেছে রাজনীতির। তীর্থভূমিতে রাজনীতির এই আকস্মিক প্রকাশে ভক্তজনেরা বিব্রত, অসন্তুষ্টও। এ ব্যাপারে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ, পুরোহিতবর্গ আর রামকৃষ্ণদেবের উত্তর পুরুষেরা কি বলেন? এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ ডেপুটি–হাইকমিশনকে ঘিরে সম্প্রতি উঠেছে বিতর্ক। এক সঙ্গে ডেপুটি হাইকমিশনার সহ ১৮ জন দূতাবাস কর্মচারীর বদলি বা চাকরি রদ কিসের ইঙ্গিত? ভিসা-পাসপোর্ট কেলেংকারির এক অজানা দিক উন্মোচন করেছেন আমাদের প্রতিবেদক।

এছাড়া সাংসদ নারায়ণ চৌবেকে কেন্দ্র করে সি·পি·আই–সি·পি·এম-এর কাজিয়ার পটভূমি, ট্রাভেল এসেন্সিগুলির পর্যটনকে ঘিরে প্রতারণা, নবোদ্ভিন্ন অভিনেত্রী সোনমের অন্তরঙ্গচারণা আর এবছরের চলচ্চিত্রের সর্বভারতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলোকে নিয়ে একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন এই সংখ্যায় আমাদের সংখ্যায় আমাদের সংযোজন।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস পেরিয়ে এখন বৃষ্টিমন্দ্রিত আষাঢ়ের অঙ্গনে আমাদের পাঠক-পাঠিকারা। বহু যুগের ওপার থেকে আসা আষাঢ় কত বেদনার, কত স্মৃতির, কত পুলকের তন্ময়তাকে ঘিরে রাখে। আষাঢ় তো সম্ভাবনার আর প্রতিশ্রুতিরও মাস। 'আলোকপাত'-এর শুভানুধ্যায়ীদের কাছেও আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি রইল।

আলোক মিত্র

দৈবানুগ্রহের মূলে আছে কুসংস্কার

'কলকাতার অতিলৌকিক মানুষজন' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদনে রমাপ্রসাদ ঘোষাল যে সব অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট তুলে ধরেছেন তা বাস্তব সত্য এবং ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন এর শিকড় কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের অন্তরালে।

প্রযুক্তিগত বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষার আলোয় মানুষের যখন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হচ্ছে তখন এ ধরনের অতিলৌকিক দৈব ওষুধের ও তাবিচ কবচের প্রতি তাদের আকর্ষণ কি করে এমন দুর্বার হয়ে ওঠে তা বোঝা যায় না। যুক্তি বুদ্ধি ও শিক্ষার এমন পরাজয়, হার স্বীকার সত্যি ভাবা যায় না। তাতেই মনে হয় মানুষ যতই শিক্ষাদীক্ষা লাভ করুক, বিজ্ঞানে উন্নত হোক না কেন তার কুসংস্কারের শিকড় এখনও তার মর্মমূল থেকে ছিন্ন হয় নি।

অবশ্য এই কুসংস্কারের মূলে মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থও যে লুকিয়ে নেই তাই বা বলি কি করে। যারা ধনী শ্রেণী তারা মুনাফা লোটার আশায় দৈব ওষুধ তাবিচ কবচ, বিভিন্ন রত্নের আশ্রয় নিতে আগ্রহী। যা সহজ উপায়ে হচ্ছে না তা যদি অতিলৌকিক, দৈব উপায়ে সম্ভব হয় বিনা পরিশ্রমে, আয়াসে তাহলে তার চাইতে সহজ উপায় আর কি আছে। আর কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ নিজেদের পাপ কাজ হালকা করার জন্য এবং অন্যায় কাজ করেও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে গরীব মানুষকে শোষণ করার জন্য দৈব অনুগ্রহ প্রার্থী হয়।

সাধারণ নরনারী রোগভোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ও শেষে উপায়ান্তর না দেখে এই অতিলৌকিক পথে অগ্রসর হয় অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে। এর জন্যে তাদের বাস্তব জীবনে কম খেসারৎ দিতে হয় না। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৈব ওষুধ প্রভৃতির আশ্রয় নিতে গিয়ে কত স্ত্রীকে অর্থ, অলংকার ছাড়াও ইজ্জত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে তার হিসাব কে রাখে।

কিন্তু তবুও আমরা কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে অন্ধের মত বাঁচার পথ খুঁজে মরছি।

শিরোনামে অবহেলিত বত্রা

এই তো কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছেন ডঃ রবি বত্রা। যিনি বর্তমানে আমেরিকার সংবাদ তথা অর্থনীতির শিরোনামে আছেন। যে কারণে তিনি শিরোনামে আছেন তাহল 'দি গ্রেট ডিপ্রেসান অফ ১৯৯০' এই বইটি আমেরিকা তথা বিশ্বের বাজারে সব চাইতে বেশি বিক্রিত বই। এই বইতে তিনি মার্কিন তথা বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কে কতগুলি অভাবনীয় ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ও তার সমাধানের জন্য উপায়ও বলেছেন। তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক। যার সমাদর মার্কিন মুলুকে সবচাইতে বেশি একজন উচ্চ স্তরের অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে।

সেই অর্থনীতিবিদ্ যিনি মার্কিন মুলুকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, যখন ভারতে তিনি এক অর্থনৈতিক সংস্থার আমন্ত্রণে আসেন তখন ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলি এর যথাযথ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করেনি। কিছু সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে দায় সারা গোছের সংবাদ পরিবেশন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যার নাম বর্তমানে বিশ্বের নামকরা সব সংবাদ শিরোনামে, ভারতীয় সংবাদপত্রে তার যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়নি। আর সব চাইতে বড় কথা, 'প্রাউট' দর্শনের উপর ভিত্তি করে যে বইটি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করল সেই দর্শন সম্পর্কেও কিছু লেখা হয়নি।

তাই আমি আশা করি যে 'আলোকপাত'-এর মত নির্ভিক ও নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে তার যথাযথ ও গুরুত্ব সহকারে আগামী সংখ্যায় মহান দার্শনিক ও বিশ্বের সেরা অর্থনীতিবিদ্ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে নিরপেক্ষতা ও বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় বজায় রাখবে।

শ্যামল কান্তি রায়
চড়িলাম, পশ্চিম ত্রিপুরা

কলকাতার অতিলৌকিক মানুষজন

গত মে ১৯৮৮ সংখ্যায় বিশেষ প্রতিবেদনে কলকাতার অতিলৌকিক মানুষজন প্রসঙ্গে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসনীয়। তবে এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদকের উপযুক্ত সংযোগ ও আলোকপাতের অভাববোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের মনে হয় প্রতিবেদক বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি যোগাযোগ তথা সঠিক অনুসন্ধান ছাড়াই তথ্যের পরিবেশন করেছেন। যেমন দরগাহ শব্দটির প্রকৃত তত্ত্বের মূল্যায়ন হয়নি। কারণ প্রতিবেদক দরগাকে পীরের তথা পীরের বংশধরদের বাসস্থান কোথাও কর্মক্ষেত্রকে দরগা চিহ্নিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। যেমন, ফুরফুরা পীরের দরগা প্রসঙ্গে পার্কসার্কাস, তা তাঁর বংশধরদের বাসস্থান সেই ভুল তথ্যই দেয়। খিদিরপুরের পীর, হজরত মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী ওয়সীরে) প্রসঙ্গে তাঁর দরগা ডেন্ট মিশন রোডের কর্মক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আদৌ তাঁর দরগা নয়, সেখানে সেন্ট বার্ণাবাস হাইস্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। আসলে ফুরফুরার পীর হজরত আবু বাকার সিদ্দিকীর মাজার শরীফ (সমাধি) ফুরফুরা শরীফ, আর হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী ওয়সীরে) মাজার শরীফ কান খুলী পীর ডাঙ্গায় কলিকাতা-৬৬।

আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল এ ধরনের প্রতিবেদনে। যাঁর মাজার শরীফ কলকাতা মানিকতলাতেই। যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বহু পীর এই উপমহাদেশে খ্যাতির শিখরে, কলকাতা মানিকতলা ২৪/১ মুনশী পাড়া লেনে ১০০ বৎসরের অধিক যাঁর মাজার শরীফ বিরাজমান। তিনি হচ্ছেন হজরত মহম্মদ (ছাঃ) এর বংশধর কুতুবুল এরশাদ রসুলে নোমা পীর শাহ সুফী সৈয়দ ফতেহ আলি ওয়সীরে)। ফুরফুরা পীর সাহেব যাঁর শিষ্য ছিলেন।

ভক্ত ও ওয়সী মেমোরিয়াল
এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে
শেখ মহম্মদ আলি
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

ছাত্রাবাস-প্রতিবাদপত্র

আপনার পত্রিকার গত (তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মে ১৯৮৮) সংখ্যায় 'কলকাতার ছাত্রাবাসগুলি কি অপরাধী তৈরির আড়ৎ হয়ে উঠেছে?' শীর্ষক প্রতিবেদনে আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি বলে যা ছাপা হয়েছে তা সত্যের অপভ্রংশ। প্রতিবেদকের মর্জি মাফিক আমার বক্তব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ বিভিন্ন জায়গায় জুড়ে বক্তব্যের মূল সুরটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে। আমার মূল বক্তব্য ছিল যে, 'ছাত্র পরিষদ সংসদে থাকাকালীন কলেজে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এস·এফ·আই সংসদে এসে ছাত্র শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে কলেজে আবার শিক্ষার সুস্থ পরিবেশে ফিরিয়ে আনে। এ ঘটনার সাক্ষী আশুতোষ কলেজের সমস্ত সাধারণ ছাত্র, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা।' এই মূল বিষয়টির অনুপস্থিতি আশুতোষ কলেজের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ এবং উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। বিগত দু'বছরে সংসদের ২৮টি আসনের ২৮টিতেই এস·এফ·আই-র জয় আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

আশা রাখি, সাম্রাজ্যবাদীদের হীন চক্রান্তে তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ ছাত্রকে যেখানে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তার বিপরীতমুখী স্রোতে দাঁড় টানছে আশুতোষ কলেজ সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে দাঁড়ানো ছাত্ররা, এই তথ্য প্রকাশ করে আবার আপনাদের প্রচেষ্টার সততার পরিচয় দেবেন।

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

প্রতিবেদকের বক্তব্য:

কলকাতার ছাত্রাবাসগুলি কি অপরাধী তৈরির আড়ৎ হয়ে উঠেছে? এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি সকল সমাজ সচেতন ব্যক্তির বিলক্ষণ জানা আছে। বিশেষ করে কলকাতার ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের। আশুতোষ কলেজ ইউনিয়নের জি·এস তাঁর কলেজ ও হোস্টেল সম্পর্কে যে প্রতিবাদ তুলেছেন আমার প্রতিবেদনে তাই লেখা হয়েছে। আমার মনে হয় তিনি যা বলছেন আমার লেখায় তার অর্থগত কোন তারতম্য আছে কিনা দেখা উচিত। তবে দুঃখের বিষয় কলেজ-হোস্টেলের বর্তমান পরিবর্তন প্রসঙ্গে এস এফ আই-র প্রশস্তি পাওয়া হয়নি। হয়নি কারণ আমার প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অপ্রাসঙ্গিক বলে। হাল আমলে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ছাত্র-ইউনিয়ন, অধ্যাপক ইত্যাদির মধ্যে যে ঘোরতর অবক্ষয়ের শুরু হয়েছে, এই মুহূর্তে অন্তত তার ৫১টি প্রমাণ দেখানো যায়। যার একটি ইউনিয়নগুলি নিজ নিজ আত্মতুষ্টিতে ব্যস্ত।

তবে আশুতোষ কলেজের সকল ছাত্রদের বলে রাখি, সেই আগেকার পরিস্থিতি এখন আর নেই। এবং এই সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ যাতে গড়ে ওঠে, আমার প্রতিবেদনের আসল লক্ষ্য তাই।

তাপস মহাপাত্র।

যোগানন্দ সর্বতীর্থ: পুনর্জন্মের দাবিদার

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব হয়েছে!
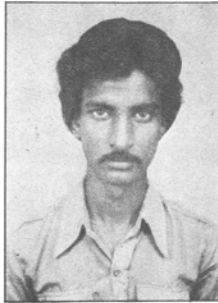
'বর্ধমান জেলায় শ্রী শ্রী মা সারদামণির ভবিষ্যৎবাণী সফল করতে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুনর্বার জন্ম নিয়েছেন সপারিষদ।' কোর্টে এফিডেফিট করে এই দাবি প্রামাণের দায়িত্ব নিয়েছেন বর্ধমানের কিছু দায়িত্বশীল মানুষ। শুধু বর্ধমানই নয় মুর্শিদাবাদ জেলাতেও নাকি এই পুনরাবির্ভাবের প্রমাণ মিলবে। শ্রীরামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম বিতর্কের সত্যানুসন্ধানে আলোকপাতের চাঞ্চল্যকর সরজমিন রিপোর্ট।

নীহাররঞ্জন মাজি: দাবী এরও

যুগাবতার শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব কি বর্ধমান জেলার কোন স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন? এই প্রশ্নটি বেশ কিছুদিন ধরে কিছু মানুষের চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগলব্ধ জ্ঞানচক্ষু দিয়ে পরমপুরুষকে সুস্পষ্ট দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। কেউ বলছেন, রামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব হয়েছে এক অংশে। কেউ কেউ বলছেন, চার অংশে। রামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে এঁরা এতটা সুনিশ্চিত যে দু একজন তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য আদালতের এফিডেফিট পর্যন্ত করিয়েছেন। এঁদের বক্তব্য রামকৃষ্ণদেবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা যা বলছি, তা সম্পূর্ণ সত্য, এর মধ্যে এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই। রামকৃষ্ণদেব সংক্রান্ত তথ্যের দাবিদারদের মধ্যে অন্যতম হলেন মৌনযোগী যোগানন্দ সর্বতীর্থ। যিনি বিগত ক'বছর ধরেই তাঁর নানা বক্তব্য লিখে জানাচ্ছেন।

আর একজন, যাঁর নাম ভোলানাথ অধিকারি, স্বয়ং নিজ দেহে নাকি শুধু রামকৃষ্ণদেবই নয়, একই সঙ্গে বামদেবের (সাধক বামাক্ষ্যাপা) অবস্থিতি উপলব্ধি করছেন। যোগানন্দের দিব্যদৃষ্টি বা ভোলানাথের অনুভূতি ছাড়াও বেশ কিছু মানুষ জোর দিয়ে বলেছেন, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব না হলে ধরে নিতে হবে দৈববাণী মিথ্যা। রামকৃষ্ণদেব তাঁর তিরোধানের কিছু দিন আগে শ্রীশ্রী মা সারদাকে বলেছিলেন, আমি ১০০ বছর পরে আবার আসব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভাগবৎ গীতায় অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ধর্মের গ্লানি হইয়া অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও পাপাচার বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।' বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি কি শ্রীকৃষ্ণের বাণীর পরিপন্থী? শ্রীশ্রী মা ঠাকুরের পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে বলেছিলেন–'সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন বলেছেন। বাউল বেশে–পরনে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানা দাড়ি। বর্ধমানে··· ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন–কোনও দিকবিদিক খেয়ালই নাই।' শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের দৈববাণীর পরিপ্রেক্ষিতে মা সারদা স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীকে বর্ধমানে ঠাকুরের পুনর্জন্মলাভ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। শ্রীশ্রী মায়ের এই কথা অবশ্য জ্ঞানাত্মানন্দজী 'শ্রীশ্রী মায়ের কথা' বই-এ লিখে গিয়েছেন (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮ পৃষ্ঠা। প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ৩০ ফাল্গুন)।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের স্ব-ঘোষিত পুনরাবির্ভাবের সময়, শ্রীশ্রী মায়ের স্থান নির্দেশনা–এই দুয়ে মিলে ধর্মপিপাসু মানুষের মনে আরও এক প্রস্থ প্রশ্ন বিছিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেছেন ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ১০২ বছর আগে। তার অর্থ তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী সত্য হলে, ধরে নিতে হবে তিনি ইতিমধ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য অন্য একটা প্রশ্ন এসে যায় তা হল, রামকৃষ্ণদেব ১০০ বছর পরে বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? তাঁর তিরোধানের ১০০ বছর পর, না অন্য কিছু?

সন, তারিখ, ঘটনা, স্থান নিয়ে সংশয় বা দ্বিধা যাই-ই থাক না কেন, বর্ধমানের বেশ কিছু ধর্মপিপাসু মানুষ অটল প্রত্যয়ে জানাচ্ছেন, যুগাবতারের আবার আবির্ভাব হয়েছে। তিনি এসেছেন পাপ আর অনাচারে পূর্ণ দেশকে আবার উত্তরণের পথ দেখাতে। রামকৃষ্ণদেব সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক, অথচ ধর্ম ধর্ম করে দেশ

যখন প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতার দিকে এগোচ্ছে, তখন তিনি কি স্থির হয়ে থাকতে পারবেন? ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, এই হৃদয়ের বৈঠকখানার দরজা খুলে বসে আছেন বর্ধমানের কিছু মানুষ। কে জানে, হয়তো এত চাঞ্চল্যের মধ্যে কোথায় একটি মৌন মূর্তি হয়ে বিরাজ করছেন তিনি। কিন্তু সত্যিই যদি তিনি থাকেন প্রকাশ হবেন কি করে? তিনি তো বদ্ধ ঘরের অন্ধ বাতাস নন, তিনি মুক্তিময়, অনন্তময় সমীরণ। তিনি গুরু গম্ভীর নন, তিনি মেঘমেদুর। তিনি বৈরাগ্যের রাজমুকুট পরে থাকেন না, পরে থাকেন ভালবাসার কণ্ঠমালা। তিনি অর্থী প্রার্থীর গুরুদেব নন, তিনি বঞ্চিত অবহেলিতের বন্ধু। যেখানেই করুণতম ব্যথা, সেখানেই তাঁর মধুরতম গান। সেই গানের রেশ কবে ভেসে আসবে, এই জ্বালা যন্ত্রণার মাঝে শান্তির প্রলেপ হয়ে, সেই আশায় দিন গোনে শুধু বর্ধমানের মানুষ নন, সারা দেশের মানুষ। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছেন, বর্ধমান জেলার কিছু মানুষ। এদের কথা তুলে ধরতেই এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

বর্ধমান মহকুমার জনপ্রিয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'মুক্ত বাংলার' সম্পাদক পুরুষোত্তম সামন্ত যখন এইসব ব্যক্তিদের কথা বলছিলেন, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই গাঁজাখুরি বলে মনে হয়েছিল। এ নিয়ে বেশ কানাঘুসো শুরু হবার পর পুরুষোত্তম সাপ্তাহিক মুক্ত বাংলায় ঘটনার কিছু ইঙ্গিত দেয়। এ নিয়ে আর সে মাথা ঘামায় নি। ঘটনাপ্রবাহ ক্রমশ দ্রুত নানা দিকে মোড় নিতে পুরুষোত্তমই অনুরোধ জানায়, বিষয়টির ব্যাপারে বিস্তৃত তদন্ত ভিত্তিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। মানুষের কৌতূহল বাড়ছে, অকারণে কৌতূহল বাড়তে দেওয়াও ঠিক নয়। অগত্যা বর্ধমানে যেতে হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব হয়েছে কি হয়নি, তা বিচার করার ক্ষমতা বা দৈবদৃষ্টি বর্তমান প্রতিবেদকের নেই, কোন বিতর্ক সৃষ্টি করাও কাম্য নয়। এ সম্পর্কে যে সব তথ্য বা বক্তব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের দেশে এখনও বেশ কিছু দৈবক্ষমতা সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, তারাই সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করবেন। অবশ্য যদি তাঁরা তা মনে করেন।

কথা হচ্ছিল, বর্ধমানে জে কে মিত্র রোডে প্রভাত ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে বসে। প্রভাতবাবুরা দুভাই। অজিত ভট্টাচার্য ও প্রভাত ভট্টাচার্য। প্রভাতবাবু বর্ধমান কালেকটরেটের অ্যাসিস্টান্ট নাজির। প্রভাতবাবুর পূর্বপুরুষ রামভদ্র ন্যায়ালংকার এক সময়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দীক্ষা দেন ও তাঁর কুলগুরু হন। এক সময়ে যশোরের অধিবাসী হলেও কৃষ্ণচন্দ্র রামভদ্রকে জীবিকা নির্বাহের জন্য নদীয়া জেলায় বাহিরগাছি গ্রামে বেশ কিছু জমি দান করেন। প্রভাতবাবু দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গে তন্ত্রবিদ্যার এক গুপ্তধারা দক্ষিণা কালী তন্ত্রের চর্চা শুরু হয়, রামভদ্রের আমলে বাহিরগাছিতেই। প্রভাতবাবুদের বংশের দ্বাদশ পুরুষ ছিলেন মধুসূদন তর্ক পঞ্চানন। মধুসূদন ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর রচিত 'বামা আখ্যানম্' বাংলায় অনুবাদ করেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র। প্রাচীন বিশিষ্ট পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' (৫ আশ্বিন, ১২৮৭)-এ বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। প্রভাতবাবুর পিতা প্রয়াত রামবিহারী ভট্টাচার্য বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য বর্ধমানে চলে আসেন।

ভোলানাথ অধিকারী, ভাবসমাধীতে

সেই থেকেই প্রভাতবাবুরা বর্ধমানের অধিবাসী।

এই প্রভাত ভট্টাচার্য ও আনন্দ গোপাল সাহা (সন্ন্যাসের পর যোগানন্দ সর্বতীর্থ) মা ব্রহ্মানন্দা তীর্থর (ভৈরবী) কাছে যোগতন্ত্র ইত্যাদি সাধন বিদ্যা শিখতে শুরু করেন। যোগানন্দ সত্যানন্দের কাছেও যোগ শিখেছিলেন। মা ব্রহ্মানন্দার পূর্বাশ্রমের নাম স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানেই বাড়ি। সুপরিচিত চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায় তাঁর মামা। ছেলেবেলা থেকেই স্বপ্নার মন পড়ে থাকত ধর্মচিন্তা ও সাধনার দিকে। বিয়েও করেছিলেন যথাসময়ে, কিন্তু সংসারে মন টিকল না। ১৫ বছর আগে স্বামী সংসার ও এক ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। বছর খানেক পরে তাঁর যখন সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, তখন তিনি পুরোপুরি ভৈরবী। পরনে গেরুয়া বসন। কখনও গঙ্গোত্রী, কখনও কামরূপ, কখনও প্রয়াগে তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য টানে মাঝে মধ্যে বর্ধমানে ক'দিনের জন্য আসেন, আবার চলে যান। কালক্রমে প্রভাত ও আনন্দ তাঁর কাছে যোগ শিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রভাতের সঙ্গে মা ব্রহ্মানন্দার যোগ নিয়ে মতানৈক্য হলে তিনি মা'র কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। গৃহীসাধক প্রভাত সংসারজীবন থেকে নিজেকে কোনদিন বিচ্যুত করেননি। অবশ্য তারই চেষ্টায় ও আগ্রহে পরবর্তী পর্যায়ে আনন্দ তথা যোগানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আনন্দগোপাল যোগানন্দ হবার আগে বর্ধমানেই ছিলেন। তিনি ১৯৮৫ সালে স্ত্রী, পুত্র, সংসার ত্যাগ করে মা ব্রহ্মানন্দার গঙ্গোত্রীর আশ্রমে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮৬ সালে শীতের আগে তিনি মা ব্রহ্মানন্দাকে ছেড়ে সমতলে না এসে গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে যান। শীতের পর পাহাড় থেকে নামার সময় তাঁর এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যোগানন্দ জানান, এই সাধু তাঁকে নির্দেশ দেন, তুমি নিচে নেমে যাও। নেমে গিয়ে পৌঁছাও বর্ধমানে, সেখানে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁকে তুমি প্রকাশ করে সারদা মায়ের কথার সত্যতা রক্ষা কর। আনন্দ এবার যোগানন্দ হয়ে বর্ধমানে ফিরে আসেন। মাথায় তখন তার ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল, এক মুখ দাড়ি, পরনে ছেঁড়া আলখাল্লা। এই অবস্থায় তাকে দেখে রাস্তার কুকুর তাড়া করতে আরম্ভ করে। প্রভাত ভট্টাচার্য তখন তাঁকে এনে জে কে মিত্র রোডে প্রয়াত সদানন্দ খাঞ্জার বাড়ির সিংহদুয়ার সংলগ্ন মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৮৬ সাল থেকেই সদানন্দ সর্বতীর্থ মৌন ব্রত অবলম্বন করে আছেন, তাঁর যা বক্তব্য তা লিখে জানাচ্ছেন। যে মন্দিরে যোগানন্দ থাকেন তা প্রতিষ্ঠা করেন সদানন্দ খাঞ্জা। যিনি ছিলেন বাম দেব তথা সাধক বামাক্ষ্যাপার সতীর্থ সন্ন্যাসী। মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। বামদেব এই মন্দিরে অনেকবার এসেছেন। যোগানন্দ কখনও বর্ধমানে থাকেন, আবার কখনও তাঁদের আদিবাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরে চলে যান।

১৯৮৬ সালে গঙ্গোত্রী থেকে মৌনব্রত অবলম্বন করে ফিরে আসার পর লিখিত ভাবে জানান, তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সনাক্ত করতে চান। কিন্তু ঠাকুরের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করলে তবেই তা করা হবে। যোগানন্দের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁকে দিয়ে আদালতের এফিডেফিটের ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে বর্ধমান রাজ কলেজের ছাত্র নীহাররঞ্জন মাঝিও যোগানন্দের কাছে যোগ শিক্ষা করে দৈবদৃষ্টির অধিকারি হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ৫ আগস্ট বর্ধমানের এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এফিডেফিট করে জানিয়েছেন, তিনি গুরুকৃপায় অপ্রাকৃত জ্ঞানচক্ষু অর্জন করেছেন। যদি কোন চক্ষুষ্মান সাধক তাঁর যোগ শক্তির পরীক্ষা চান, তাহলে তিনি বিনা দ্বিধায় পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ শ্রী মাঝিও রামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্ধমানের বহিলা পাড়ায় ভোলানাথ অধিকারি এক সঙ্গে তাঁর দেহে রামকৃষ্ণদেব ও বামদেবের (সাধক বামাক্ষ্যাপা) অস্তিত্ব অনুভব করছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি

কি দাবি করছেন যে একই সঙ্গে এই দুই মহাপুরুষের অস্তিত্ব আপনার মধ্যে রয়েছে। জবাবে উনি বললেন, দাবি বলবো না, ওটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভোলানাথ অধিকারিকেই কয়েকজন 'মুক্ত বাংলা'র অফিসে এনেছিলেন। বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। কাঁচা পাকা এক মুখ গোঁফ দাড়ি। মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা। পরনে আলখাল্লার ধাঁচে সাধারণ কাপড়ের পাঞ্জাবী ও জড়ানো ধুতি। ভোলানাথ জানান, তিনি সংসারে থেকেই সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে চলেছেন। অর্থাৎ তিনি সংসারের ঘানি টানছেন। অথচ মন পড়ে আছে ঈশ্বরের দিকে, জনক রাজার মত। জীবিকা নির্বাহের জন্য তেঁতুলতলার মোড়ে তাঁকে বাপ-ঠাকুর্দার চায়ের দোকান চালাতে হয়। কাউকে দীক্ষা না দিলেও তিনি নামগান প্রচার করেন। নামগান প্রচারই তাঁর দীক্ষা দেওয়া। এই নামগানের মূল কথা হল, জয় তারা, জয় রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

ভোলানাথ জানালেন, প্রায় সব সময়ই তিনি মনে মনে জপ করেন। তাঁর কথায়, এই তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে ঈশ্বরের দিকে।

কথার ফাঁকে তাঁকে সিগারেট দেওয়া হল। খেলেন। চা চাইছিলেন, স্লুটি এল, তাই-ই খেলেন। তিনি স্বয়ং এবং আরও দু একজন জানালেন, মাঝে মধ্যেই ভোলানাথ অধিকারির ভাবসমাধি হয়। দেহ নিশ্চল হয়ে যায়, রামকৃষ্ণদেবের ভাব সমাধির সময় যেমন হাতের মুদ্রা হয়, তেমনি হয় তাঁর। ভোলানাথের কথায়, কোন ডাক্তারকে দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করালে তিনি বিনা দ্বিধায় সে পরীক্ষায় সম্মুখীন হবেন। ভাবসমাধির সময় তিনি বুঝতে পারেন তাঁর দেহে একযোগে রামকৃষ্ণদেব ও বামদেবের আবির্ভাব হয়েছে। ভোলানাথকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি দীক্ষিত?

উত্তর: হ্যাঁ, তারাপীঠের শ্রীমৎ তারাযোগী মনিবাবা আমার গুরুদেব। বছর খানেক হল তিনি দেহ রেখেছেন।

প্রশ্ন: সংসারে আপনার কে কে আছে?

উত্তর: আমি, আমার স্ত্রী ও এক মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন: আপনার স্ত্রীও কি আপনার মত দীক্ষিত?

উত্তর: হ্যাঁ, তিনি আমার সাধন-সঙ্গিনী।

প্রশ্ন: কিভাবে মনিবাবার সংস্পর্শে এলেন? উত্তরে ভোলানাথ যে কাহিনীটি শোনালেন তা শোনা যাক।

'ছেলেবেলা থেকেই ভগবৎ প্রসঙ্গে আমার আকর্ষণ ছিল। প্রায় ৯-১০ বছর আগে আমার মন ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রচণ্ড ব্যাকুল হয়ে উঠল। সংসারের কোন কাজে মন লাগে না। সাধু সন্ন্যাসী দেখলে ছুটে যেতাম, একটা পথ খুঁজে পাবার জন্য। কিন্তু এমন একজনকেও পাচ্ছিলাম না, যিনি আমায় ঈশ্বর দর্শনের পথ বাতলে দিতে পারেন। স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগলাম। এলাম তারাপীঠে। বেশ কিছু সাধুর দর্শন হল, কিন্তু মনের
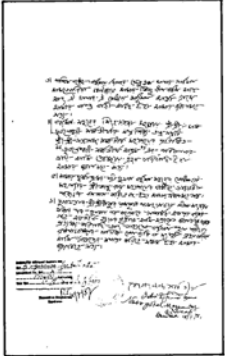
কোর্টের এফিডেভিট

ভোলানাথ অধিকারিকেই কয়েকজন 'মুক্ত বাংলা'র অফিসে এনেছিলেন। বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। কাঁচাপাকা এক মুখ গোঁফ দাড়ি। মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা। পরনে আলখাল্লার ধাঁচে সাধারণ কাপড়ের পাঞ্জাবী ও জড়ানো ধুতি। ভোলানাথ জানান, তিনি সংসারে থেকেই সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে চলেছেন। অর্থাৎ তিনি সংসারের ঘানি টানছেন। অথচ মন পড়ে আছে ঈশ্বরের দিকে, জনক রাজার মত।

যোগানন্দ সর্বতীর্থের লিখিত উত্তর:

যোগানন্দ সর্বতীর্থের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পেতে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে কিছু নমুনা দিলে তা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রশ্ন: সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ কি?

উত্তর: সিদ্ধ পুরুষ কোন পরিবারে বোবা-কালা এবং প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগীর মত। তার কোন বিকার থাকে না। যেমন তার এক ছেলে এসে বলল, বাবা আমি লটারীতে ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছি। বাবা নিশ্চল হয়েই থাকবে। আবার খুব দুঃখের কথা শোনালে একই অবস্থা। সে দিলে খাবে, না দিলে খাবে না। এমন যার অবস্থা সেই-ই সিদ্ধপুরুষ।

প্রশ্ন: সন্ন্যাস কি?

উত্তর: সন্ন্যাস হচ্ছে নিজেকে নাশ করে দেওয়া। তার নিজের বলতে বাস্তব জীবনে কিছু থাকবে না। অধ্যাত্মিক জগতের শেষ দীক্ষা হল সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের পর আর দীক্ষা হয় না। তার আর কোন কিছুর ওপর আকাংখা থাকে না। তার কারণ সে তো সমস্ত কিছুই ভোগ করে ত্যাগ করেছে। সব কিছু সাধনা করে সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়েছে। তাকে তো আর কিছু করতে হবে না। শুধুমাত্র জয় রাম, জয় রাম করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে। এক জায়গায় তিনরাত্রি বাস করবে না। করলেই ওই জায়গার প্রতি তার মোহ এসে যাবে।

প্রশ্ন: গুরুর কর্তব্য কি?

উত্তর: গুরুর কর্তব্য হচ্ছে মনরূপী শিষ্যের আজ্ঞা পালন করে যাওয়া, আর ক্ষণরূপী শিষ্যকে সৎ ভাবে চালনা করা।

প্রশ্ন: আপনি কে?

উত্তর: আমি বলতে এখন বর্তমানে আমাকে যা দেখ তা একটা ফুটবল। যার আকার গোল। ভেতরটা ফাঁকা জায়গা। অর্থাৎ শূন্য। তার মানে আমি বলতে এখন কিছুই নাই। ছিল, যতদিন আমি আমাকে জানতে বা চিনতে পারি নাই। ৫ বছর আগে ছিল। তখন আমি ছিলাম। যখন আমার মা-বাবা বা আত্মীয় স্বজন আমার নাম রেখেছিল আনন্দগোপাল। আমার মা-বাবার তিনটি কন্যা হবার পর আমি জন্মেছিলাম, তাই সকলের খুব আনন্দ হওয়ায় আমার নাম রেখেছিল আনন্দগোপাল। আমার বাবা ছিলেন জাতিতে কলু। তাই আমার উপাধি ছিল সাহা। আনন্দগোপাল সাহা নামে এক ব্যক্তি। পাঁচ বছর আগে জানা গেল, আমি বলতে কিছু নাই, সব ফাঁকা। শুধু মিছামিছি 'আমার', 'আমার', 'আমি', 'আমি' করে মরি। একটু ভেতরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে, দূর ছাই, একটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে কিছু নাই, শুধু একটা নীল আভাস। তাই আমি বলতে বুঝি আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎকে, যাকে বলে আত্মা। বৈজ্ঞানিক জগতে বলে শক্তি, একটা জ্যোতি। বাস্তব জগতে বলছে আমি।

'আইনসম্মত' দাবী

যোগানন্দ সর্বতীর্থ রামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষ করছেন বলে জানিয়েছেন, ভোলানাথের নিজের মধ্যেই রামকৃষ্ণানুভূতি হচ্ছে। কিন্তু সময়ের হিসাবে কিছু কিছু জটিলতা দেখা দিচ্ছে। রামকৃষ্ণদেবকে ঘিরে যে সব শিষ্য অবস্থান করতেন তাঁরা সবাই এক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। অনেকটা পূর্ণিমার চাঁদের পাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মত। ভোলানাথের তেমন কেউ নেই।

ব্যাকুলতা দূর হল না। হঠাৎ বামা মিশনের কাছে এসে আমার পা যেন আটকে গেল। দেখলাম, কিছুদূরে এক আশ্রমে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বামন সাজছেন। তিনি আমার দিকে তাকাতে, সারা শরীরে এক অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। মনে হল, আমি যাঁকে খুজছিলাম তাঁকে পেয়ে গেছি। উনি ইশারায় আমায় ডেকে উঠানে বসতে বললেন। আমি ও আমার স্ত্রী তাঁর আশ্রমের উঠানে বসলাম। বামন সেজে তিনি এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। একের পর এক তিনি উপদেশ ও তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ওই জায়গায় আরও কয়েকজন এলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সুপরিচিত পালাকার শম্ভু বাগ। শম্ভু আমার পুরনো বন্ধু। সে জিজ্ঞাসা করল, তুই এখানে? আমি বললাম, শান্তির সন্ধানে এসেছি। একটু পরে কারণ এল। বাবা নিজে হাতে তা ধরলেন না, বা কাউকে দিলেন না। আমরা ভাগাভাগি করে খেলাম। একটু পরে দেখলাম শংকর ক্ষ্যাপা (সাধক শংকর) কিছুদূর দিয়ে যাচ্ছেন। সবাই তাঁর পিছু পিছু যাবার জন্য উঠে পড়লো। আমি বাবাকে বললাম, যাব? বাবা বললেন, ইচ্ছে হলে যা। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই ফিরে এলাম। বাবা হাসলেন।

এরপর মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। মনটা কেমন যেন বাড়িতে ফেরার জন্য আকুল হল। বাবাকে বললাম, আমি বাড়ি যাব। বাবা, চশমাটা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাড়ি যাবি? কোথায় তোর বাড়ি? এরপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমার বাড়ি যেতে নিষেধ করছেন। মনকে শক্ত করে উঠে পড়লাম। আশ্চর্যের ব্যাপার কোন হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না। এ জিনিস এখানে হয় না। অতি কষ্টে একটি হোটেলে যদিও ভাত পাওয়া গেল কিন্তু খাবার সময়, জলের গ্লাসটি আপনিই উল্টে গেল ভাতের ওপর। আর খাওয়া হল না। বাসের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বাস পাওয়া গেল না। শুনলাম, কাছাকাছি কোথায় জ্যোতি বসুর মিটিং আছে, তাই বাস চলছে না। জেদের বশে রামপুরহাট পর্যন্ত হাঁটিতে হাঁটিতে এসে, বর্ধমানে আসার ব্যবস্থা করলাম। দীক্ষা নেওয়া হল না।

বাড়িতে এসে মন আবার অস্থির হল। স্ত্রী বললেন, তুমি দীক্ষা নিলে না কেন? আমি বললাম, আমি ওখানে দীক্ষা নেব না, উনি যদি আমায় বাড়িতে এসে দীক্ষা দিয়ে যান, তবেই আমি দীক্ষা নেব। আশ্চর্য, কদিন পরেই মনিবাবা আমার বাড়িতে এসে বললেন, তোকে দীক্ষা দেব। যা স্নান করে আয়। আমি বাথরুমে স্নান করতে গেলাম। স্নান করতে করতে হঠাৎ উজ্জ্বল মূর্তির দর্শন হল। আমি প্রায় অর্ধচেতন হয়ে পড়লাম। সম্বিত ফিরতেই বাবার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমি বুঝেছি, তুমি কে। বাবা কিছু বললেন না। শুধু হাসলেন। আমার আর স্ত্রীর দীক্ষা হয়ে গেল। বাবা ফিরে গেলেন।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বাবা সঙ্গে দুটি ছেলে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন। ছেলে দুটি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছে। বাবা ওদের আমাকে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করলেন। ওদের হাত আমার পায়ে ঠেকতেই আমার মধ্যে অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি হল। আমি অনুভব করলাম আমার শরীরে রামকৃষ্ণদেব আর বামদেবের আবির্ভাব হয়েছে। আমার হাত রামকৃষ্ণদেবের হাতের মত মুদ্রায় চলে এল। আমি সমাধিস্থ হলাম। যেন এক অপার্থিব জগতে আমি বিচরণ করতে লাগলাম। এরপর বাবা ঐ ছেলে দুটিকে নিয়ে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে যখন তখন, আমি সমাধিস্থ হই, আমার মন চলে যায় অন্য জগতে। আমি দুই মহাসাধককে আমার মধ্যে অনুভব করি।'

ভোলানাথ অধিকারির এই ঘটনা শোনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মধ্যে যে দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে, তার বিচার করবে কে? উত্তরে তিনি বললেন, সে কি করে বলবো? যাঁরা বিচার করার তাঁরাই করবেন।

ভোলানাথ অধিকারির কথার জের টেনে বলতে হয় কে বিচার করবেন, এই সব অস্বাভাবিক ঘটনার কারণ কি? এসব সত্যিই কোন দৈব শক্তির ব্যাপার না, মায়া বা নিছক ভাবের উন্মাদনা অথবা মানসিক বিকার? অথচ ভোলানাথ অধিকারির বা যোগানন্দ সর্বতীর্থ, এরা যে কেউ–ই কিন্তু যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। রামকৃষ্ণদেবের পুনর্জন্ম সংক্রান্ত বিষয়টির অবিলম্বে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। রামকৃষ্ণদেবের জন্মের আগে বা পরে তোতাপুরি, ভৈরবী, বৈষ্ণবচরণের মত দৈবদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ জন্মেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে অবতার তা তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সমাজের কাছে। বর্ধমানের এই অবতারতত্ত্ব বিচার করবেন কে?

যোগানন্দ সর্বতীর্থ রামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষ করছেন বলে জানিয়েছেন, ভোলানাথের নিজের মধ্যেই রামকৃষ্ণানুভূতি হচ্ছে। কিন্তু সময়ের হিসাবে কিছু কিছু জটিলতা দেখা দিচ্ছে। রামকৃষ্ণদেবকে ঘিরে যে সব শিষ্য অবস্থান করতেন তাঁরা সবাই এক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। অনেকটা পূর্ণিমার চাঁদের পাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মত। ভোলানাথের তেমন কেউ নেই। তিনি নিজেই নিজেকে নিয়ে বিভোর। রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আর পরিবেশে এমন সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তাতে বোঝা গিয়েছিল, একজন অবতারের মর্তভূমিতে আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু গত ক'বছরে কোথাও কি এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে? কে জানে? সব মিলিয়ে যে সংশয়, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছে, তার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দায়িত্ব নেবেন কে?

চন্দন নিয়োগী

Choice of 4 Micro Briefs

Only from *Liberty*®

1

2

3

4

Pick Your Choice today...

STUDD

HIPSTER

LO-RISE

SKANTS

① **STUDD** The real male bikinee brief. Masculine style, masculine name. In White, Blue, Fawn, Rust, Navy Blue & Dark Green.

② **HIPSTER with POUCH** A fitting compliment for the athletic body. Available in White, Blue, Fawn, Rust, Navy Blue & Dark Green.

③ **LO-RISE** A pleasant change for the slim body. In White, Blue & Fawn.

④ **SKANTS** Hi-Fashion Micro Brief. A perfect fit for your body, life style & image. In White, Fawn, Navy Blue, Rust, Grey, Brown & Maroon.

Liberty®

The last word in briefs

এক যে ছিল রাজা!

রাজারাণীদের দিন বিগত। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রাচীন রাজপরিবারগুলির বর্তমান অবস্থা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়। বহু দেশ 'সাংবিধানিক রাজতন্ত্র' কে টিকিয়ে রাখতে চায় আজো। রাজারাণীরা ক্ষমতা হারিয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাদের নীল রক্তের ঐতিহ্য এখনো জন-সাধারণের কাছে সম্মানের বস্তু। প্রবীণা সূদ-এর চিত্তাকর্ষক এই নিবন্ধে পরিবর্তিত পরিস্থিতির চিত্রায়ণ।

নরওয়ের রাজা পঞ্চম ওলাভ

ডেনমার্কের একটি শহরে মঞ্চস্থ হচ্ছে স্থানীয় ব্যালে স্কুলের একটি ব্যালে নৃত্যের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে নর্তক-নর্তকীরা পেলেন বিপুল অভিনন্দন। সবচেয়ে বেশি হাততালি পেলেন ডেনমার্কের রাণী। না, রাণী বলে নয়। আসলে ১৪০টি কসটিউমের ডিজাইনার হিসেবেই এই দর্শকবৃন্দের অভিনন্দন পেলেন তিনি। রাণী দ্বিতীয় মারগ্রেথ তাঁর বন্ধুর প্রথম ব্যালে-অনুষ্ঠানের জন্য স্বেচ্ছায় কাজটা নিয়েছিলেন।

রাজা-রাণীদের সেই পুরনো জাঁকজমক বিলাস বৈভবের দিন আর নেই। পাশ্চাত্যের রাজারাণীদের ক্রমক্ষীয়মাণ মর্যাদার শোকে বেশিরভাগ পরবর্তী প্রজন্মের বংশধরেরা মূহ্যমান না হয়ে বরং চেষ্টা করছেন আধুনিক সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাঁরা চমৎকার আছেন। ডেনমার্কের রাণীর উদাহরণ তার একটা ছোট্ট প্রমাণ।

ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই কিন্তু রাজ-পরিবারগুলি আজো যথেষ্ট সম্মান এবং মর্যাদা পেয়ে থাকেন। গণতন্ত্রের এই যুগে তাঁদের ক্ষমতা

নরওয়ের যুবরাজ হেরাল্দ আর যুবরাণী সোন্জো

পরিবারিক পশ্চাদপট তাঁকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ঐতিহ্যের অনুবর্তী হতে বেশ বাধার সৃষ্টি করলেও শেষপর্যন্ত একজন দিনেমার হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধের জন্য ডেনমার্কবাসী তাকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন।

নেদারল্যাণ্ডস–এর রাণী বিয়াত্রিচে বিয়ে করেন জনৈক জর্মান কূটনীতিক ক্লস ফন আমসবার্গকে। ডেনমার্ক এবং ব্রিটেনের মতই আমসবার্গও শেষপর্যন্ত বহু অ-রাজকীয় কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে শুরু করেন। ইউরোপের রাজ-পরিবারগুলি পুরনো আড়ম্বর ত্যাগ করে সাধারণ সমাজে মিশে গিয়ে খুব ভালভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। একটি ঘটনার কথা বলা যাক, সুইডেনের রাজার সঙ্গে সাংবাদিকদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সাংবাদিকেরা রাজপ্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছেন, রাজা তখনো প্রাসাদে ফিরে

ডেনমার্কের ফ্রিসবর্গ প্যালেসে রাণী মার্গারেথ, যুবরাজ হেনরিক আর তাঁদের ছেলেরা

চলে গেলেও মানুষ তাঁদের ভালোবাসেন। ডেনমার্কের ১,০০০ বছরের পুরনো রাজতন্ত্র নিয়ে সেখানকার কট্টর বামপন্থীরাও কোনো কথা বলেন না। ১৯৭২ সালে মারগ্রেথকে যখন রাণী বলে ঘোষণা করা হয়, তাঁর বয়স তখন ৩২। ৫৬০ বছরের পুরুষপ্রধান রাজতন্ত্রে সেই প্রথম মহিলার আগমন। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে মারগ্রেথ যখন বিদেশে পড়াশোনার জন্য বসবাস করছেন, সেসময় জনৈক ফরাসী কূটনীতিক অঁরি দ্য লাবর্দ দ্য মঁপেরা–র সঙ্গে তাঁর আলাপ। অঁরি তখন লণ্ডনের ফরাসী দূতাবাসে কর্মরত। অনেকবছর পর রাণী মারগ্রেথ স্বীকার করেছেন, 'সেটা ছিল প্রথম দর্শনেই প্রেম।'

কোপেনহেগেনে ১৯৬৭ সালের ১০ জুন দুজনের বিয়ে হয়। কাউন্ট হেনরি বা অঁরি'র নতুন নামকরণ হল প্রিন্স হেনরিক।

প্রিন্স হেনরিক কিন্তু ডেনমার্কবাসীদের হৃদয় জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ল্যাটিন

নেদারল্যাণ্ডের রাণী বিয়াত্রিচ, যুবরাণী জুলিয়ানা ও তাঁর স্বামী

আসেননি বাইরের কাজ সেরে। প্রাসাদের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়াল এসে। যিনি চালাচ্ছিলেন, তিনি সাংবাদিকদের দেখে নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে নেমে এলেন এক মহিলা, ভদ্রলোকের স্ত্রী, তাঁর হাতে স্বামীর ব্রিফকেসটি। ভদ্রলোক সাংবাদিকদের কাছে এসে তাঁর আসতে দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। সাংবাদিকেরা তো হতবাক। তাঁরা তো এই লোকটিকে প্রথমে পাত্তাই দেননি। এঁরা হলেন সুইডেনের রাজা আর রাণী! কি আশ্চর্য। নিজে গাড়ি চালাচ্ছেন। দেহরক্ষী নেই, শোফার নেই, নিজের স্ত্রী বইছেন ব্রিফকেস। হাঁা, রাজা ষষ্ঠদশ কার্ল গুস্তাফ এমনই চমৎকার স্বভাবের।

ডেনমার্কের রাণী দ্বিতীয় মারগ্রেথের সম্পর্কে ভাই হন কার্ল গুস্তাফ। ১৯৭৩–এর সেপ্টেম্বরে তিনি রাজা হন। গত চল্লিশ বছরের বেশির ভাগ সময়ই যে দেশে সোসাল ডেমোক্রাটদের শাসন, সেই দেশেও কার্ল গুস্তাফের মত রাজাদের স্বীকৃতি একটা জিনিসই প্রমাণ করে, তা হল, রাজা রাজড়ারা নিজেদেরকে সেভাবেই তৈরি করে নিচ্ছেন। কার্ল গুস্তাফের পত্নী রাণী সিলভিয়া-ও হচ্ছেন একটি সাধারণ জার্মান পরিবারের মেয়ে। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বামীরা ছিলেন অ-রাজপরিবারের, এখানে স্ত্রী। ১৯৭৬ সালে সিলভিয়া যখন অস্ট্রিয়া'র ইনসব্রুকে শীতকালীন অলিম্পিকসের প্রোটোকল সেকসানের কমিটিতে কর্মরতা, সেসময়ই সুইডেনের রাজার সঙ্গে তাঁর আলাপ। ব্যস, প্রেম; তারপর বিয়ে। বিদেশিনী হওয়া সত্ত্বেও সুইডিশরা তাঁদের রাণীকে ভালোবেসে ছিলেন। রাজ-দম্পতির প্রথম সন্তান ভিকটোরিয়াকে যুবরাণী ঘোষণা করা হয়। এরজন্য ১৯৭৯ সালে উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন করতে হয়েছিল। এর আগের আইনে ছিল, কেবলমাত্র প্রথম পুত্রসন্তানই সিংহাসনের অধিকারী হবেন।

নরওয়ের রাজা পঞ্চম ওলাভ রাজা হয়ে ঘোষণা করলে, 'আমার সবকিছু নরওয়ের জন্য।' তাঁর পিতৃদেব রাজা সপ্তম হাকন মারা যান ১৯৫৭ সালে। ১৯০৫ সালে নরওয়ে যখন সুইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সেখানকার সংসদ 'স্টর্টিং'-এ স্থির হয়, নরওয়েকে তার সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার্থে ইউরোপের অন্যান্য প্রভাবশালী রাজতন্ত্রগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। এই চুক্তি অনুযায়ী ডেনমার্কের যুবরাজ কার্লকে নরওয়ের সিংহাসন উপহার দেওয়া হয়। কার্ল সস্ত্রীক নরওয়ে চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী রাণী মড হচ্ছেন ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের তিনকন্যার একজন। ডানো-ব্রিটিশ বংশের হওয়া সত্ত্বেও নরওয়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। যুবরাজ ওলাভ তো সেদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ব্যক্তিগত মধুরস্বভাবের জন্য। নরওয়ের ৯০ শতাংশ মানুষ কিন্তু এখনও রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী।

যুবরাজ ওলাভ তাঁর সুইডিশ সম্পর্কের কাজিন মার্থাকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুটি কন্যা, প্রিন্সেস

সুইডেনের রাজা চতুর্দশ গুস্তাফ ও রাণী সিলভিয়া

র‍্যানহিল্ড এবং প্রিন্সেস অ্যাসট্রিড, একটি পুত্র-যুবরাজ হারাল্ড। প্রিন্সেস দুজনেই বিয়ে করেছেন সাধারণ পরিবারে। রাজকীয় আড়ম্বর তাঁরা অপছন্দ করেন, তবে 'প্রিন্সেস' খেতাব দুটি দুজনেই সযত্নে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রিন্স হারাল্ড ১৯৫৯ সাল থেকেই চিনতেন সোনজা হারাল্ডসেনকে। দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে বহু জলঘোলা হয়। সেসময় দুজনকে নরওয়ে ত্যাগ করার নির্দেশ দেবার কথাও ভাবা হয়। এমনকি, নরওয়ের রাজতন্ত্র উঠিয়ে দেওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত, ১৯৬৮ সালে, রাজা ওলাভ পুত্রের বিয়েতে সম্মতি জানান। রাজনৈতিক দলগুলি এবং 'স্টর্টিং' ও রাজী হয়ে যায়। নরওয়ের জনতা এই বিয়েতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানালেন। সোনজাকে যুবরাণী ঘোষণা করা হয়। সাধারণ ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও রাণী হিসেবে তিনি সেখানে এখন সমাদৃতা।

১৮৩০ সালে স্বাধীন হওয়ার পর বেলজিয়ামও 'সাংবিধানিক রাজতন্ত্র' বজায় রাখে। প্রিন্স লিওপোল্ডকে সেখানকার রাজা প্রথম লিওপোল্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১২০ বছর পরে সেখানকার শতকরা ৫৭ জন মানুষ তৃতীয়

বেলজিয়ামের রাজা বোদোয়াঁ ও রাণী ফাবিয়োলা

লিওপোল্ডের সমর্থনে ভোট দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জার্মানীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তখন সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করছেন। ১৯৫১ সালের ১৬ জুলাই দ্বিতীয় লিওপোল্ডকেও সোসালিস্টরা বেলজিয়াম ত্যাগ করতে বাধ্য করনে। সেইদিনই রাজা বদ্যোয়াঁ সিংহাসন লাভ করনে।

একটা কঠিন সময়ে বদ্যোয়াঁ রাজা হন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে সম্পূর্ণ নিজের দক্ষতায় তিনি সেদেশে রাজতন্ত্রকে মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্কের আওতায় আনতে পেরেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপে রাজতন্ত্রে বংশপরম্পরার প্রাধান্য ছিল। এখনও উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশে রাজতন্ত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইটালি অবশ্য ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেদেশ বিপর্যস্ত হয়। এজন্য ইটালির লোক তাঁদের আগের রাজা ভিক্‌টর এমানুয়েল তৃতীয়কে দায়ী করেন। তাঁরই দুর্বলতার জন্য ব্যর্থতার জন্যই নাকি ইটালিকে পরাজিত হতে হয়েছিল। ৪২ বছর পর সেদেশের প্রাক্তন রাণী মেরি জোসেফাইন সম্প্রতি নিজের দেশে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বেলজিয়াম পাশপোর্ট ব্যবহার করেন। ইটালির লোকজন তাদের এই প্রাক্তন মহারাণীর স্বদেশ-ভ্রমণে কোনো আবেগ উদ্দীপনা দেখাননি, উদাসীনই ছিলেন। ১৯৪৬ সালে সেদেশের মানুষ প্রজাতন্ত্রের স্বপক্ষে রায় দেবার পর রাজপরিবার নির্বাসনে চলে যান। তাঁদের ইটালি প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞাও ছিল। মেরীর স্বামী ২য় হামবার্ট পর্তুগালের কাসকালস–এ থাকতেন। ইনি ইটালি ত্যাগের সময় প্রজাতন্ত্রী সরকারকে বরং কিছুটা সাহায্যও করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ইটালি সকার হামবার্টের মৃতদেহ ইটালিতে সমাধিস্থ করবার অনুমতি দেননি। হামবার্টের পুত্র ভিক্টর এমানুয়েল পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এখানেও দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী প্রজন্ম

রাজপরিবারের ঐতিহ্য ত্যাগ করে সাধারণ সমাজের উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির পরাজয়ের পর ১৯১৮ সালে অস্ট্রিয়া তাদের হ্যাপসবুর্গ শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকার তাদের পূর্বতন শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়নি। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থিত মাদেইরা দ্বীপপুঞ্জে সম্রাট প্রথম কার্ল নির্বাসিত হন। ১৯২২ সালে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর চারটি ছেলে। বড় হচ্ছেন অটো ফন হ্যাপসবুর্গ লাদরিনগেন। চারজনই অস্ট্রিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাজমর্যাদা ও সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করার ফলে সত্তরের দশকে অটোফনকে অস্ট্রিয়ায় ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর মা সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করতে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া সরকার তাঁকে স্বদেশ ভ্রমণে অনুমতি দেন। বৃদ্ধা বিধবার বয়স তখন ৯০।

অটো ফন হ্যাপসবুর্গ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। প্যান-ইউরোপিয়ান আন্দোলনের তিনি প্রেসিডেন্ট। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য হল, 'সুপার পাওয়ার'–এর মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রয়োজন। অটো ফন বর্তমানে বাভারিয়ার সি এস ইউ পার্টির সংসদ সদস্য।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কার্ল অস্ট্রিয়ার আইন পড়েন। ভাই–এর সঙ্গে তিনি অস্ট্রিয়ান আর্মিতেও কাজ করেছেন। অটো ফন হ্যাপসবুর্গের একটি মেয়ে আছে, তার বয়স এখন ৩০। কার্ল 'দ্বিতীয়' অস্ট্রিয়ার রাজনীতিতে অংশ নিতে চান। অটো ফন হ্যাপসবুর্গের ভাইয়েরা বেলজিয়ামে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাঁরা অস্ট্রিয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সমর্থন করেন।

১৯৫২ সালের জুলাইতে মিশর প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। সেখানকার রাজা ফারুক স্বেচ্ছায় সেবছর ২৬ জুলাই দেশ ত্যাগ করে ইটালিতে চলে আসেন। সঙ্গে স্ত্রী ন্যারিমান, এবং একমাত্র পুত্র আহমেদ ফোআব। ফোআবের বয়স তখন মাত্র এক। সেদেশের সরকার অবশ্য ফারুকের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেননি। ফারুক ১৯৬৭ সালে রোমে মারা যান। মারা যাওয়ার সময়ও তিনি রেস্টুরেন্টে মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করছিলেন, ভালো খাবার, সুন্দরী মেয়ে, চমৎকার মদ–এসবের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্বার। তৎকালীন মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত সানন্দে ফারুককে কায়রোয় সমাধিস্থ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

ফারুকের পুত্র ফোআব এখন থাকেন প্যারী-তে। বিয়ে করেছেন এক সুন্দরী ফরাসী মহিলাকে, তিনি নাকি প্রাক্তন রুশ রাজবংশোদ্ভূতা। ফোআবের কোনো অভাব নেই। বাবার অঢেল সম্পত্তি ছাড়াও মিশর সরকার তাঁকে পেনসন দিয়ে থাকেন। ফোআব যতদিন নাবালক ছিলেন, তাঁর দেখাশোনা করতেন মোনাকোর প্রিন্স রাইনের। ফোআব রাজনীতিতে আগ্রহী নন। সুশিক্ষিত, রুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ফোআব শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বিশ্বাস করেন। স্বদেশের প্রতি তাঁর অসীম টান।

ইরানের একদা শাহ্‌ রেজা পহলবি ও রাণী ফারা তৎকালীন **মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসনকে তেহরানে স্বাগত জানাচ্ছেন**

ফোআব–এর ঠিক উল্টো রেজা পেহলভি। ইরানের প্রয়াত শাহ–এর একমাত্র পুত্র। 'ডসিয়ের' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক রচনায় রেজা পেহলভি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি নাকি দেশে ফিরতে চান এবং রাজতন্ত্রে পুনরাবির্ভাবই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আয়াতোল্লা খোমেইনির বিরুদ্ধে তিনি ইতিমধ্যে বহু মিটিং করেছেন। ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল ইরান একটি ইসলামিক রিপাবলিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ মিশর, মরক্কো, বাহামা এবং মেকসিকো ঘুরে ২২ অক্টোবর ১৯৭৯ পৌঁছান আমেরিকায়। সেখানে তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলে। সেসময় ইরানী বিপ্লবীরা তেহেরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে ৫০ জন আমেরিকানকে আটক করে দাবি জানায়, শাহকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। আমেরিকা অবশ্য সে দাবি মেনে নেয়নি, কিন্তু শাহ নিজে থেকেই সে দেশ ত্যাগ করে চলে যান। প্রথমে পানামায়, তারপর কায়রোয়। ১৯৮০ সালের ২৭ জুলাই মিশরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর পুত্র রেজা পেহলভি বর্তমানে ১৯ বছর বয়সী তরুণী স্ত্রী সমেত আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় এক বিশাল প্রাসাদে বাস করছেন। এই নিবন্ধের তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি আধুনিক সময়ের সঙ্গে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি, বরং, রাজা হবার অলীক স্বপ্ন দেখে চলেছেন।

বাংলাদেশ যাত্রা : ভিসা-পাশপোর্ট কেলেংকারি

ভিসা-পাশপোর্ট দুর্নীতি নিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক আর জল্পনার গুঞ্জন। সত্যিই কি তারা এই কেলেংকারিতে যুক্ত? একযোগে ১৮ জনের ছাঁটাই ও হাইকমিশনারের বদলি কিসের ইংগিত দেয়? কলকাতায় কিভাবে পাশপোর্ট-ভিসার বেআইনী ব্যবসা চলে? নারীপাচারের সঙ্গে এর কি কোন যোগসাজশ আছে? নেপথ্যে কুশীলব ও তাদের কালরাস্তার কাজকর্মের দিকে অনুসন্ধানমূলক আলোকপাত।
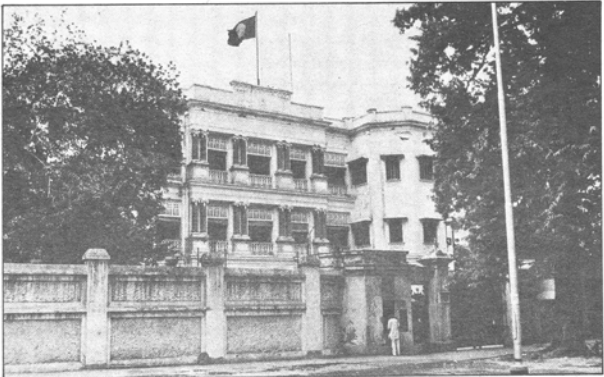
বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন

সময় দুপুর দুটো, স্থান সার্কাস অ্যাভেনিউ–এর গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনের রাস্তা। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে তামাম কলকাতা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ গলে যাচ্ছে রোদের তাপে। এই দারুণ জ্বালাধরা গ্রীষ্মের দুপুরে সার্কাস অ্যাভিনিউ–এর রাস্তা ধরে মফস্বল থেকে আসা একজন বছর পঁয়ত্রিশের লোক হেঁটে আসছে। দু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সে সামনের গাছের ছায়ার জটলাতে দাঁড়ানো জনা পাঁচেক লোককে দেখে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসটা কোথায় জানতে চাইল। ওই জটলা থেকে দুজন এল এগিয়ে। লোকটিকে আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করল সে বাংলাদেশ যেতে চায় কি না। লোকটি মাথা নাড়তেই তারা তাকে নিয়ে এল গাছের ছায়ায়। মিনিট পনেরো কথাবার্তার পর দুজন সোজা চলে গেল ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসের দিকে। নিয়ে এল কিছু কাগজপত্র। টাকা লেনদেনের পর তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো অফিসের অমুক কর্মীর সঙ্গে দেখা করলে তার ভিসা পেয়ে যাবে। ভিসা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ করে জটলার লোকজনেরা আবার চলে গেল গাছের নিচে, নতুন শিকারের সন্ধানে!

এই দৃশ্য নিত্য নৈমিত্তিক। সার্কাস অ্যাভেন্যুর আশপাশে এই ধরনের দৃশ্য রোজই দেখা যায়। দুপুর এগারোটা থেকে এই লেনদেন প্রতিদিনই চলে। গড়ে সারাদিনে এই ধরনের শিকার গোটা বিশেক হয়। ব্যক্তি পিছু শ তিনেক থেকে শ চারেক টাকা। তারপর এই টাকা ভাগাভাগি হয়। টাকার অংশ চলে যায় কমিশন হিসেবে চক্রের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের পকেটে।

পাসপোর্ট অফিসের সামনে

এরকমেরই আরেকটি ঘটনা। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্ব চ্যাটার্জি বাংলাদেশের একটি সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছেন। সকাল থেকেই ভিসার জন্য লাইন দিয়েছেন বৃদ্ধ লোকটি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। লাইন এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। হেরম্ববাবু কাউন্টারের মুখে আসতেই জনা পাঁচেক ষণ্ডামার্কা চেহারার যুবক এসে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। এক পাশে ছিটকে পড়লেন হেরম্ববাবু। ধাতস্থ হবার পর সেই পাঁচ যুবক এসে ঘিরে ধরল তাকে। হেরম্ববাবুর বাংলাদেশ যাবার কথা শুনে তারা জানাল যে তাঁর চিন্তা করার কিছু নেই। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে আটশো টাকা লাগবে। টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না হেরম্ববাবু। কারণ এই অসহনীয় ধকল সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বিকেলের পরেও তাদের দেখা পাওয়া গেল না। হতাশ হেরম্ববাবু ঘটনাটি বেনিয়াপুকুর থানাতে জানালেন। পুলিশ অবশ্য এযাত্রায় টাকা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই ঘটনার পাশাপাশি, বাংলাদেশ হাইকমিশনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে বাংলাদেশে যাবার ভিসা নিয়ে এক শ্রেণীর কর্মী চূড়ান্ত অনিয়ম শুরু করেছে। এইসব এজেন্টদের সঙ্গে তাদের যোগসাজস আছে। মোটা টাকার বিনিময়ে ভিসা, পাসপোর্ট করিয়ে দিতে এজেন্টরা একদিকে যেমন নিরীহ বাংলাদেশ যাত্রীদের শিকার হিসেবে ধরে, তেমনই ডেপুটি হাইকমিশনের কিছু অধস্তন কর্মী কমিশনের বিনিময়ে তাদের ভিসা তৈরি করিয়ে দেয়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এইসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকমিশনার রাশেদ সহ ১৮ জনকে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার। জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ পাসপোর্ট ভিসার দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি রিপোর্ট দেয় যে পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে হাইকমিশনে চূড়ান্ত দুর্নীতি চলছে। রিপোর্ট পাবার পর হাইকমিশনার রাশেদ সহ ১৮ জনকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই রেকর্ড সংখ্যক বদলির ব্যাপারে হাই-কমিশনের বক্তব্য ছিল যে হাইকমিশনার রাশেদের বদলি রুটিন মাফিক। আর বাকিরা কন্ট্রাকটে চাকরি করতেন। নির্ধারিত সময়ের পর তাদেরকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। 'এদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে।' ভিসার দুর্নীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এছাড়া রাশেদ বদলি হয়ে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়। এটা তাঁর পক্ষে পদোন্নতি।

বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ তাদের ডেপুটি হাইকমিশনার তথা কর্মীদের এই বদলির যে কারণ দেখান, তাতে কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। ইতিমধ্যে ভিসার দুর্নীতি নিয়ে কাগজে ফলাও করে ছাপা হয় সংবাদ। এই সংবাদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন কর্তৃপক্ষ। সংবাদের প্রতিবাদ করে তারা জানান যে এ ধরনের সংবাদের কোন ভিত্তি নেই। দুর্নীতির খবর বেরোবার সপ্তাহ খানেক পরে কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। এবং বিদেশ দপ্তরের ফার্স্ট সেক্রেটারি আনিসুল ইসলাম একটি লিখিত বিবৃতি বিভিন্ন কাগজে দিয়ে জানান যে রাশেদ ছাড়া বাকিদের ছাঁটাইও নিয়ম মাফিক। এদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। এ নিয়ে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ভিত্তিহীন সংবাদ ছেপে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের নিযুক্ত তদন্ত কমিটির খবর তারা জানেন। তাদের কাছে যতদূর খবর আছে, ওই কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েনি। রিপোর্ট জমা পড়বে আরো কয়েক মাস পর। রিপোর্ট জমা পড়ার খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কিন্তু হাইকমিশনের এই সাফাই গাইবার কারণ কি? রাশেদ ছাড়া বাকি ১৮ জনকে ছাঁটাই করার পিছনে তারা যে কারণ দর্শান তা হলো এটি রুটিন অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ ছিল যে রাতারাতি ১৮ জনকে একবস্ত্রে ছাঁটাই করে দেওয়া হলো? এইসব প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃপক্ষের শাফ জবাব, এগুলি তাদের অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত। এ সম্পর্কে তারা বেশি কিছু বলতে রাজি নন।

পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে তাদের অফিসের সামনে প্রকাশ্য দুর্নীতির ব্যাপারে তারা এতদিনেও কেন সজাগ হন নি? হাইকমিশনের মুখপাত্র মোস্তাফা হোসেনের বক্তব্য, এ ব্যাপারে ভারত সরকার তাঁদের কাছে কিছু জানতে চান নি। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে একমাত্র কলকাতা পুলিশ এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে

পারে। এ ব্যাপারে তাঁদের দিক থেকে আপাতত কিছুই করণীয় নেই। ভারত সরকার যদি তাঁদের রিপোর্ট দিতে বলেন, তাহলেই তাঁরা রিপোর্ট দেবেন, নতুবা নয়।

মোস্তাফা সাহেব অবশ্য স্বীকার করেছেন যে এইসব চক্রগুলির কাজ কারবার তাঁদের একেবারে অজানা নয়। এদের ঘাঁটি কোথায় কিংবা কিভাবে এরা ভিসা পাশপোর্ট পাইয়ে দেয় তারও কিছু কিছু খবর তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে তো হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ অপারগ। এটা আইন শৃঙ্খলাগত আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটা ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আওতায়। মোস্তাফা সাহেবের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না।

বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ যাত্রীদের শুধুমাত্র ভিসা দিয়ে থাকেন। পাশপোর্ট দেবার আইনগত অধিকার ভারত সরকারের। অনুরূপ ভাবে বাংলাদেশ সরকারও তাঁদের নাগরিকদের পাশপোর্ট দিয়ে থাকেন। স্বাভাবিক নিয়মেই এই ভিসা পেতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে নানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়ে, বহু তদারক তদ্বিরের পর ভিসা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষ সময় ও পরিশ্রম বাঁচাতে ধরা দিত ভিসার দালাল চক্রের ফাঁদে।

ভিসা পাশপোর্ট জালিয়াতির ব্যাপারে অবশ্য বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের জড়িত থাকার ব্যাপারে স্থানীয় বেনিয়াপুকুর থানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন স্পেসিফিক ইনফরমেশন নেই। রাশেদ সহ ১৮ জন বদলির ব্যাপারে এ·এস·আই· এস· চক্রবর্তীর অভিমত, 'এটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার।' তবে ভিসা-পাশপোর্ট চক্র যে বরাবরই সক্রিয় এ ব্যাপারে তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই চক্রের নায়কেরা থাকে গোবরা, তপসিয়া এলাকাতে। একসঙ্গে জনা পঞ্চাশেক লোক এই চক্রে জড়িত। এদের চক্রের একজনকে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে পুলিশ তপসিয়ার এক বস্তি থেকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে নকল স্ট্যাম্পে, নকল ভিসা ফর্ম পাওয়া যায়। এমন কি একটি স্ট্যাম্প মারা ফর্ম দেখে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশও রীতিমত হকচকিয়ে যায়। হুবহু সই দেখে বোঝাই যায় না যে এটি আদতে নকল। পুলিশ জানতে পারে, প্রতি মাসে ৫০ টিরও বেশি নকল ভিসা এরা বিলি করত। এই ভিসা দেখে কারোরই তেমন সন্দেহের উদ্রেক হতো না।

এই ধরনের নকল ভিসার ব্যাপারে সরকার শেষ দিকে সজাগ হয়ে ওঠেন। কারণ ডেপুটি হাই-কমিশনের হিসেবের সঙ্গে বাংলাদেশ যাত্রীদের হিসেবে গরমিল দেখা যায়। ঘন ঘন পরীক্ষায় তাঁরা নকলগুলি বুঝতে পারেন। কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখেন যে নকল ভিসাতে যে পাশপোর্টের নম্বর রয়েছে, তার সঙ্গে তাদের ফাইলে পাশপোর্টের নম্বরের সঙ্গে মিলছে না। এইসব ভিসাগুলি আটক করে কর্তৃপক্ষ ভিসাধারীকে পুলিশ দিয়ে অনেকবার গ্রেপ্তার করিয়েছে। তবে ব্যক্তিগত মুচলেকাতে এরা সকলেই ক্রমে ছাড়া পেয়ে যায়।

ভিসা পাশপোর্টের চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির আরেকটি পদ্ধতির কথা জানা গেছে। ধরা যাক কারো ভ্যালিড পাশপোর্ট ভিসা দালালদের হস্তগত হলো। এবার কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ যাত্রার জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এজেন্টরা তখন তার তিন কপি পাশপোর্ট ছবি চাইবে। এইবার ভিসা ও পাশপোর্টে লাগানো ব্যক্তির ছবি গলা থেকে সূক্ষ্মভাবে উড়িয়ে দেবে। তাতে নির্খুত ভাবে

ভিসার ফর্ম

সেঁটে দেওয়া হবে অপর একজনের ছবি। এই সুপার ইমপোজ এত নির্খুত হয় যে কেউই তা বুঝতে পারে না। এমন কি ভিসার সুদক্ষ কর্মীরাও অনেক ক্ষেত্রে ধোঁকা খেয়ে যান। হাইকমিশনের ভিসা বিভাগের কর্মী জয়নাল আবেদিনের মতে, এর পিছনে রয়েছে ঠাণ্ডা মাথার কিছু লোক। যারা বিভিন্ন ধরনের জাল ডকুমেন্টস তৈরি করে থাকে। তবে এই ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে কড়া নজর দিতে থাকে। এ রকম ১০০টি নকল ভিসা তারা আটক করেছেন।

কর্তৃপক্ষের মতে, এখানকার মত বাংলাদেশেও এই ধরনের চক্র রয়েছে। এরা বাংলাদেশ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট ও উকীলের সই করা ভিসা এখানে পাঠায়। এগুলিও নকল। বিশেষ করে যেসব ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যকাল শেষ হয়েছে, সেইসব ম্যাজিস্ট্রেটের সই, তারিখ দেখানো হয় পুরনো সময়ের–এবং তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় এ দেশে। এখানে সেগুলি ভর্তি করে ভিসার বন্দোবস্ত হয়। এইরকম প্রায় একশটি ফর্ম কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করেছেন।

ভিসা পাশপোর্টের দুর্নীতির জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ মিলবে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ভিসা পাশপোর্টের অফিসের সামনে। এখানে একদল লোক আছে যারা ডলার পাইয়ে দেয় মোটা টাকার বিনিময়ে। লোক বুঝে টাকার লেনদেন হয়। অনভিজ্ঞ লোক দেখলেই রেট বেড়ে যায়।

ভিসা পাশপোর্ট চক্র যে বরাবরই সক্রিয় এ ব্যাপারে তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই চক্রের নায়কেরা থাকে গোবরা, তপসিয়া এলাকাতে। একসঙ্গে জনা পঞ্চাশেক লোক এই চক্রে জড়িত। এদের চক্রের একজনকে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে পুলিশ তপসিয়ার এক বস্তি থেকে গ্রেপতার করে। তার কাছ থেকে নকল স্ট্যাম্পে, নকল ভিসা ফর্ম পাওয়া যায়। এমন কি একটি স্ট্যাম্প মারা ফর্ম দেখে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশও রীতিমত হকচকিয়ে যায়। হুবহু সই দেখে বোঝাই যায় না যে এটি আদতে নকল।

এই ডলার পাবার পর তারাই স্পনসরশিপের ব্যবস্থা করে দেবে। আপনি চাইলে বাংলাদেশের ঠিকানাতে কোন বাংলাদেশি নাগরিক আপনার দায়িত্ব নেবে। এবার ভিসা পেতে অসুবিধে নেই। এই ব্যাপারেও ২০০, ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা এরা নিয়ে থাকে। এইসব চক্রের লোকজনেরা থাকে অফিসের সামনে। ব্যর্থ মনোরথ ব্যাকুল যাত্রীরাই হয় এদের শিকার। এভাবে বেআইনি পথে লেনদেন হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

বর্তমান ভিসা পাশপোর্টের এই কালা কারবারে নানা ধরনের মানুষ এসে যুক্ত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্ত হতে তারা শেষ পর্যন্ত এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিটি কেস পিছু এই দালালদের নাকি

দশ টাকা করে আসে। এরকম পাঁচটি কেস করলেই নগদ পঞ্চাশ টাকা এসে যায়। বাকি টাকা যায় রাঘববোয়ালদের পেটে।

মোটামুটি দু ধরনের দুর্নীতি হয়। প্রথমটি হলো সরাসরি ভিসা। অর্থাৎ প্রাপক টাকা দিলেই এজেন্টরা ভিসা করে এনে দেন। দ্বিতীয়টি নকল ভিসা/পাশপোর্ট । দ্বিতীয়টিতেই বেশি বিপদের সম্ভাবনা। আইন মোতাবেক এই ভিসাধারীকে গ্রেপ্তার করে ৪২০ ধারায় বিচার করা হয়। কিন্তু চক্রের আসল লোকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

তবে সব থেকে মজার ব্যাপার, কর্তৃপক্ষ এদের সব খবর জেনেও নীরবতা পালন করে থাকেন। যারা প্রতারিত হন তাদের শাস্তি দিলেও চক্রের লোকেরা ছাড়া পেয়ে যায়। এমন কি চক্রের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েও কোন সুবিধে হয় না। এ ব্যাপারে হাইকমিশন কর্তৃপক্ষের এক কথা, 'আমাদের কিছু করণীয় নেই। এটা ভারত সরকারের ব্যাপার।' এছাড়া ভিসা দুর্নীতিতে হাইকমিশনের অধস্তন কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য 'আমরা অফিসিয়ালি কোন রিপোর্ট পাই নি। আমাদের নলেজে এলে ব্যবস্থা নেব।' বলাবাহুল্য, সেরকম ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটে নি।

ভিসা পাশপোর্ট দুর্নীতির পথ বেয়ে এরই সহযোগী আরেকটি চক্র বর্তমানে বাংলাদেশের নারীপাচারের এজেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের ঘটনা প্রথম ধরা পড়ে বাংলাদেশের কিশোরী পারভীন খাতুনের বেলাতে। পারভীন তার দূর সম্পর্কীয় মাসির সঙ্গে এ রাজ্যে কাজের খোঁজে আসে। তার মাসি তাকে একজনের কাছে বিক্রি করে দেয়। পারভীন শেষে ধরা পড়ে ১৪ ফরেনার্স অ্যাকটে। চালান হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখান থেকে জেলের স্টাফ রামদুলারির যোগসাজসে বোম্বাই–এর পতিতালয়ে ৫,০০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায়। এরপর সেখানকার এক বাঙালি কাস্টোমারের বদান্যতাতে সে এ রাজ্যে ফিরে আসে। জেল কর্তৃপক্ষ তাকে বাংলাদেশে পাঠাবার চেষ্টা করে। সেইসময় বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে বিখ্যাত আইনজীবী শিবশংকর চক্রবর্তী আদালতে পিটিশন করে জানান যে পারভিনকে জেল থেকে পাচার করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে রামদুলারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনার পর অনেকদিন কেটে যায়। পারভীনের জায়গা হয় গার্ডেনরীচের ইন্টারন্যাশনাল মিশন অফ হোপে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার একটি কমিশন বসান। কিন্তু বহুদিন হয়ে যাবার পরও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর অনেকদিন পর গত ২৫ এপ্রিল 'ইন্ডিয়ান একসপ্রেস' পারভীনের ওপর একটি খবর বের করে। এরপর আবার ২৭ এপ্রিল আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এটি

তদন্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে হাইকমিশন জানতে পারে যে ভিসা ও পাশপোর্টে জাল জুয়াচুরি করে শ'য় শ'য় নারী মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হচ্ছে। এজেন্টরা এইসব নারীদের আনুমানিক ২,৫০০ টাকা করে কিনে থাকে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করে প্রায় দশ হাজার টাকায়।

প্রকাশের পরই বাংলাদেশে হঠাৎ হইচই শুরু হয়। সরকারি মহলে শুরু হয় তোলপাড়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশ থেকে মাসে ৫০ জন করে নারী বিদেশে পাচার হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ওই সংবাদটি বাংলাদেশের প্রধান দৈনিক 'ইত্তেফাক' পরিবেশন করে। বাংলাদেশের পার্লামেন্টে ঝড় বয়ে যায়। এই নারী পাচারের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অনুসন্ধান শুরু করে। এবং বাংলাদেশ হাই-কমিশনের প্রতিও বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ আসে। তদন্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে হাই-কমিশন জানতে পারে যে ভিসা ও পাশপোর্টে জাল জুয়াচুরি করে শ'য় শ'য় নারী মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হচ্ছে। এজেন্টরা এইসব নারীদের আনুমানিক ২,৫০০ টাকা করে কিনে থাকে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করে প্রায় দশ হাজার টাকায়। অন্যের বৈধ পাশপোর্টে ছবি তুলে এইসব মেয়েদের ছবি সেঁটে দেওয়া হয়। এছাড়া বিনা পাশপোর্ট ভিসাতেও এদেরকে পাচার করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে বহু এজেন্ট নকল স্পনসরশিপের লোভ দেখিয়ে এদেরকে প্রতারিত করে ওই দেশে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। এই নিয়ে পার্লামেন্টে জোর বিতর্কের পর নারী পাচার নিরোধ আইন পাস হয়। হাইকমিশন আরও জানতে পারে এইসব এজেন্ট যারা জাল পাশপোর্টের ব্যবসা করে থাকে তারা বাংলাদেশের গরিব মেয়েদের চাকরি দেবে এই লোভ দেখিয়ে সীমান্তে নিয়ে আসে এবং সেখানে তাদের নিজস্ব লোকদের মারফৎ এইসব পাশপোর্ট ভিসা তৈরি হয়। যা আইনত অবৈধ।

এই তোলপাড়ে কলকাতার বাংলাদেশ হাই-কমিশনও যথেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ে। কারণ এই নারী পাচারের রুট এই পশ্চিমবঙ্গ। মূলত পশ্চিমদিনাজপুর-লালগোলা থেকেই এরা পাচার হয়। আরবে পাচারের দুটি পয়েন্ট আছে–প্রথমটি বোম্বাই, অন্যটি পাকিস্তান। এখান থেকেই তারা মধ্যপ্রাচ্যে কাজ কিংবা আরব শেখদের মিসট্রেস হিসেবে চাকরি পায়।

হাইকমিশন জানিয়েছেন, এই নারী পাচারের পিছনে রয়েছে দুটি রাষ্ট্রের কয়েকটি সক্রিয় চক্র। এরা জাল পাশপোর্ট বা সুপার ইমপোজের মাধ্যমে এদের মধ্যপ্রাচ্যে পাঠায়। নকল ভিসা কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে ভিসা আদায় করে। তারপর এরা বিমানে তাদের তুলে দেয়। এরপর এরা পাড়ি দেয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। বহু মেয়েই পরিচারিকা কাম রক্ষিতা হিসেবে থাকে। আবার অনেকে শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় শুদ্ধ পতিতাবৃত্তি। চাঞ্চল্যকর খবর হলো, বয়স চলে যাবার পর যখন এদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন এদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবং এদের কংকাল বিক্রি করা হয় বিদেশের মেডিকেল ইনস্টিটিউটে।

এইসব ভিসা পাশপোর্টের দালালদের সাথে হাত মিলিয়ে নারী মাংসের অবাধ বিপণনের খবর বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। তবে এইসব চক্রগুলির কাজ এত সূক্ষ্ম ও গোপনে সম্পন্ন হয় যে তাদের ধরা খুবই মুশকিল। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, 'এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি।' তাদের কাছে খবর, সীমান্ত এলাকাতে এইসব চক্ররা রয়েছে। এরা যেমন এদের ভিসা পাশপোর্ট যোগাড় করে, তেমনই মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গাতে চাকরির সন্ধান দিয়ে থাকে। এদের সঙ্গে বেশ কিছু রাঘব-বোয়ালও নাকি জড়িত রয়েছে।

পাশপোর্ট ভিসা দুর্নীতির ব্যাপারে হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ যতই সাফাই গেয়ে থাকুন, তাদের অজান্তে বোধহয় কোন ঘটনাই ঘটছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে উঠেছে তাদের কয়েকজন কর্মীর জড়িত থাকার অভিযোগ। হাইকমিশনের ১৮ জন বদলি (ছাঁটাই!) র পর যখন এই প্রতিবেদক গত ৩০ মে বাংলাদেশ হাইকমিশনে যান তখন দুপুর দেড়টা নাগাদ জানানো হয় অফিসিয়ালস্ সকলে লাঞ্চে গিয়েছে, দুটোর পর এলে দেখা হবে। আড়াইটে নাগাদ যোগাযোগ করলে জানানো হয় যে ফোর্থ সেক্রেটারি দেওয়ানজী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আনিসুল আলম নেই। বাকি কোন অফিসিয়ালই দেখা করবেন না। কারণ জানতে চাইলে বলা হয়–এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। শেষ পর্যন্ত মোস্তাফা হোসেনের দেখা পাওয়া যায় দীর্ঘ ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট পরে।

হাইকমিশন কিন্তু ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের সম্পর্কে কিছুই বলতে চান না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন একসঙ্গে এতগুলি কর্মীকে চালাও ছাঁটাই করা হলো? এর কি কারণ থাকতে পারে? যে কারণ কর্তৃপক্ষ খুলে বলছেন না! এর ভেতরকার কারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই নতুন কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

বিশেষ প্রতিনিধি ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

তথ্যসংগ্রহ: মণিশংকর দেবনাথ

প্রশ্নপত্র ফাঁস : করসপণ্ডেন্‌স স্কুলগুলির রহস্যময় ভূমিকা

পৃথ্বীশ বসু: ডাবলিউ·বি·এইচ·এ·-এর সাধারণ সম্পাদক।

উচ্চ মাধ্যমিক, বি·এ, বি·এস·সি, এম·এ ও এম·বি·বি·এস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শিক্ষাসংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রশিক্ষক সংস্থা থেকে বিতর্কের ঝড় উঠেছে রাজ্য বিধানসভায়। এভাবে ঢালাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের পিছনে কোন চক্র কাজ করছে? প্রধান শিক্ষক সমিতির বক্তব্যে প্রশাসনিক মহলের সঙ্গে দুস্টচক্র জড়িয়ে যায় কি করে? বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসে আধ্যাপকরা জড়ালেন কি করে? নেপথ্যকুশীলবদের মুখোশ খুলতেই এই তদন্তরিপোর্ট।

ফুলবাগানের শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট। পরীক্ষা শেষে ছাত্রদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসছিলেন এই স্কুলেরই হেডমাস্টার পৃথ্বীশ বসু। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেডমাস্টার অ্যাসো-সিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তিনি। যাবেন কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়, অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে। এমন সময় তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্র চন্দন ভট্টাচার্য তাঁকে বলে, 'জানেন স্যার, ইকনমিকসের প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে!' প্রথমটা বিশ্বাস করেননি তিনি। তাই চন্দন পুনরায় বলে, 'হ্যাঁ স্যার, সত্যি বলছি। আমার কাছেও তার সাইক্লোস্টাইল কপি আছে।' পৃথ্বীশবাবু দেখতে চাইলেন। চন্দন কিন্তু তা দেখায়নি। তার বোন এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। হয়তো সে কারণেই প্রশ্নপত্র স্যারের হাতে তুলে দিয়ে সুযোগের অপব্যবহার করতে চায়নি সে।

দিনটি ছিল ২৫ এপ্রিল ৮৮, পৃথ্বীশবাবু স্কুল থেকে সোজা চলে আসেন অ্যাসোসিয়েশনে। কিছুক্ষণ বাদেই যুগান্তরের রিপোর্টার আসেন তাঁর কাছে। বলেন, গত ১৯ এপ্রিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, সে ব্যাপারে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

পৃথ্বীশবাবু বলেন, কই তেমন তো কোন খবর আমাদের কাছে আসেনি। পৃথ্বীশবাবুর কথা শুনে রিপোর্টার একটি সাইক্লোস্টাইল কপি বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাতে। বললেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখুন। মেলাতে গিয়ে পৃথ্বীশবাবু দেখেন হুবহু এক। কিন্তু অস্বীকার করে বলেন, এ ত সাজেশনও হতে পারে? পরীক্ষার আগে যখন আমাদের হাতে এই কপি আসেনি, এখন আমাদেরই বা কি করার আছে?

রিপোর্টার বললেন, এই কপি পরীক্ষার আগেই আমরা সি পি এম রাজ্য কমিটির সদস্য অনিল বিশ্বাসের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পঞ্চাশ দশকে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের কপি প্রফুল্লকান্তি ঘোষের হাতে তুলে দিয়ে যে সুবিচার পেয়েছিলাম, অনিলবাবুও তাই করবেন নিশ্চয়ই। যেহেতু তিনি শুধু সি পি এম নেতা নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য। এমনকি 'গণশক্তি'র সম্পাদকও তিনি। কিন্তু ফল হল উল্টো। পুরো ব্যাপারটাই তিনি ধামাচাপা দিতে চাইছেন। জানতে চাইলে অপমান করছেন আমাদের। শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়, ইকনমিকসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে গেছে। এই বলে তিনি পৃথ্বীশবাবুর হাতে তুলে দিলেন সাইক্লোস্টাইল করা একটি কপি। ওতে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন আছে।

২৬ এপ্রিল ৮৮, ইকনমিকসের পরীক্ষা হয়ে গেলে তিনি প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারেন আগের দিন সাইক্লোস্টাইল করা প্রশ্নের সঙ্গে এর হুবহু মিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফোন করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অনিলা দেবীকে। অনিলা দেবী তখন সংসদে ছিলেন না। অগত্যা একটা ট্যাকসি নিয়ে আসছিলেন অ্যাসোসিয়েশনে। রাস্তায় পড়ে মহাকালী পাঠশালা। পরীক্ষা শেষে ছাত্রীরা জটলা পাকিয়েছে স্কুলের সামনে। পোশাকে আশাকে মনে হয় ভিকটোরিয়ার ছাত্রী ওরা। ট্যাকসি থেকে নেমে পড়লেন তিনি। শুনতে পেলেন ছাত্রীরা বলাবলি করছে 'সব প্রশ্নই কমন এসেছে।' পৃথ্বীশবাবু কৌতূহলের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন তাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব কমন এসেছে মানে?' কয়েকজন ছাত্রী তখন আনন্দের সঙ্গেই বলে ওঠে, 'আমরা তো কালই প্রশ্ন পেয়ে গেছি।'

পৃথ্বীশবাবু চলে এলেন অ্যাসোসিয়েশনে। ততক্ষণে সেই রিপোর্টার এসে গেছেন। প্রশ্নপত্র

দাঁতের ব্যাপারে একান্ত সত্য
শ্বাসের দুর্গন্ধের সম্পর্ক
দাঁতের চেয়ে বেশী মাড়ির সঙ্গেই।
একান্ত সত্য
একমাত্র ফরহ্যান্স-এর
অভিনব অ্যাস্ট্রিনজেণ্ট মাড়িকে
আঁটসাঁট করে সুস্থ-সবল রাখে।
শ্বাসে দুর্গন্ধ জন্মাতেই দেয় না।
ফেনাওলা ফরহ্যান্স
নীল প্যাকে ভরা।
Forhan's
FOAMING
TOOTHPASTE
Forhan's
The toothpaste created by a dentist
ফরহ্যান্স
সীমিত ফেনাওলা
কমলা রঙের প্যাকে ভরা।
ফরহ্যান্স
যত্ন
৩২অক্ষত বৃত্ত
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট
GM 27/88 Bn
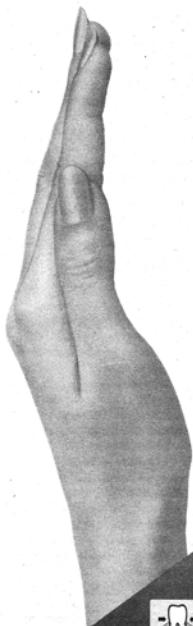
স্বপার বিজ! বাসনে আনে
এমন চমক···যেন
তারকা-রশ্মি চকমক চকমক!
শুধু কি বাসন? আরো
কত কাজে আসে বিজ —
মেঝে বা টাইল, ওয়াশবেসিন
বা জানলা-দরজার শার্সি!
সব জায়গায় দেখুন বিজ-এর
চাকচিক্য!
তাছাড়া, এত কম
খরচ হয়, নজরে পড়ে শুধু
সাশ্রয়ই সাশ্রয়।

CLARION/B/GS/49/244

ফাঁসের ব্যাপারে তখন আর কোন সন্দেহ নেই। এও তিনি জানতে পেরেছেন পরীক্ষার আগেই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় প্রশ্নপত্র পাওয়া যাচ্ছিল একশ টাকায়। জানতে পেরেছেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাজে নায়ক কারা। বলছিলেন, এই যে অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে টিউটরিয়াল হোম, করেসপণ্ডেনস কলেজ এদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাসংসদগুলি কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কেন? তবে কি তাঁদেরই মদতে এরা মুনাফা লুটে যাচ্ছে! শিক্ষামন্ত্রী কি জানেন না এইসব স্টাডি সেন্টারগুলিতে আড়ালে কিসের ব্যবসা চলে? এই সমস্ত ঠেকের মালিকরা কি বলতে পারবেন কোন কোন অধ্যাপক শিক্ষক তাঁদের সঙ্গে জড়িত? বলবে না। কারণ তা অনৈতিক। পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সুযোগ নিয়ে কেউ ব্যবসা করুক আমরা তা চাই না। জানি এই শিক্ষাব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি। অবিলম্বে এই সব শিক্ষা ব্যবসার আড়তগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

কেবল কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়ই এমন করেসপণ্ডেনস কলেজ টিউটোরিয়াল হোমের সংখ্যা এক ডজনেরও বেশি। গলিতে গলিতেই ছেয়ে গেছে শিক্ষাব্যবসার এইসব রমরমা আড়ত।

২৬-এ রমাকান্ত মিস্ত্রি লেন-এ অলোক সেন ওরফে পৃথ্বিরাজ সেন-এর করেসপণ্ডেনস কলেজ 'স্টাডি সার্কেল' এর জালিয়াতি ব্যবসার আসল রহস্য প্রকাশ পেয়েছিল লালবাজার এর গোয়েন্দা পুলিশের অনুসন্ধানে। টাকার বিনিময়ে পাস করিয়ে দেওয়া, মার্কসিট জালিয়াতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদির অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশ অলোকবাবুকে হাতে নাতে ধরেছিলেন শাঁখারিটোলা স্ট্রিটে।

দক্ষিণ কলকাতায় নিউ আলিপুর থানায়ও এমন কেস পাওয়া যায়। দুর্গাপুর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে স্টাডি সার্কেলের প্রিন্সিপাল অনিল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কয়েক মাস আগে এই ব্যাপারে মামলা দায়ের হয়। তথ্য প্রমাণ পেয়ে পুলিস অনিল বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি গা ঢাকা দেন। জানা যায়, এই ব্যবসায় তিনি কমপক্ষে ৬,৬০,০০০ টাকা হাতিয়েছেন।

পৃথ্বীশবাবুর পাশের চেয়ারে বসেছিলেন অপরেশ গোস্বামী। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেডমাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। বললেন, 'এই সমস্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় প্রমাণ করছে প্রশাসনিক অবহেলা ও অযোগ্যতা। শুধু তাই নয় প্রশাসনের সঙ্গে দুষ্টচক্রের যোগাযোগ না থাকলে প্রশ্নপত্র ফাঁস কোন মতেই সম্ভব নয়। আর এর একমাত্র কারণ চোরা রাস্তায় বিশাল অর্থ উপার্জন।' পৃথ্বীশবাবু বলেন, 'এ ব্যাপারে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অনিলাদেবীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না উচ্চ মাধ্যমিকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। এনিয়ে একরকম বচসাও হয়েছে।

ছবি: কাজী আবদুর সোহিদ

অনিলা দেবী: প্রশ্নপত্র ফাঁস মানতে নারাজ।

অনিলাদেবী বলছিলেন, ১৯৮২ তে ফিজিক্সের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ফিজিক্স পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার তো শুধুই ফিজিক্সের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। অংক, ইংরেজিও ফাঁস হয়েছিল।'

এই ঘটনার পর পৃথ্বীশবাবু নিজেই অনুসন্ধান চালালেন। খোঁজ নিতে গিয়ে লোরেটো ডে স্কুলের এক ছাত্রীকে পেলেন। সেও এবারের পরীক্ষার্থী। ছাত্রীটি বলছিল শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর অর্থনীতির প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। ইংরেজি ও অংকের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। দেখেছি আগে থেকে পাওয়া সাইক্লোস্টাইল করা প্রশ্নপত্র পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু এক। মালদার কালিয়াচক হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে অর্থনীতির পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা হলের গার্ড একটি ছাত্রকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা বাদে ধরেছিলেন। যার উত্তর পত্র তার কাছে আগে থেকেই রেডি ছিল। জেরার ফলে ছাত্রটি স্বীকারও করেছিল, সে আগের দিনই প্রশ্নপত্র পেয়ে গেছে। মেদিনীপুরের বিভিন্ন পরীক্ষা সেন্টার থেকেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পান পৃথ্বীশবাবু। বলছিলেন, 'বামফ্রন্টের জমানায় শিক্ষার কি হাল দেখুন। অন্ধ্রপ্রদেশে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ওখানকার শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এখন কি এ রাজ্যের মহামান্য শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস পদত্যাগ করবেন? এ ব্যাপারে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করি।'

এদিকে মেদিনীপুরের বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী দামচন্দ্র বেরা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিরুদ্ধে উচ্চমাধ্যমিকের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৬ মে ৮৮, হাইকোর্টের বিচারপতি মহীতোষ মজুমদার শিক্ষাদপ্তরকে নির্দেশ দেন চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করতে। এই দুই পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখার জন্য পরীক্ষকদের মধ্যে খাতা বিলিও বন্ধ থাকে। এইসঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেন গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এস আই এস আহমেদ।

শিক্ষা সংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের কৌসুলি চন্দ্রনাথ মুখার্জি আদালতকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাবার বিষয়টি সম্পর্কে ঘটনাটি সবিস্তারে জানান। তাঁর কথায়, 'বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার অনেক আগেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে যান। চলতি বছরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষাটি হয় ১৯ এপ্রিল। এই দিনই শ্রীদামচন্দ্র বেরা পরীক্ষার আগে জানতে পারেন স্কুলের বহু ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নপত্র পেয়ে গেছে। এরই পুনরাবৃত্তি হয় ২৬ এপ্রিল অর্থনীতি পরীক্ষায়। তারপরই তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে জেনেও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরীক্ষা বাতিল করেন নি। এর ফলে শিক্ষা সংসদ ভারতীয় সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আসলে এ রাজ্যে পরীক্ষার নামে প্রহসন চলছে।'

আবেদনকারীর কৌসুলি চন্দ্রনাথ মুখার্জি বলেন, 'প্রধান শিক্ষক সমিতির সম্পাদক এই ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এমনকি বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেরও দাবি করেন। অথচ অনিল বিশ্বেসের কাছে জমা রাখা প্রশ্নপত্রের রায় নিতে গিয়ে যুগান্তরের দুই সাংবাদিক অপমানিত হন। এটা কি সন্দেহজনক নয়? উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিলের সভাপতি অনিলাদেবীও স্বীকার করেছেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপার তাঁর কাছে আগাম অভিযোগ এসেছিল। অনিলাদেবী একদল ছাত্র প্রতিনিধির কাছে স্বীকার করেছেন, সাউথ সুবার বান ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্ররা অর্থনীতির সব প্রশ্নই কমন পেয়েছিল।'

২০ মে ৮৮ বিচারপতি মহীতোষ মজুমদারের নির্দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন হয়। দু'জনের এই কমিটিতে থাকেন হাইকোর্টের প্রাক্তন অস্থায়ী প্রধানবিচারপতি আর এম দত্ত এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার দাশগুপ্ত। হাইকোর্টের নির্দেশেই তাঁরা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করবেন।

শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রকাশ্য বিক্ষোভের জোয়ার দেখা যায় বিধানসভায়। বিরোধী পক্ষের বিধায়করা বিধানসভায় এ ব্যাপারে আলোচনার দাবি তুললে স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম এস ইউ

সি সদস্য দেবপ্রসাদ সরকারকে আলোচনার অনুমতি দেন। এতে বাধা দেন ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য দীপক সেনগুপ্ত। বলেন, হাইকোর্টের বিচারাধীন এমন একটি বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা করলে জনগণের মধ্যে তার ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী হতাশায় পড়বে।

যাইহোক হাইকোর্টের প্রসঙ্গ তুলে দীপক সেনগুপ্ত স্পিকারের কাছে প্রস্তাবটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালে স্পিকার জানান, দেবপ্রসাদবাবুর প্রস্তাবটি আমি সংশোধন করে সভায় আলোচনার জন্য অনুমতি দিয়েছি। শুধু হাইকোর্টের বিচারাধীন বিষয়টি নিয়ে সভায় কেউ আলোচনা করতে পারবেন না।

অনুমতি পেয়েই দেবপ্রসাদবাবু মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীকে সরাসরি আঘাত করেন। বলেন, অনিল বিশ্বাস আপনাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্য, 'গণশক্তি'র সম্পাদক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য। তাঁর হাতে প্রশ্নপত্র জমা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে তবু তিনি মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন কেন? কংগ্রেস সদস্য গোবিন্দ নস্কর বিক্ষোভের ঝড় তোলেন। শিক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ্য সমালোচনা করে তিনি বলেন, অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

উচ্চমাধ্যমিক প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে চারদিকে যখন বিতর্ক চলেছে, ঠিক সে সময়ই এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বললেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস যদি দেখতে চান, যান উড়িষ্যা কিংবা বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে নয়। আর এর ঠিক পরেই ঘটে গেল এম বি বি এস ফাইনালের প্রশ্নপত্র ফাঁস। এই কান্তিবাবু তারপর তো একটিও কথা বলছেন না। এমন চুপ করে আছেন যেন এ রাজ্যেই নেই তিনি।

১৬ মে ৮৮ কলকাতা মেডিকেল কলেজের কতিপয় পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলিতেও। বেশ কয়েকজন ছাত্র বিক্ষোভ দেখাতে উপস্থিত হয় প্রিন্সিপালের রুমে। তাদের বক্তব্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কাছে তারা আগাম প্রশ্নপত্র পেয়েছে। তাই তারা পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রিন্সিপাল আশ্বাস দেন, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হবে। প্রমাণ পেলে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে প্রিন্সিপাল বলেন, তারা যেন পরীক্ষা বয়কট না করে। কিন্তু তারপরেও কর্তৃপক্ষ কোনরকম খোঁজখবরের উৎসাহ দেখাননি। যথারীতি প্রতিটি পরীক্ষাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটতে থাকে।

ছাত্ররা বুঝতে পারেন কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাই অভিযোগকারী ছাত্ররা আর চুপ থাকেননি। তারা প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখান। জানা যায়, গাইনোকলোজি দ্বিতীয় পত্রের বহু প্রশ্নই তাঁরা আগে থেকে জানতে পেরেছেন। যেমন-(১) একটি ১৩ বছরের কিশোরীর সুপ্রাপিউবিক ল্যাম্প-এর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এবং ম্যানেজমেন্টের পরিচয়, (২) ইনফার্টিলিটি ইনভেস্টিগেশনস, (৩) পেরিমেনোপজাল ব্লিডিং, (৪) ওভিউলেশন টেস্ট (৫) ওভারিয়ানাসিস্ট, (৬) সাপোর্টস অব ইউটেরাস অ্যান্ড জেনিটাল প্রোলাপস, (৭) ডেভেলাপমেন্ট অব জেনিটাল ট্রাক্ট।

এই সমস্ত ছাত্রদের প্রকাশ্য বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত এম বি বি এস ফাইনালের দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ উপাচার্য (শিক্ষা) ডঃ শ্রীমতী ভারতী রায় নিজেই ছুটে যান প্রশ্নপত্রের ছাপাখানায়। অভিযোগকারী ছাত্রদের কাছ থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নগুলি চেয়ে নেন শ্রীমতী রায়। সেই সঙ্গে পত্রগুলিতে অভিযোগকারী ছাত্রদের সইও করিয়ে নেন। ১৯ মে ৮৮ শ্রীমতী ভারতী রায় পরীক্ষা সমূহের কন্ট্রোলার ও বোর্ড অব স্টাডিজের চেয়ারম্যানের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকের পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপরই শ্রীমতী রায় জানান, এই পরীক্ষা পুনরায় নেওয়া হবে আগামী ৭ জুন ৮৮। সেই সঙ্গে সিন্ডিকেটের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে গোয়েন্দা পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করানো হবে। শুধু তাই নয়, এম বি বি এস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে সিন্ডিকেটের দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়।

এদিকে একদল মেডিকেল ছাত্র আবার অবসটেট্রিকস বিষয়ের পরীক্ষাও বাতিল করার দাবি তোলে। পরীক্ষার প্রথম দিনই ছিল অবসটেট্রিকস। এ বিষয়েও প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে দাবি ওঠে যারা এই বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দিতে নারাজ তাদের গাইনোকলোজি-র নম্বর অবসটেট্রিকস বিষয়ে দেওয়া হোক।

গাইনোকলোজির প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ যুক্ত বলে যে অভিযোগ উঠেছে তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন এই কলেজের গাইনোকলোজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অজয় কুমার ঘোষ। তাঁর কথায়, এই অভিযোগ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। কেননা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কোন অধ্যাপকই ওই প্রশ্নপত্র তৈরি কিংবা মডারেশনের কাজে যুক্ত নন। তাই এই অভিযোগ নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আর এর ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চাপের মধ্যে পড়ছে।

শুরু হয় তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ। টনক নড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্মই তারা নতুন করে সাজানোর চিন্তা ভাবনা করেন। তার ফলে মডারেটর, পেপার সেটার, মনিটারিং সেল-এর আমূল পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সহ উপাচার্য ডঃ ভারতী রায় প্রাথমিক পর্যায়ে ডঃ আজিম রায় ও ডঃ ভট্টাচার্যর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন উপাচার্য ডঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী।

১৯৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্ট টু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি প্রশ্ন পত্র ফাঁসের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি বসানো হয়েছে। এই তদন্তের দায়িত্বে আছেন ডঃ অজয় দত্ত। গত ৩ মে ৮৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের বৈঠকে এই তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এ বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক কিছু ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সেট দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটির জল গড়িয়ে যায় বহুদূর।

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক জানান, নিজের অজান্তেই সেটটি ছাত্রদের হাতে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফল হয় উল্টো। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বোর্ড অব স্টাডিজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এবছর বোর্ড অব একজামিনারস গঠন করা হবেনা।

শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আরও এক পা এগিয়ে। গত বছর জুনে বি এস সি পাশ কোর্সের কেমিস্ট্রির প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন উপাচার্য শংকরীপ্রসাদ ব্যানার্জি। বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ আর লাল জানিয়েছিলেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে জড়িত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী অধ্যাপক। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর ব্যাপারটি তদন্ত করতে গিয়ে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রমাণ পান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা সমূহের কন্ট্রোলারের অফিস থেকে তাঁরা বহু লুকোনো ফাইল ও কাগজপত্র পেয়েছেন। সেই সব ফাইল পত্র থেকে জানা যায় গত বার তের বছর ধরে একটি চক্র প্রশ্ন পত্র ফাঁস ও এই ধরনের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। এই ফাইল পত্রের সঙ্গে পাওয়া যায় বারো বছর আগে বর্ধমান এনফোর্সমেন্ট পুলিশের একটি রিপোর্ট। তদানীন্তন উপাচার্যকে লেখা রিপোর্টটিতে এই দুষ্টু চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। পুরানো রিপোর্টটি পেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও এই চক্রের মধ্যমণি যিনি তিনি একজন অধ্যাপক, বিপদ বুঝে তিনি আগাম জামিন নিয়েই গা ঢাকা দেন।

বোঝাই যাচ্ছে এ রাজ্যে প্রশ্নপত্র নিয়ে চালাও ব্যবসার দিন এসে গেছে। তা না হলে প্রশাসনিক মহলে এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই কেন! অপরেশবাবুর চালোক প্রশাসনের সঙ্গে দুষ্টু চক্রের যোগাযোগ কি সত্যি? শিক্ষামন্ত্রী কান্তিবাবু কি বলেন? তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন প্রশ্নপত্র ফাঁস দেখতে উড়িষ্যা কিংবা বিহার যেতে হবে না। বরং কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যান, চাইলেই পরীক্ষার আগে শতখানেক টাকায় রফা করতে পারেন প্রশ্নপত্রের আগাম কপি।

-বিশেষ প্রতিনিধি

তথ্যসংগ্রহ: তাপস মহাপাত্র।

কেন অলউইনের জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত ?
অলউইন নিজেই নিজের পরিচয়।
যে কোন সময়েই অলউইনের আছে দীর্ঘ ওয়েটিং লিস্ট, আর এতে নাম লিখিয়েছে তারা, নিজের জন্য একটি অলউইন পেতে যারা সানন্দে অপেক্ষা করতে রাজী। কারণ একটি অলউইন রেফ্রিজারেটর নিজেই নিজের আভিজাত্যের স্বাক্ষর।
অলউইন সম্পূর্ণ নীরবে কাজ করে, বছরের পর বছর নির্বিঘ্নে চলে, এবং এতে আছে অতুলনীয় কিছু বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে দেখুন।
হিতাচী নির্মিত কমপ্রেসার
শব্দহীন, সহজ এবং নির্বিঘ্ন কর্মদক্ষতার জন্য।
ভল্টেজ স্টেবিলাইজার অনাবশ্যক
কারণ ১৭০ থেকে ২৫০ ভল্টের মধ্যে আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধি এটি অনায়াসে সহ্য করতে পারে।
বোল বড় ফ্রীজার
এর দরুণ এটি বরফ তৈরী করে আরও দ্রুত। সবজী এবং ফলমূলকে রাখে আরও সতেজ।
সেলফ ড্রেইনিং পদ্ধতি
বোতামটি টিপে দিলেই বরফ গলতে থাকবে দ্রুত এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে।
সংরক্ষণক্ষমতা বেশী
অন্যান্য রেফ্রিজারেটরের তুলনায় অলউইনের শাকসবজী এবং বরফের ট্রের আয়তন সবচেয়ে বেশী।
সুঠাম দীর্ঘ এবং সুন্দর গঠন
অন্যান্য ছাঁচের তুলনায় এটি অনেক কম জায়গা নেয়।
বর্ণময় কমারী মডেল
অলউইন আপনি পাবেন ১৬৫ এবং ৩০০ লিটারের একদরজা এবং দু-দরজার মডেলে এবং বেছে নিতে পারবেন একাধিক আকর্ষণীয় রঙের মধ্যে থেকে আপনার পছন্দ মত যে কোন রং।
নির্ভরযোগ্য ৭ বছরের গ্যারান্টি
বছরের পর বছর নির্বিঘ্নে কাজ দেবে।
সারা দেশ জুড়ে সার্ভিসের ব্যবস্থা
ফোন করলেই পাবেন ত্বরিত সার্ভিস।
অলউইন আপনাকে দিচ্ছে একটি অভিনব প্রোটেকশন্ কনট্রাক্ট।★
ALLWYN
SL 2
SL 3
SL 4
SL 5
অলউইন.. চমৎকার চলে চিরদিন!

ট্রাভেল এজেন্সি : পর্যটন ও প্রতারণা

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালিকে পর্যটনের টুকিটাকিতে সাহায্য করার জন্য তৈরি 'ট্রাভেল এজেন্সি' এখন 'প্যাকেজ ট্যুর'-এর মধ্যে দিয়ে উইকএণ্ড, কাপল ও তীর্থযাত্রার সফর ব্যবস্থায় আয়াসলভ্য পরিবর্তন এনেছে। যৌথভাবে বিদেশযাত্রা ও ছোট্ট ছুটির মজা পেতে ট্রাভেল এজেন্সিগুলিই ভরসা। এজেন্সিগুলি কি কি কার্যক্রম নিয়েছে? পুজায় কোন এজেন্সির কি রকম সফর পরিকল্পনা? কতদিন আগে কিভাবে ট্যুর বুক করা যাবে? ট্রাভেল এজেন্সিতে ইদানিং এত পুলিশরেড হচ্ছে কেন? কলকাতার ট্রাভেল এজেন্সিগুলির সালতামামির সঙ্গে পর্যটনের প্রস্তুতি ও প্রতারণা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোকপাত। সঙ্গে পূজাবকাশের ট্যুরটেবিল।

শ্রীপতি কুণ্ডু ছিলেন খড়্গপুর লাইনের খুব পপুলার লোক। খড়্গপুর থেকে পুরীর সব স্টেশনেই তাঁর স্টল। আর ছিল রেলের ক্যাটারিং-এর ব্যবসা। এমনি করেই চলে যাচ্ছিল দিন। হঠাৎ একদিন মাথায় চেপে বসল ট্রাভেল এজেন্সির ভূত।

করিতকর্মা শ্রীপতি কুণ্ডু বসে থাকার লোক নন। সেটা ছিল ১৯৩৩ সাল। বৃটিশেরা রয়েছে বহাল তবিয়তে, দোকান বাজারে জিনিসপত্র মোটামুটি সস্তা। বাঙালিদের বেড়াতে যাওয়ার বাতিক বাড়ছে। অথচ টিকেট কাটা, হোটেল বুকিং, বিদেশ বিভূঁই-এ দেখাশোনা, গাইড করার লোক নেই। ভ্রমণার্থীদের এইসব অসুবিধা লক্ষ্য করে শ্রীপতিবাবু ভ্রমণপিপাসু বাঙালির ব্যক্তিগত বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন। পত্তন করলেন 'কুণ্ডু স্পেশাল'-এর। খড়্গপুরে মেন অফিস। ব্রাঞ্চ কলকাতায়। শুরু হয়ে গেল ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা। কুণ্ডুমশাই এর পদবী অনুসারে এজেন্সির নাম। একটা স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করে সারা ভারতে দীর্ঘ ভ্রমণ দিয়েই গোড়াপত্তন হলো সাধারণ বাঙালির ট্রাভেল এজেন্সি কুণ্ডু স্পেশালের। প্রথম ভেনচার 'ভারত ভ্রমণ ১৯৩৩' সাকসেসফুল। তারপর থেকে সমানে ছুটে চলেছে ঘোড়া। শ্রীপতি কুণ্ডু মারা গিয়েছেন ১৯৭২ সালে। ছ'জন ছেলের মধ্যে সুকুমারবাবু এখন ধরে রয়েছেন ব্যবসার হাল। পার্টনারশিপের ব্যবসার দেখাশুনো করেন তিনিই। সুকুমারবাবু জানালেন, 'ট্রাভেলিং বিজনেস ইজ মোস্ট একসাইটিং।'

কুণ্ডু স্পেশালের নাম আজ ভারত বিখ্যাত ট্রাভেল এজেন্সির ইতিহাসে। তাদের নাম পাদপ্রদীপে আসার পেছনে আছে শ্রীপতি কুণ্ডুর কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। সামান্য অবস্থা থেকে যারা বড় হন, তাঁদের জীবনে সংগ্রামই যেমন মূলসত্য এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। স্ট্র্যান্ড রোডের অফিসে বসে সুকুমারবাবু শোনাচ্ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের কর্মময় ইতিহাসের কথা। 'জানেন, অনেক কষ্ট করে আজকে আমরা এই সুনাম পেয়েছি। আজ আমাদের যে এই রমরমা ব্যবসা তা একদিনে হয় নি।' অফিসের অ্যাকাউন্টসে ছ'জন মানুষ ব্যস্ত হয়ে টাকা গুনছেন। আরও ১৮জন কর্মী ভ্রমণার্থীদের সহায়তায় ব্যস্ত। ঘন ঘন আসছে টেলিফোন। 'কুণ্ডু স্পেশাল'!

বছরে গড়ে ৬০টা করে ট্যুর ঠিক হয়। অধিকাংশই ট্রেন ভাড়া করে। বেশ কিছু 'প্যাকেজ ট্যুর' বিমানেও। ইতিমধ্যেই দুবার প্লেনে করে ইওরোপে প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আপাতত অবশ্য সেরকম প্রোগ্রাম নেই। সুকুমারবাবু জানালেন, তাঁদের কাছে বিত্তবান, আপার ক্লাসের লোকজনও যেরকম আসেন, তেমনই ভিড় মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও। কেউ কেউ চিঠি লেখেন দূরের গ্রাম থেকেও, জমানো পয়সাতে তারা

ভারত ঘুরতে চান। যুবক যুবতীদের টান কাশ্মীর, হিল স্টেশন কিংবা দক্ষিণ ভারত, আর বয়স্কদের কেদার–বদ্রীনাথ, হৃষিকেশ–এইসব তীর্থযাত্রায়।

কুণ্ডু স্পেশালের নিয়মকানুনগুলো এই ফাঁকে বলে নেওয়া যেতে পারে। যারা প্রথম শ্রেণীতে যেতে চান তাদের পাঁচশ টাকা দিয়ে স্থান সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৩০০ টাকা। আর বাকি টাকা যাবার পনেরো দিন আগে জমা করে দিতে হবে। পাঁচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত শিশুদের টিকিটের মূল্যে শতকরা দশ টাকা কম, আর যদি শিশুদের জন্য আলাদা সীট না নেওয়া হয় তাহলে শতকরা পঞ্চাশ টাকা কমে যায়।

কলকাতা পুলিশের হিসেব মত আইনী এবং বেআইনী মিলে মহানগরে ছোটবড় ট্রাভেল এজেন্সি আছে ১৪০টি। এরা বছরে কম করেও শুধু বৃহত্তর কলকাতা থেকেই ৮ কোটি টাকার ব্যবসা করে। এর মধ্যে যেমন ভারত ভ্রমণ, দক্ষিণ ভারত যাত্রা, ধর্মযাত্রা, হনিমুন ট্রিপ, শৈলশহরে ভ্রমণ আছে, তেমনি আছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেকার বীরভূমের মাতৃপীঠ দর্শন, দীঘা ভ্রমণ, উত্তরবঙ্গ সফরের মত কম দূরত্বের প্যাকেজ ট্যুরগুলি। কলকাতায় এই ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা ইদানিং বেশ রমরম করেই চলছে।

ইনসাইড পশ্চিমবঙ্গের প্যাকেজ ট্যুরগুলি ২/৩ দিনের ছুটি ছাটা, বড়দিন, দুর্গোৎসব, এসব উপলক্ষেই হয়। এতে ট্রাভেল এজেন্সিগুলি থাকা, খাওয়া, গাইডের কাজেও সাহায্য করে। এরকমই সাহায্যকারী ভ্রমণসংস্থা বেলেঘাটা লঞ্চ ট্যুর অ্যাসোসিয়েশন। এরা লঞ্চে করে সুন্দরবনের জলপথে ২/৩ দিনের ট্যুর করায়। মাথাপিছু লাগে ৭৫ টাকা। তবে আসল ব্যবসা বড়দের।

কুণ্ডু স্পেশালের কয়েকটা বাড়ি পরেই ঘোষ স্পেশাল। মালিক আশুতোষ ঘোষ এই এজেন্সির অফিস খোলেন ১৯৬৪ সালে। প্রথম দিকে বহু ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে। এখন প্রতিষ্ঠিত ঘোষ স্পেশাল কেদার-বদ্রী থেকে শুরু করে কাশ্মীর-ভ্রমণের প্রোগ্রাম নিয়েছে। ঘোষ স্পেশালের মুখোমুখি ভারততীর্থ দর্শন ট্রাভেল এজেন্সি। এদের প্রোগ্রাম শ্রীবৃন্দাবন তথা উত্তর ভারত থেকে দ্বারকা ধাম, রাজস্থান, গুজরাট সমেত মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের দর্শনীয় স্থান। এছাড়া রামেশ্বরধাম, কন্যাকুমারী সমেত দক্ষিণ ভারত। একদিকে যেমন মাদ্রাজ, তিরুপতি, পণ্ডিচেরী ও ব্যাঙ্গালোর ঘোরানোর ব্যবস্থা আছে, তেমনই পুরী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষী-গোপাল নিয়ে যাচ্ছে এই এজেন্সি। পরিচালক শিবপদ রক্ষিতের মতে, সাধারণ মানুষের দেশ ঘোরার ইচ্ছে থাকলেও সঠিক গাইডলাইন, সাহচর্য পায় না। আমরা তা দেবার চেষ্টা করি।

১৯৩৩ সালে ১টি মাত্র এজেন্সি নিয়ে যে ব্যবসার শুরু এ রাজ্যে তা আজ মহীরুহ প্রায়। ১৯৮৮ সালে তার সংখ্যা ১৪০টি। এদের অধিকাংশই ছোট, কিছু বা বেশ বড়। এরকমই কিছু সংস্থা হলো বিষ্ণু ট্যুরস, ব্যানার্জি স্পেশাল, মহারাজা ট্রাভেল, তিরুপতি ট্রাভেলস্, সীতা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল, টি·সি· আই ইত্যাদি। মধ্য কলকাতার অফিস পাড়ায় মার্টিন বার্ন হাউসের দোতলাতে ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য সংস্থা 'ফোর সীজন্স ট্রাভেল অ্যাণ্ড ট্যুরস (প্রাইভেট) লিমিটেড' ইতিমধ্যেই দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। কলকাতার ট্রাভেলিং এজেন্সির জগতে বিশিষ্ট এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কে পোদ্দার বয়সে যথেষ্ট তরুণ। তাঁদের "কাশ্মীর-শ্রীনগর প্যাকেজ ট্যুর" ভ্রমণার্থীদের মনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কলকাতা ছাড়াও ভুবনেশ্বর, জামশেদপুর, রাঁচি ও গুয়াহাটিতেও রয়েছে এদের অফিস।

কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্র,পর্যটনের হাতছানি সর্বত্রই

কাশ্মীর ট্যুরে লাক্সারি গাড়ি এমনকি হেলিকপ্টারেও ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে এরা। কাশ্মীরের বিখ্যাত ডাল লেক, নাগিন লেক ঘুরে দেখানোর জন্য এই সংস্থা ডিলাক্স হাউস বোট চড়ার সুবিধে দিচ্ছে। বিভিন্ন ছুটির দিনে 'ফোর সীজন্স' এই ট্যুরগুলির ব্যবস্থা করে থাকে এদের কাঠমাণ্ডু ট্যুরের জন্য মাথাপিছু খরচ পড়বে যথাক্রমে ৪৯৯ টাকা, ৮৯৯ ও ৯৯৯ টাকা। থ্রি স্টার হোটেলের জন্য ৪৯৯ টাকা এবং ফাইভ স্টার হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা থাকছে ৮৯৯ ও ৯৯৯ টাকার ট্যুরে। এই টাকা শুধু বিমানযাত্রা ও হোটেল চার্জের জন্য, সেইসঙ্গে ব্রেকফাস্ট। এই ট্যুরের সময়কাল তিনদিন। লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ আলাদা। এদের কাছে বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণার্থী আসেন। তাদের ঠিক ঠিকভাবে বেড়ানোর ব্যবস্থা করা, গাইড দেওয়া, হোটেল বুকিং করার দায়িত্ব এইসব এজেন্সির। তবে ভ্রমণার্থীদের এর বাইরেও চাহিদা আছে। একেকজনের একেক রকমের চাহিদা।

এতো গেল প্রাইভেট এজেন্সিগুলির কথা। এবার আসা যাক কেন্দ্রিয় সরকারের ইণ্ডিয়া ট্যুরিজাম ডেভ্লপ্মেন্ট করপোরেশনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। এই করপোরেশনের চারটি শাখা। চৌরঙ্গী রোডের এভারেস্ট হাউসের অফিসটি পূর্বাঞ্চলের ভ্রমণার্থীদের জন্য। এদের প্রোগ্রাম একটু আলাদা ধরনের। বড় বড় সংস্থার 'লিভ ট্রাভেল কনসেসন্' নিয়ে জনা চল্লিশেকের একটি দল তৈরি হলে এই করপোরেশন তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই যৌথ ভ্রমণের ভাড়াতে শতকরা দশ ভাগ ছাড় দেওয়া হয়। 'লিভ ট্রাভেল কনসেসন' হলো সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের সংস্থা স্ট্যাটাস অনুযায়ী ভ্রমণভাতা বাবদ যে টাকা দেয়। বেসরকারি ফার্মে এটি এল·টি·এ বা লিভ ট্রাভেল অ্যালাউন্স নামেও পরিচিত। কেন্দ্রিয় সরকারের আওতায় ভারতীয় রেল, ব্যাংকগুলি ও আণ্ডারটেকিং করা শিল্প সংস্থাগুলি এক শ্রেণীর কর্মী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের এই 'ভ্রমণভাতা' দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এল·টি·এ-র প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কলকাতায় জেনারেট হয়। চৌহান ট্রাভেলস, মিত্র ট্রাভেলস, গ্রেওয়াল ট্রাভেল মূলত লাক্সারি বাস ভাড়া দেয়। সেই লাক্সারি বাসে যাওয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়াও আই·টি·ডি·সি·র নিজস্ব বাহন আছে।

তবে বর্তমানে আই·টি·ডি·সি আকাশ পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করছে। সেইসঙ্গে হোটেলে থাকবার ও আরামদায়ক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শিখা সিন্হা জানালেন, কতগুলি নতুন প্যাকেজ দিচ্ছেন তাঁরা। এগুলি হলো স্টুডেন্ট প্যাকেজ। এছাড়াও রয়েছে ইউ অ্যাণ্ড মী ট্যুর প্যাকেজ, উইক এণ্ড প্যাকেজ। এই উইক প্যাকেজে শুক্রবার রাত ৮টায় ধর্মতলা থেকে যাত্রা শুরু, সোমবার সকাল ৮টায় ফিরে আসবে

ট্রাভেল এজেন্সির পুজো প্যাকেজ ১৯৯৮

এজেন্সির নাম	প্যাকেজের ধরন	লক্ষ্যস্থল	দর্শনীয় স্থান	খরচপত্র	থাকার ব্যবস্থা
ট্যুর স্পেশাল	ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পরিবার সহ অথবা অফিস, স্কুলের একটি দলের সঙ্গে (খরচের হিসেব মাথা পিছু) পরিবহন: ট্রেন ও বাস	১) দক্ষিণ ভারত ২) উত্তর ভারত ৩) কাশ্মীর ৪) রাজস্থান, গুজরাত	মহাবলী পুরম পক্ষীতীর্থম পন্ডিচেরি কন্যাকুমারী মহীশূর বৃন্দাবন গার্ডেন্স যোধপুর, চিতোরগড়, আমেদাবাদ, পোরবন্দর	২২০০ টাকা ১৯০০ টাকা ১৮০০ টাকা ২০০০ টাকা	এজেন্সি সুবিধেজনক হোটেলে থাকা ও ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের ব্যবস্থা করবে।
[illegible] স্পেশাল	"	দ্বারকা, রাজস্থান ও গুজরাট	দ্বারকাধাম, সবরমতী, আমেদাবাদ, জয়সলমীর, পিংক সিটি, চিতোর, ভরতপুর পক্ষীনিবাস	২৫২৫ টাকা	দুই তারকা বিশিষ্ট হোটেলে খাওয়া থাকা
ব্যানার্জি স্পেশাল	"	১) দক্ষিণ ভারত, ২) দ্বারকা-রাজস্থান ৩) গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, ৪) কাশ্মীরসহ সমগ্র উত্তর ভারত, ৫) বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র	উটি, কন্যাকুমারী, [illegible] এইসব অঞ্চলের আকর্ষণীয় বিশিষ্টস্থান	২১৯৫ টাকা ২৬৫০ টাকা ১৯৫৫ টাকা ২২২৫ টাকা ২০৯৫ টাকা	তিন তারকা বিশিষ্ট হোটেলে [illegible] থাকার ব্যবস্থা
মহারাজা ট্রাভেলস্	"	১) হিমালয় অঞ্চল (শ্রীনগর) ২) গুজরাট-রাজস্থান ৩) কেদারবদ্রী ৪) কুলু-মানালি ৫) কাঠমান্ডু ৬) দক্ষিণ ভারত	কাশ্মীরের দর্শনীয় স্থান সহ ডাল লেক, পহেলগাঁও, সোনমার্গ ঐতিহাসিক স্থানগুলি	১৭৭৫ টাকা ২৩২৫ টাকা ২৪২৫ টাকা ২০২৫ টাকা ১৭৭৫ টাকা ১৯২৫ টাকা	দুই তারকা বিশিষ্ট হোটেলে [illegible]
বিষ্ণু ট্রাভেলস্	"	১) কাশ্মীর ২) কুলু-মানালি ও সিমলা ৩) দক্ষিণ ভারত ৪) নেপাল কাঠমান্ডু	শ্রীনগর, [illegible], নাগিন লেক, উটি, কন্যাকুমারী, কাঞ্চিপুরম [illegible]	১৫৫০ টাকা ১৫৫০ টাকা ৩০৫০ টাকা ৯২৫ টাকা	তিন তারকা বিশিষ্ট হোটেলে থাকার ব্যবস্থা
[illegible] ট্রাভেলস	"	১) কাশ্মীর ২) কুলু মানালি ও সিমলা ৩) কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ	উত্তর ভারতের শৈলশহর ও দর্শনীয় একমাত্র কাশ্মীরের খরচ বহন করবে এজেন্সি বাকি স্থানের খরচ বহন করতে হবে যাত্রীদের	১৬২৫ টাকা ১৮২৫ টাকা ১৩২৫ টাকা	দুই তারকা বিশিষ্ট হোটেলে কাশ্মীর বাদে অন্য ধর্মীয় স্থানে ধর্মশালা বা আশ্রম মূলক হোটেল

* এ পর্যন্ত মঞ্জুর পাওয়া গেছে।

বাস। এই প্যাকেজটি পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এর জন্য পড়বে ১২৫ টাকা। এটি শুধু পরিবহন ও থাকার চার্জ। ১২ বছরের দুজন বাচ্চার থাকবার খরচ লাগবে না। ব্রেকফাস্ট ফ্রি। খাওয়ার খরচ যাত্রীর নিজস্ব।

কলকাতায় বসে ট্যুরিস্ট স্পটে অশোক গ্রুপের যে কোন হোটেলে বুকিং এর ব্যবস্থা করে এই করপোরেশন। ধরা যাক ১৫ জনের একটি দল যাচ্ছে, কিংবা কোন কনফারেন্স হবে অথবা কোম্পানির টপ বস্ আসবেন কর্পোরেট মিটিং এ এইসব বুকিং হবে এই করপোরেশনের মাধ্যমে। এমন কি বসকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে অশোক গ্রুপের হোটেলে নেবার ব্যবস্থা তারাই করে দেবে। এ ব্যাপারে নানা সংস্থা তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে। দিল্লির যাত্রী নিবাসের চার্জ ১৪৫ টাকা। বাকিগুলি ৪৫০ থেকে ৫০০র মধ্যে। অশোক গ্রুপের সারা ভারতের হোটেলগুলির স্বাচ্ছন্দ্য সর্বজনবিদিত। দিল্লির অশোক হোটেলে ইউরোপিয়ান প্ল্যানে সিঙ্গল পড়বে ১১০০ টাকা, ডাবল/টুইন ১২০০ টাকা, এক্সিকিউটিভ সুইট ১৮০০ টাকা, ডাবল সুইট ৩০০০ টাকা, ডিলাক্স ৬৫০০ টাকা, প্রেসিডেন্সিয়াল ৯৫০০ টাকা এবং গ্রুপ এর জন্য মাথাপিছু ৮২০ টাকা।

সরকারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্সিগুলিও ইদানিং এ ধরনের আয়োজন শুরু করেছে। ক্যালকাটা ট্রাভেলস সূত্র থেকে জানা যায়, বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পটগুলিতে এই ধরনের হোটেল–লজ বুকিং-এ বেশ সাড়া পাওয়া গিয়েছে। আর বেনারস, পুরী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, তিরুপতি, কামরূপ কামাক্ষা, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ স্থানগুলিতে লজিং-এর অ্যাডভান্স বুকিং এর চাহিদা বেশি। তবে এ ব্যাপারে আপার ক্লাসের থেকে মিড্ল ক্লাসের বেশি ভিড়। তাদের মতে, আপার ক্লাস সব সময় সফিস্টিকেটেড্ কমফোর্ট আশা করে। সেক্ষেত্রে তারা তারকাচিহ্নিত হোটেল বেশি পছন্দ করে থাকে।

'ইউ অ্যান্ড মী' ট্যুরে ছোট পরিবার, নবদম্পতি, হনিমুন কাপ্ল কম পয়সায় প্রমোদ ভ্রমণের সুযোগ পায়। এদের চাহিদা হিল স্টেশন, সমুদ্রতীর বা অরণ্যময় পরিবেশ। এরকম প্যাকেজ ট্যুরের জন্য বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে প্রাইভেট এজেন্সিগুলি ব্যবস্থা শুরু করে।

ট্রাভেলিং ব্যবসাতে যারা জড়িত রয়েছে, তাঁরা সব সময়ই এই পেশাকে অ্যাডভেঞ্চারাস বলে বর্ণনা করেন। ভারততীর্থ দর্শনের পরিচালক শিবপদ রক্ষিত অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন, 'ধরুন, পঞ্চাশ জনের একটি দল নিয়ে গেলাম। এর মধ্যে সাত আটজন বাচ্চা রয়েছে। এছাড়া অন্য পনেরো মহিলা রয়েছে। তাদের নিয়ে ট্যুর ম্যানেজ করা কি মুস্কিলের ব্যাপার তা বলে বোঝানো যায় না! একবার রাজস্থানে একটি গ্রুপের এক মহিলা হঠাৎ মাঝপথে হারিয়ে যান। খোঁজ খোঁজ। বহু

আইটিডিসি-র পরিকল্পনা

খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেল এক রাস্তার মোড়ে। রাস্তা হারিয়ে কান্নাকাটি করছেন। এরকম হয় মাঝে মধ্যে। তবে এজেন্সির লোকজনেরা সর্বদাই যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভাবেন। নামজাদা মন্দির দর্শনের সময় প্রচুর ভিড় থাকে। সেই ভিড় থেকে মহিলাদের রক্ষা করার ব্যাপারে এজেন্সির তরফ থেকে ট্যুর ম্যানেজার এবং আরও তিনচার জন গাইড কাম ইন্সট্রাক্টরদের সর্বদাই প্রখর নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া থাকে।

কিন্তু ট্রাভেল এজেন্সির বেশ কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে জনমানসে ইদানিং যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি লালবাজার স্ট্রীটের জগন্নাথ ট্রাভেলের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে দায়ের করা হয়েছে প্রতারণার মামলা। কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি সেক্‌সান সূত্রে জানা যায় যে, জগন্নাথ ট্রাভেল গ্রীষ্মাবকাশে বোম্বে ও গোয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। তারা ভ্রমণ পথের নির্দিষ্ট জায়গায় হোটেল বুকিং-এর দায়িত্ব নেয়। কিন্তু বোম্বেতে গিয়ে দেখা যায়, তাদের নামে ওখানে আদৌ কোন হোটেল বুক

'সিতা' ট্রাভেলসের কলকাতা অফিস

করা হয়নি। পর্যটকরা পড়েন ফ্যাসাদে। গোয়ায় তাদের নিয়ে নিম্ন শ্রেণীর হোটেলে রাখা হয়। অথচ বুকিং অ্যাডভান্স নেওয়ার সময় মানোপযোগী হোটেল–ব্যবস্থার টাকা নেওয়া হয়। প্রতিবাদ করেন যাত্রীরা। এরপর জগন্নাথ ট্রাভেলের ট্যুর ম্যানেজার তাদের জানায় যে, তাঁর কাছে যথেষ্ট টাকা নেই। সুতরাং ভ্রমণার্থীরা যেন নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করেন। একথাতে ভ্রমণার্থীরা রেগে যান কিন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ের পরিস্থিতিতে তেমন মারাত্মক কিছু ঘটে না।

ঠিক এরকমই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে মাদ্রাজে। সেবার ট্যুর ম্যানেজার সেখান থেকে পালিয়ে যায় পর্যটকদের বিপদে ফেলে। তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন ভ্রমণার্থীরা। তারপরই বেচারাম দত্ত লেনের কমল পাল জগন্নাথ ট্রাভেলের বিরুদ্ধে ৩০,০০০ টাকা প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের সূত্র ধরে লালবাজার তদন্তে নেমে জগন্নাথ ট্রাভেলের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে। গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র থেকে আরো জানা যায়, এই জগন্নাথ ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে কমল পালের অভিযোগের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। ব্যতিব্যস্ত পুলিশ খানাতল্লাশ করে জানতে পারে যে, এর আগেও এই এজেন্সি ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটায়। কমল পালের অভিযোগ ছাড়া প্রতারণার বড়সড় অভিযোগ ছিল জনৈক গণেশ সেনের। গণেশবাবুর অভিযোগ, তাকে পাঁচতারা হোটেলের সুযোগ সুবিধে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোম্বাই এর একটি নিম্নশ্রেণীর হোটেলে রাখা হয়। এই ভ্রমণ বাবদ তিনি ১৭,০০০ টাকা জগন্নাথ ট্রাভেলের ম্যানেজারকে দেন। কিন্তু তিনি তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ওখান থেকে ফিরে এসে একটি এফ আই আর করে আনুপূর্বিক ঘটনা জানান।

এইসব ট্রাভেল এজেন্সিগুলি সম্পর্কে তদন্ত করতে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্সির বৈধ কোন লাইসেন্স নেই। এছাড়া এজেন্সিগুলির প্রতারণার অভিযোগ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় না কারণ দুপক্ষই প্রায় পুলিশ বা আদালতে না গিয়ে ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই মধ্যস্থতা করে নেন। ফলে চলতি মাসেই ছটি ট্রাভেল এজেন্সিতে পুলিশ হানা দিয়েছে। এই ছটির মধ্যে পাঁচটির কোন লাইসেন্স নেই।

গোয়েন্দা পুলিশের মতে, লাইসেন্স বিহীন ট্রাভেল এজেন্সির লোকজনেরা বিভিন্ন দালাল মারফত ভ্রমণার্থী সংগ্রহ করে থাকে। স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। কিন্তু এইসব ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা স্ট্যাম্প-প্যাড সর্বস্ব ট্রাভেল এজেন্সি সম্পর্কে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা।

এইসব বিচ্ছিন্ন অভিযোগ বাদ দিলে ট্রাভেল এজেন্সির কাজকর্ম মোটামুটি সন্তোষজনক। কলকাতাতে প্রায় ১০টি নামী ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে। এই এজেন্সিগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ উচ্চ মতই পোষণ করেন। এই প্রতিবেদকের সামনে কুণ্ডু স্পেশালের এক নিয়মিত ভ্রমণার্থী জানালেন যে তিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে কুণ্ডু

ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে মাদ্রাজে। সেবার ট্যুর ম্যানেজার সেখান থেকে পালিয়ে যায় পর্যটকদের বিপদে ফেলে। তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন ভ্রমণার্থীরা। তারপরই বেচারাম দত্ত লেনের কমল পাল জগন্নাথ ট্রাভেলের বিরুদ্ধে ৩০,০০০ টাকা প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের সূত্র ধরে লালবাজার তদন্তে নেমে জগন্নাথ ট্রাভেলের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে।

স্পেশালের তত্ত্বাবধানে যাতায়াত করছেন।

কথায় কথায় সেদিনকার দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি চারণ করলেন কুণ্ডু স্পেশালের কর্মীরা। সেদিন কংগ্রেস নেতা ও জবরদস্ত বিধায়ক সুব্রত মুখার্জির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ঠিক মত যেতে পারেনি বলে একদল লোক এসে অফিস ভাঙচুর করেছিলেন। আহত হয়েছিলেন দুজন কর্মী। এই ঘটনার কথা জানিয়ে কুণ্ডু স্পেশালের জনৈক ম্যানেজার জানান যে তাদের নিয়মকানুনে স্পষ্টই লেখা আছে যে অনিবার্য কারণে ভ্রমণ বাতিল হতে পারে। তা নিয়ে কেউ উচ্ছৃংখলতা করলে সেটা খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার।

ট্রাভেল এজেন্সির আরেকটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে তিন বছর আগে। কালীঘাটের ভট্টাচার্য স্পেশাল সেবার ২০০ জন

ফরেন প্যাকেজিং (বিমানযাত্রা)

এজেন্সির নাম	প্যাকেজের ধরন	গন্তব্যস্থান	দর্শনীয় স্থান	খরচাপাতি	ব্যবস্থা
সীতা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল (ইন্ডিয়া) প্রা: লি: ফোন: ২৪৭২২৪ ২৪০২৩৫	কাপল, পারিবারিক ট্যুর, কোম্পানি ট্যুর, এক্সকারশান	ইওরোপ: ইতালি, সুইজারল্যান্ড, প: জার্মানী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড	রোম, ফ্লোরেন্স, পিসা, ভেনিস, লুকার্ন, ফ্রাংকফুর্ট, হাইডেলবার্গ, আমস্টারডাম, ব্রাসেলস, প্যারিস, লন্ডন	১৭,৯৮০ টাকা (প্রাপ্তবয়স্ক) ভায়া দিল্লি-বোম্বাই ১৯,২৪০ টাকা ভায়া আগ্রা-কলকাতা; ৯,৩৮০ টাকা ও ১১,১১৫ টাকা (শিশুদের জন্য) *	পাঁচ তারকা বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর হোটেলে ব্রেকফার্স্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের ব্যবস্থা
		আমেরিকা	নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, লাস ভেগাস, সানফ্রান্সিসকো, অরল্যান্ডো, মিয়ামী, ওয়াশিংটন, রোচেস্টার, নায়াগ্রা ফলস	২৬,৯৭০ টাকা (প্রাপ্তবয়স্কদের) ভায়া দিল্লি-বোম্বাই ২৭,৫৭০ টাকা ভায়া আগ্রা-কলকাতা; ১৩,৮৯৫ টাকা ও ১৩,২২৫ টাকা (শিশুদের জন্য) **	
ট্রাভেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ফোন: ৪৪১১৭৬ ৪৪৩৮৯০	দম্পতি, পারিবারিক, অফিস ট্যুর	ইওরোপ ও আমেরিকা	বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান	২০,৯০০ টাকা	প্রথম শ্রেণীর পাঁচ তারকা হোটেলে ব্রেকফার্স্টসহ সুব্যবস্থা লাঞ্চ ও ডিনার আলাদা
ফোর সীজন্স ফোন: ২০৩৩৭৬ ১০৩৩৭২	কাপল অথবা পারিবারিক	নেপাল	কাঠমান্ডু	৩৯৯ টাকা ৪৯৯ টাকা ৮৯৯ টাকা ৯৯৯ টাকা	প্রথমটির জন্য দুই তারকা বিশিষ্ট হোটেল, দ্বিতীয়টির জন্য তিন তারকা বিশিষ্ট হোটেল ও তৃতীয় ও চতুর্থটির জন্য পাঁচ তারা হোটেল।
ইন্টারলিংক ফোন: ৪৮২০৩৫	ব্যক্তিগত, পারিবারিক কাপল এবং কোম্পানি ট্যুর	কাঠমান্ডু	সমস্ত দর্শনীয় স্থান	৫৫৫ টাকা	লজিং ও ব্রেকফার্স্ট, লাঞ্চ ও ডিনার আলাদা

* এর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ২৯০ ডলার ও শিশুদের জন্য ১০০ ডলার অতিরিক্ত লাগবে।
** অতিরিক্ত ১৯০ ডলার শিশুর এবং বয়স্কর ৩০০ ডলার।

ভ্রমণার্থী নিয়ে গিয়েছিল অমরনাথে। ঢালু পাহাড়ী রাস্তায় যেতে গিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিল বাস। ৮ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ভ্রমণার্থীদের ছেড়ে ম্যানেজার পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

এ রকম নানা ধরনের ঘটনা রয়েছে প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্সিদের নিয়ে। কলকাতা পুলিশ পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, প্রতিষ্ঠিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলো ছাড়া বাকি অধিকাংশ এজেন্সীই রীতিমত প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। সাধারণ মানুষেরা যাতে সময়ে সচেতন হন, এ জন্য পুলিশ কতগুলি গাইড লাইন দিয়েছেন। প্রথমত বেসরকারি ট্রাভেলিং এজেন্সির রসিদগুলি সযত্নে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত সব সময়ই প্রতিষ্ঠিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্রাভেলিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তৃতীয়ত প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পারলেই যে প্রদেশেই থাকুন না কেন তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী থানাতে ডায়েরি করাতে হবে।

কলকাতা পুলিশের রেকর্ড মোতাবেক, কলকাতাতে খবরের কাগজে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপিত পঁচিশটি ট্রাভেল এজেন্সির মধ্যে পনেরোটির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এসেছে। তাই লাইসেন্স বিহীন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান প্যাকেজ ট্যুরের অস্থায়ী ব্যবস্থা করে তাদের হাতে

কুণ্ডু স্পেশালের মালিক সুকুমার কুণ্ডু

আগাম টাকা দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কলকাতা পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে যে এইসব ট্রাভেল এজেন্সিগুলির রেজিস্টার্ড অফিস বলতে কিছু নেই। তাদের হাতে টাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভ্রমণে যেতে পারেন নি—এরকম শতাধিক অভিযোগ পেয়েছেন কলকাতা পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর। এই বিষয়টি ভালো করে খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ সেল গঠিত হয়েছে এ বছর মে মাসে।

ভ্রমণে বেরিয়ে কেই বা বিপাকে পড়তে চায়? রোজগারের টাকা তিল তিল করে জমিয়ে ভ্রমণ পাগল মধ্যবিত্ত বাঙালি ভারত ঘুরে দেখতে চায়। পূজাবকাশ ও গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘভ্রমণে একমাত্র কলকাতা থেকেই প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ বাংলার বাইরে বেড়াতে বের হন। ভারতীয় রেল দপ্তরের

মানুষেরা যাতে সময়ে সচেতন হন, এ জন্য পুলিশ কতগুলি গাইড লাইন দিয়েছেন। প্রথমত বেসরকারি ট্রাভেলিং এজেন্সির রসিদগুলি সযত্নে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত সব সময়ই প্রতিষ্ঠিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্রাভেলিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তৃতীয়ত প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পারলেই যে প্রদেশেই থাকুন না কেন তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী থানাতে ডায়েরি করাতে হবে।

কলকাতার অফিসগুলি থেকেই প্রায় দশ কোটি টাকার টিকিট বিক্রি হয় ওই সময়। তার ৯০ শতাংশ বহির্বঙ্গের গন্তব্যে যাত্রী পর্যটকদের। এর বাইরে পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ প্যাকেজ ট্যুর থেকে মাঝারি মানের ট্রাভেল এজেন্টরা এই দুই সিজিনে ১০ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেন।

অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষায় মধ্যবিত্ত ছাপোষা বাঙালি সারা বছর ধরে তিল তিল করে টাকা জমায়। সব সময় নিজ উদ্যোগে টিকিট কাটা, রিজার্ভেশন করা বা বাইরে অ্যাডভান্স হোটেল বুকিং করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বড় ভরসা ট্রাভেল এজেন্ট। আর প্যাকেজ ট্যুরগুলি সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে এসেছে। তাই প্রতিটি সৎ ট্রাভেল এজেন্সিই ভ্রমণপিপাসুর আপনজন। ●

বিশ্বের বদমেজাজী খেলোয়াড়

চিমা ওকেরি

প্রতিটি খেলাতেই এমন কিছু স্টার প্লেয়ার আছেন যারা প্রায়ই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ও হকির মাঠে এই ধরনের মেজাজ হারানো খেলার রীতিতে, মাঠে ও দর্শক গ্যালারিতে বিপর্যয় ডেকে আনে সহজেই। দেশ বিদেশের ক্রীড়াজগতে চটজলদি মাথা গরম করে ফেলা অ্যাংরী ইয়ংম্যান মাইক গ্যাটিং, বথাম, মিয়াদাদ, ভিভ রিচার্ডস, চিমা, ভাস্কর, ম্যাকেনরো, কোনর্স, নাভ্রাতিলোভা প্রমুখদের বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন বিবেক আনন্দ।

২৪ মে ১৯৬৪ সাল। পেরুর রাজধানী সুন্দর শহর লিমার ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যখন পেরু আর আর্জেন্টিনার ফুটবল ম্যাচ শুরু হল তখন গ্যালারী কানায় কানায় পূর্ণ। স্টেডিয়ামের প্রায় ৫৫ হাজার মানুষের বসার জায়গা হতে পারে কিন্তু দর্শকের সংখ্যা সেদিন ছিল প্রায় দ্বিগুণ। খালি পেরু নয় প্রতিবেশী দেশগুলি থেকেও অনেকে এসেছেন খেলা দেখতে। এই ম্যাচে যে দল জিতবে তারা টোকিও অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে ঘিরে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই টেনশন বাড়ছিল তাই পুলিশি বন্দোবস্তও খুব ভাল করা হয়েছিল সেদিন। লিমা শহরের পুলিশ প্রধান কমাণ্ডেন্ট আজানবুজার নিজেই সেদিন স্টেডিয়ামে এসেছিলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে। লাঠি, টিয়ারগ্যাস, পুলিশ কুকুর আর ঘোড়া সব কিছু নিয়েই তৈরি পুলিশ বাহিনী।

এমেকা এজুগো
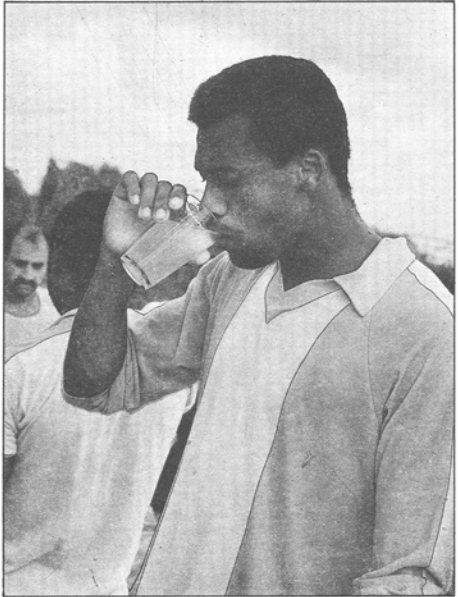
ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হল গোল শূন্য ভাবে। বিরতির ২৩ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনা গোল করে এগিয়ে গেল। নিজেদের দেশের মাটিতে নিজের চেনা দর্শকদের সামনে হার মানতে রাজি নয় পেরু দল। শুরু হল চোরাগোপ্তা আক্রমণ, বল ছেড়ে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের পায়ে কিক্ করতে শুরু করল তারা। মাঠ থেকে আস্তে আস্তে টেনশন ছড়িয়ে পড়ল গ্যালারীতে। খেলা শেষ হতে যখন আর দশ মিনিট মাত্র বাকি তখন পেরুর তিনজন ফরোয়ার্ড বল নিয়ে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনার গোলের দিকে। সামনে যে ডিফেণ্ডার এল সেই লাথি অথবা ঘুঁষি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। পেরুর খেলোয়াড় যখন বিপক্ষের গোলে বল ঢোকাল তখন আর্জেন্টিনার গোলকীপার সহ তিনজন খেলোয়াড় পেনাল্টি এলাকার মধ্যে মাটিতে ছটফট করছে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। খেলার মাঠে আর তা থেকে গ্যালারীতে।

গ্যালারী থেকে ইঁট পাথর আর বিয়ারের বোতল ছোঁড়া শুরু হল মাঠের মধ্যে। পুলিশ শুরু করল টিয়ারগ্যাস আর লাঠি চার্জ। খেলা শুরু হওয়ার পর গেটগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ফলে একটি মাত্র বেরোবার পথ দিয়ে হাজার হাজার লোক নিমেষে বেরনোর চেষ্টা করতে গিয়ে পায়ের চাপে মারা পড়ল অনেকে, কেউ মরল দম বন্ধ হয়ে, দর্শকদের নিজেদের মধ্যে মারামারিতে প্রাণ হারাল কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত যখন সনাক্তকরণের জন্য রক্তাপ্লুত, থেঁতলানো, এখানে ওখানে ছড়ানো দেহগুলিকে লাইন করে সাজিয়ে দেওয়া হল মাঠের মধ্যে তখন সবাই দেখল সারিবদ্ধভাবে সাজানো সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা ৩০১টি মৃতদেহ।

আমাদের দেশও এসবের ব্যতিক্রম নয়। প্রতি বছরই কলক্যাতার মাঠে ফুটবলকে ঘিরে টেনশন বেড়ে ওঠে। এখানে দাঙ্গা খালি দুটি ফুটবল দলের সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না জাতপাত নিয়েও শুরু হয়। গত কয়েকবছর কলকাতার ময়দানে গণ্ডগোলের ঘটনাগুলো দেখলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় মুষ্টিময় কয়েকজন ফুটবলারই এসবের জন্য দায়ী। এরা হলেন ফুটবলের 'অ্যাংরী ইয়ংম্যান'। এ ব্যাপারে আবার ইদানিং কালে সবচেয়ে কুখ্যাত চিমা ওকেরি। বিশালদেহী এই নাইজেরীয় ফুটবলারের কলকাতায় আবির্ভাবের পর থেকেই দেখা গেছে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের উপর বলপ্রয়োগ করে তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা তার খেলার এক স্ট্র্যাটেজী। বিদেশ থেকে এসেছেন তার ওপর আবার ময়দানের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড় তাই মহামেডান স্পোর্টিং অথবা ইস্টবেঙ্গল যে ক্লাবেই খেলেছেন তাকে ক্লাব রাজার হালে রেখেছে আর এসব থেকেই বোধহয় চিমার ধারণা হয়ে গেছিল খেলার মাঠে বিপক্ষের ফুটবলার আর রেফারীকে হেনস্তা করে তিনি কিছুই অন্যায় করছেন না। তাই একবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে মহামেডান–ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে রেফারীর কান ধরে টেনে আনার স্পর্ধা পর্যন্ত দেখিয়েছেন। নাইজেরীয় এমেকা এজুগোর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভারতীয় খেলোয়াড়দের উপর শারীরিক ক্ষমতা দেখানোর অভ্যেস ছিল। খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার বিকাশ সাধুর উপর হাত তোলার জন্য তিনি এখন বিচারধীন। এমেকাকে ধরতে যখন পুলিশ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে হানা দেয় তখন পুলিশ অফিসারদের উপরও বলপ্রয়োগ করার চেস্টা করেছিলেন তিনি।

কলকাতার আর যে ক'জন ফুটবলার চিমা-এমেকার সঙ্গে মারপিটের লড়াইয়ে পাল্লা দিতে পারেন তারা হলেন–ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন ভট্টচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলী এবং মোহনবাগানের সুদীপ চ্যাটার্জী। নিজের নিজের খেলাতে এরা যেমন দক্ষ, তেমনি রেফারি আর বিপক্ষের খেলোয়াড়দের হেনস্তা করতেও এরা ওস্তাদ। খুব চটজলদি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অনেক মহাযুদ্ধের নায়ক মনোরঞ্জন আর ভাস্কর। ম্যাচ চলাকালীন বিপক্ষের কারও সঙ্গে তাদের দলের কোন খেলোয়াড়ের বচসা হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন তারা। মাঠের মধ্যেকার সেই গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে গ্যালারীতে। ইদানিং মহামেডান স্পোর্টিং আর ইস্টবেঙ্গলের কয়েকটি ম্যাচ ঘিরে যে দাঙ্গা হয়েছে তার পিছনে এইসব অ্যাংরী ইয়ংম্যানদের যথেস্ট ভূমিকা আছে। ১৯৮২ ডোডার্স কাপে রেফারীকে মারার অপরাধে মনোরঞ্জন, ভাস্কর আর দেবাশীষ রায় ও মিহির বসুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এদের। সুদীপ চ্যাটার্জী ভারতের এক সেরা মিড ফিল্ডার হিসেবে নিজেকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন একজন উগ্র খেলোয়াড়

সুদীপ চ্যাটার্জি

জন ম্যাকেনরো

হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পারেন নি। শুধু বিপক্ষের খেলোয়াড়ের সঙ্গে মারামারি বা রেফারীর সঙ্গে বচসাই নয়, সাংবাদিকদের হেনস্তা আর ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেও তার জুড়ি নেই কলকাতার ময়দানে।

কলকাতার ফুটবলে যত বেশি টাকা এসেছে খবরের কাগজ আর ক্রীড়া পত্রিকার কল্যাণে ফুটবল তারকাদের গ্ল্যামার তত বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলার স্ট্যান্ডার্ড আর খেলোয়াড়োচিত মনোভাব কমে যাচ্ছে। কলকাতায় খেলাকে কেন্দ্র করে অনেক ভয়াবহ দাঙ্গা আর প্রাণহানি হওয়া সত্ত্বেও কারুর শিক্ষা হয় নি। বেশ কিছু ফুটবলার অযথাই ম্যাচে উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। গত জে সি গুহ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং–এর খেলাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় আহত হল ১৮ জন। মহামেডানের মুশির আহমেদকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গলের স্টপার অমিত ভদ্রের বিপক্ষে ফাউল দিলেন রেফারী সাগর সেন। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে মহামেডান সমর্থকরা ইঁট বৃষ্টি শুরু করল মাঠের মধ্যে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন পুলিশ গ্যালারীর দিকে এগিয়ে গেল তখন হঠাৎ মহামেডান স্পোর্টিং–এর স্টপার আসলম খান মাঠ ছেড়ে দৌড়ে এলেন মহামেডান গ্যালারীতে পুলিশকে আটকাতে। খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে সমর্থকদের পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে গ্যালারীতে যাওয়ায় গণ্ডগোল সেদিন থামে নি বরং আরও দ্বিগুণ হয়ে গেছিল।

আজকাল বেশ কিছু খেলোয়াড় খেলায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেয়ে গলার জোর আর বলপ্রয়োগ করে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছেন। এটা শুধু ফুটবল নয় সব খেলাতেই দেখা যায়। এ বছরের হকি মরশুমে কলকাতার হকি লীগ আর বেটন কাপের খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে মারামারি আর রেফারীকে হেনস্তা করার দৃষ্টান্ত আকছার দেখা গেছে। যে ক্রিকেট খেলায় একসময় খেলোয়াড়দের দুর্ব্যবহার করানোর ঘটনা কস্মিনকালে শোনা যেত তাও এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সর্বকালের সেরা বদমেজাজী ক্রিকেটারের যদি কোন পুরস্কার থাকে তো সেটা জেতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হলো জাভেদ মিয়াদাদের। ব্যাটসম্যান হিসাবে তিনি পৃথিবীর সেরাদের একজন আর খেলার মাঠে অভব্যতার বিচারে তিনি আবার সবার সেরা। টেস্ট ম্যাচ বা একদিবসীয় যাই হোক না কেন মিয়াদাদ সামান্য কারণেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। বিপক্ষের ব্যাটসম্যানের স্লিপে ফিল্ডিং করার সময় নানারকম কথা বলে ব্যাটসম্যানকে উত্যক্ত করেন যাতে ব্যাটসম্যানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ক্রিজে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার খেলোয়াড়ও মিয়াদাদের ব্যবহারে চুপ থাকতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়াতে এক টেস্ট ম্যাচে তিনি ব্যাট নিয়ে তাড়া করেন ডেনিস লিলিকে, লিলিও তাকে এক লাথি কসান। গত বছর ভারত পাক সিরিজে তিনি এক ক্রিকেটারের গলা টিপে ধরেন। অন্যরা গিয়ে তাকে মিয়াদাদের কবল থেকে মুক্ত করেন। একবার পাকিস্তানে এক প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে বল ছুঁড়ে তার দলেরই এক ফিল্ডারের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন জাভেদ। একবার মত্ত মিয়াদাদকে আটকে রেখেছিল এ দেশের পুলিশ। গত ভারত পাক সিরিজের সময় ব্যাঙ্গালোর ওয়েস্ট এণ্ড হোটেলে মাদ্রাজ থেকে আসা মডেলদের কাকে কে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাবে এই নিয়ে পাক ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রকাশ্য বচসা হয়। তারপর মাঝরাতে মত্ত অবস্থায় ছুরি নিয়ে আবদুল কাদিরের ঘরে ধাক্কা দিতে শুরু করলে পুলিশ এসে মিয়াদাদকে আটকে রাখতে বাধ্য হয়।

বদমেজাজী ক্রিকেটারের প্রতিযোগিতায় জাভেদ মিয়াদাদের সঙ্গে যিনি লড়াই দিতে পারেন তিনি হলেন ইয়ান বথাম। কি খেলার মাঠে কি খেলার বাইরে তার বেপরোয়া ব্যবহারের জন্য বথাম সবসময়ই খেলার পাতার শিরোনাম দখল করে রাখেন। আর কোন খেলোয়াড়কে নিয়ে তাঁর মত এত হইচই দেখা যায় নি। অনেক ঘটা করে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে এ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এসেছিলেন বথাম। তারপর গত ১৫ মার্চ পার্থ মেলবোর্ন এক ফ্লাইটে যাওয়ার সময় সহযাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে আদালতে যেতে হল তাকে। আদালতে তার ৮০০ অস্ট্রেলিয় ডলার জরিমানা হয়। বথামের হয়ে সেই টাকা দিয়ে দেন ডেনিস লিলি। আবার এই অভিযোগের জন্যই তার ক্লাব কুইন্সল্যাণ্ড তাকে শুধু ক্লাব থেকে তাড়িয়েই দিল না উল্টে জরিমানা ধার্য করল ৫০০০ অস্ট্রেলিয় ডলার। এই বছরই আরও দুবার জরিমানা দিতে হয়েছে বথামকে। একবার ড্রেসিং রুম ভাঙচুর করার জন্য আরেকবার ম্যাচের সময় গণ্ডগোল পাকানোর জন্য। বথাম এক সময় রাস্তায় মারপিট করে এক নাবিককে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাওয়ার সময় প্লেনে তার চোখে পড়ে 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক সংখ্যা যাতে তার সমালোচনা করে একটি রিপোর্ট লিখেছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক হেনরী ব্লোফেল্ড। ওই ফ্লাইটে তিনিও যাচ্ছিলেন। তেল নেওয়ার জন্য বারমুডাতে যখন প্লেন থামল তখন বথাম হঠাৎ দেখেন তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধোর করতে শুরু করেন। অন্য সহযাত্রীরা এসে না বাঁচালে সেদিন বথামের হাতে ওই সাংবাদিকের

১০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন
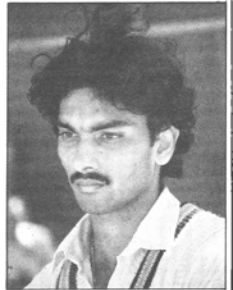
রবি শাস্ত্রী

শান্তিপর্ব

প্রফুল্ল রায়

॥পনের॥

সাগিয়াকে দিয়ে গোপনে কিরণ প্রভাকরকে সেদিন যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল তারপর কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে। এখনও প্রভাকরের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসে নি। ফলে কিরণ রীতিমত সংশয় এবং উৎকণ্ঠার মধ্যেই রয়েছে।

সাগিয়া যথেষ্টই চালাক চতুর মেয়ে। তবু শেষ পর্যন্ত চিঠিটা ডাকে দিতে পেরেছে কিনা কে জানে! যদিও সেদিন জোর দিয়েই সাগিয়া বলেছিল পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিটা সে লেটার বাক্সে ফেলে এসেছে।

এমনও হতে পারে প্রভাকর হয়ত এই মুহূর্তে দিল্লিতে নেই। এই কারণে চিঠি তার ঠিকানায় পৌঁছলেও উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু দুচারদিনের ভেতর সাগিয়া যদি কোনো ব্যবস্থা না করে ফেলতে পারে কিরণকে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে
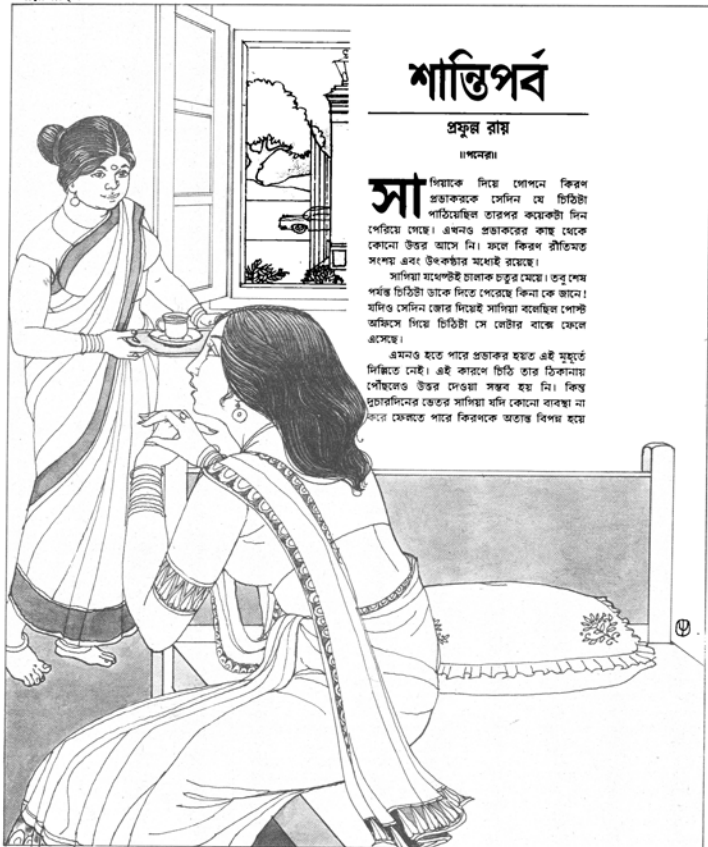
পড়তে হবে। সে শুনেছে দু'একদিনের মধ্যে বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলবেন বশিষ্ঠ নারায়ণ।

প্রায়ই কিরণের মনে হয়, মরিয়া হয়ে এবার সে পেটের প্ল্যানটার কথা জানিয়ে দেবে, কিন্তু জানাতে গিয়েও পারে নি। লজ্জায় বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, অতটা বেপরোয়া হওয়া এখনও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু এবার কিছু একটা তাকে করতেই হবে।

এবার 'মিত্র নিকেত'-এ ফেরার পর থেকে বাড়িতে একরকম বন্দী জীবনই কাটাতে হচ্ছে কিরণকে। নিজের ঘরটি থেকে সে প্রায় বেরোয় না বললেই চলে। দিনে একবার অবশ্য মহেশ্বরী তাকে ডেকে পাঠান। সেখানে অনিবার্য নিয়মে কুলগুরু বশিষ্ঠ নারায়ণ থাকবেনই। দু'জনে মিলে তাঁরা তাকে সুনীতি, সংযম, মিত্র নিকেত-এর কৌলীন্য এবং মর্যাদা, সদ্বংশের মেয়েদের আচার আচরণ রাহানসাহান ইত্যাদি সম্পর্কে বিপুল গাম্ভীর্যে পুরো এক দেড় ঘণ্টা উপদেশ দিয়ে যান। উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে শাস্ত্রে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুমারীদের বিষয়ে যে সব খটর মটর সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে সেগুলো আওড়াতে থাকেন বশিষ্ঠ নারায়ণ। এ সবের একটা বর্ণও কিরণের মাথায় ঢোকে না, শুধু কানের পর্দায় সেগুলো একটানা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যায়। এই সব সংস্কৃত শ্লোক আর উপদেশের উদ্দেশ্য কী, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না কিরণের। প্রভাকর সম্বন্ধে এঁদের সন্দেহ এখনও পুরোপুরি কাটে নি। যদি সামান্য দুর্বলতা এখনও থেকে থাকে, ঐভাবে তাঁরা তা শোধন করে নিতে চান।

দিল্লিতে প্রায় স্বাধীনভাবেই এতগুলো বছর কাটিয়ে এসেছে কিরণ। কলেজ হস্টেলে কিছু নিয়ম শৃংখলা মানতেই হয়। সেটুকু বাদ দিলে তার চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল অবাধ। সেখানকার মুক্ত কসমোপলিটান আবহাওয়া থেকে এবার ধরমপুরায় আসার পর প্রতি মুহূর্তে কিরণের মনে হচ্ছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাড়ি থেকে যে বেরুবে তারও উপায় নেই। সে বুঝতে পারে তার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ছেলেবেলার এক বন্ধু আছে কিরণের। তার নাম ললিতা। সে ধরমপুরারই মেয়ে এবং তের বছর বয়সে এই শহরেরই একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। ধরমপুরার পুব দিকের শেষ মাথায় জানকী টৌলিতে তার শ্বশুরবাড়ি।

ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে ললিতার সঙ্গে কিরণের যোগাযোগটুকু এখনও থেকে গেছে, যদিও ধ্যান ধারণা এবং স্বভাবের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। এই বয়সেই চারটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছে ললিতা। বাচ্চা মানুষ করা, শ্বশুর শাশুড়ির সেবাযত্ন, হাজারটা গেঁয়ো সংস্কার নিয়ে তার মা-ঠাকুমাদের মতো দিন কাটিয়ে দিচ্ছে ললিতা। দিল্লিতে না গেলে এই জীবনই হাসিমুখে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হত কিরণকে। কেননা, এর বাইরেও মেয়েরা যে মাথা উঁচু করে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে অন্যভাবে বাঁচতে পারে তা সে জানতেও পারত না। ভাবতেও পারত না মেয়েদের আলাদা কোনো আইডেনটিটি থাকতে পারে।

জীবনযাত্রার দিক থেকে ললিতা যেন একশ' বছর পিছিয়ে আছে। তবু সাদাসিধে হাসিখুশি ঘোর-প্যাঁচহীন ছেলেবেলার এই বন্ধুটিকে খুবই পছন্দ করে কিরণ। দিল্লি থেকে ছুটিছাটায় ধরমপুরায় এলে প্রায় রোজই সে ললিতার শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি সাইকেল রিকশা ধরে সে, তারপর সোজা জানকী টৌলি। কিন্তু এবারেই শুধু যাওয়া হয় নি। প্রায় সাত আট দিন হল খুবলাল তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছে। তারপর থেকে এমন সব কাণ্ড ঘটে চলেছে যে ললিতার কাছে যাওয়ার কথা প্রথম দিকে তার মনেও পড়ে নি। পরশু দুপুরে হঠাৎ যখন মনে পড়ল তখনই যেতে চেয়েছিল কিরণ। 'মিত্র নিকেত'-এর দম বন্ধ করা আবহাওয়া থেকে বেরুতে পারলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে উৎকণ্ঠা অশান্তি এবং উত্তেজনা ভুলে থাকতে পারত।

কিন্তু দোতলা থেকে নেমে গেটের কাছে আসতেই বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান কাচুমাচু মুখে অত্যন্ত সসম্ভ্রমে জানিয়েছিল, কিরণের একা একা বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই।

প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল কিরণ। পরক্ষণে অসহ্য রাগে মাথার ভেতর রক্ত যেন ফুটতে শুরু করেছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল লোকটার গালে চড় কষিয়ে দেয়। তীব্র গলায় সে প্রায় চিৎকারই করে উঠেছে, 'কার হুকুম?'

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'বড়ে সরকার কা, দিদিজি–'

বড়ে সরকার, অর্থাৎ মুকুটনাথ মিত্র। বাবুজি যে এভাবে তার ওপর মধ্যযুগীয় ডিক্টেটরশিপ চালাবে, এতটা ভাবতে পারে নি কিরণ। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল।

দারোয়ান এবার বলেছে, 'মেরা কোঈ কসুর নেহী দিদিজি'–

সত্যিই তো, এই লোকটার ওপর রাগারাগি করে লাভ নেই। সে সামান্য নৌকর মাত্র। যার নুন খায় তার হুকুম তামিল করতে সে বাধ্য।

কিরণ কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় রেবতী গেটের কাছে চলে আসেন। খুব সম্ভব শিউশংকরজির নতুন মন্দির বা মহেশ্বরীর কামরা কিংবা অন্য কোথাও থেকে তিনি তাকে দেখে থাকবেন। রেবতী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখানে কি করছ?'

কি কারণে সে গেটের কাছে এসেছে, কিরণ জানিয়ে দেয়।

রেবতী বলেন, 'ললিতার শশুরালে যেতে হবে না। নিজের ঘরে যাও।' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু দৃঢ়।

কিরণ বলেছে, 'প্রতি বারই তো দিল্লি থেকে এসে ওর কাছে যাই।'

'অন্য সব বার গেছ বলে এবারও যেতে হবে, এমন কোন কথা আছে!'

'যাব না-ই বা কেন?'

'আমরা কেউ চাই না, সেই জন্যে যাবে না।'

মাথার ভেতর রক্ত টগবগ করছিলই। কিরণের মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। প্রবল উত্তেজনা এবং স্নায়বিক চাপের মধ্যেও দ্রুত চারপাশ একবার দেখে নেয় কিরণ। গেটে দারোয়ানরা তো রয়েছেই, এধারে ওধারে নৌকর নৌকরানীরা ঘাড় গুঁজে কাজ করছে। কিরণ প্রাণপণ চেষ্টায় বিস্ফোরণটা আর ঘটতে দেয় না। কাজের লোকেদের সামনে অপ্রিয় একটি নাটক করার মতো রুচি তার নেই। ইচ্ছা করলে জোর করেই সে ললিতাদের বাড়ি যেতে পারে। তাকে আটকাতে হলে দারোয়ানকে গায়ে হাত দিতে হবে। তেমন দুঃসাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই তার নেই

কিরণ চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কেন তোমরা চাইছ না? কি এমন কারণ ঘটেছে?'

যে রেবতী চিরদিনই শান্ত, নির্বিরোধ, তাঁর অস্তিত্ব এই 'মিত্র নিকেত'–এ প্রায় টেরই পাওয়া যায় না–সেই মুহূর্তে তিনি প্রায় মারমুখী হয়ে ওঠেন। উগ্র গলায় বলেন, 'তর্ক না করে নিজের ঘরে চলে যাও।'

কিরণ আর কিছু বলে নি, স্থির চোখে মায়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে সামনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে নিজের ঘরে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে অন্যমনস্কের মতো জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে কিরণ।

এখন বিকেল।

ঘণ্টাখানেক আগেও রোদ থেকে আগুনের হলকা ছুটছিল যেন। ধরমপুরার ওপর দিয়ে গনগনে লু-বাতাস অদৃশ্য ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে দূরে শস্যহীন মাঠগুলোর দিকে ধাওয়া করে যাচ্ছিল। সাজানো ঝকঝকে রোদের তাপ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, রংও বদলে গেছে। এখন রোদের রং হলুদ। সন্ধ্যের আগেই সমস্ত চরাচর জুড়ে আরামদায়ক স্নিগ্ধতা নেমে আসবে।

সাগিয়া ঘরে এসে ঢোকে। তার হাতে পোর্সেলিনের দামী কাপে ব্ল্যাক কফি। রোজ এই সময়টা কফি করে নিয়ে আসে সে।

সাগিয়ার পায়ের আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ। কফির কাপটা নিতে নিতে হঠাৎ কিছু মনে পড়তে বলে, 'আচ্ছা সাগিয়া–'

সাগিয়া কিরণের মুখের দিকে তাকায়, 'কি দিদিজি?'

কিরণ অনেকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'সেদিন চিঠিটা ঠিকমতো ডাকে দিয়েছিলি তো?' এই প্রশ্নটা সে আগে আরো কয়েকবার করেছে।

সাগিয়া বলে, 'হ্যাঁ দিদিজি। আমি নিজের হাতে ডাকে দিয়েছি। চিন্তা করো না। যাকে লিখেছ সে

ঠিক পেয়ে যাবে।'

কিরণ আর কিছু বলে না, ফের জানালা দিয়ে অনেকদূরে বাইরের রাস্তার দিকে তাকায়।

সাগিয়া কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবনাটা আবার তার মাথায় ফিরে আসে। এবার 'মিত্র নিকেত'–এ এসে যেভাবে সে ফাঁদে আটকে গেছে তাতে প্রভাকরই একমাত্র তাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারে। প্রভাকরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার কাছে অন্য কোন পথই খোলা নেই।

হঠাৎ কিরণের চোখে পড়ে, একটা মোটর দূরের হাই-ওয়ে থেকে পাশের রাস্তায় ঢুকে তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। একটু পর গাড়িটা তাদের বিশাল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

কিরণ প্রথমটা লক্ষ্য করে নি। এবার দেখতে পায় মোটর থেকে চর্বির ছোট খাট একটি পাহাড় নেমে আসছে। বছর দুই পর দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না কিরণের। ত্রিকূটনারায়ণের ছেলে হরীশ। দু' বছর আগে কিরণ তার যে চেহারা দেখেছিল এখন সে তার দেড়গুণ। যেভাবে সারা শরীরে হরীশ চর্বি জমাচ্ছে তাতে পাঁচ বছর বাদে তার আকারে কি দাঁড়াবে ভাবতেও ভয় হয়।

সাত আট বছর বয়সেই এই ছেলেটার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মহেশ্বরীর কথায় হরীশ নাকি তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী। একটা অর্ধশিক্ষিত আনকালচারড বেঢপ চেহারার ছোকরাকে চক্রান্ত করে মিত্র এবং দুবে ফ্যামিলি তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চলেছে। বিয়ে সম্পর্কে তার নিজস্ব যে একটা মতামত থাকতে পারে, এ নিয়ে আদৌ কারো মাথাব্যথা নেই। মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণের সিদ্ধান্তটাই হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকতে পারে, তাঁদের কথাই যে শেষ কথা নয়–এ সব ভেবে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন না মুকুটনাথেরা। দিল্লীতে না গেলে সে জানতেই পারত না তাদের সোসাইটিতে মেয়েদের আসল জায়গাটা ঠিক কোথায়। হরীশের সঙ্গে তার বিয়েটাকে অদৃষ্ট, নিয়তি, বিধিলিপি ইত্যাদি বলেই সে ধরে নিত।

হরীশের পেছন পেছন রাজেশও নেমেছিল। হরীশের চাইতে সাত আট বছরের বড় সে। টান টান চেহারা, শরীরে এক গ্রাম অনাবশ্যক মেদ নেই।

রাজেশকে আগে কখনও দেখে নি কিরণ। যাই হোক, দু'জনকে দেখতে দেখতে কপাল কুঁচকে যায় তার। অসহ্য বিরক্তি এবং রাগে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে। কপালের দু' পাশে শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে।

এদিকে রাজেশরা মোটর থেকে নামতেই নৌকররা দৌড়ে যায়। তারপর দেখা গেল শশব্যস্তে মুকুটনাথ প্রায় ছুটতে ছুটতেই তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বিগলিত ভঙ্গীতে কিছু বলছেন। কথাগুলো শোনা না গেলেও বোঝাই যাচ্ছে, যথেষ্ট খাতির করে হরীশদের বাড়ির ভেতর যেতে অনুরোধ করছেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় হরীশদের সঙ্গে নিয়ে মুকুটনাথ প্রথমে নতুন শিব মন্দিরের দিকে গেলেন। সেখানে হরীশরা শিউশংকরজির মূরতকে প্রণাম করে মুকুটনাথের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একতলার উঁচু বারান্দায় উঠতে লাগল। একটু পর তারা চোখের আড়ালে চলে যায়।

কয়েক মিনিট বাদে কি ঘটতে চলেছে, দোতলায় নিজের ঘরে বসে পরিষ্কার যেন দেখতে পায় কিরণ। তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

যা ভাবা গিয়েছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে তা-ই ঘটে

কিরণ প্রথমটা লক্ষ্য করে নি। এবার দেখতে পায় মোটর থেকে চর্বির ছোট খাট একটি পাহাড় নেমে আসছে। বছর দুই পর দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না কিরণের। ত্রিকূটনারায়ণের ছেলে হরীশ। দু'বছর আগে কিরণ তার যে চেহারা দেখেছিল এখন সে তার দেড়গুণ। যেভাবে সারা শরীরে হরীশ চর্বি জমাচ্ছে তাতে পাঁচ বছর বাদে তার আকার কি দাঁড়াবে ভাবতেও ভয় হয়।

যায়। রেবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কিরণের মনে হয়েছিল, সাগিয়া বা অন্য কোন নৌকরনীকে তার কাছে পাঠানো হবে। কেননা এবার দিল্লী থেকে তাকে নিয়ে আসার পর রেবতী বা মুকুটনাথ কেউ তার ঘরে একদিনও আসেন নি। মাকে দেখে কিরণ চমকে ওঠে।

রেবতী বলেন, 'হরীশ এসেছে।'

কিরণ উত্তর দেয় না।

রেবতী ফের বলেন, 'ভালো শাড়ি-জামা পরে নে। সুষমা এসে তোকে নিয়ে যাবে।' চিরকালের শান্ত চুপচাপ মায়ের গলায় কর্তৃত্ব এবং আদেশের সুর।

অর্থাৎ সাজগোজ করে হরীশদের কাছে তাকে যেতে বলছেন রেবতী। কিরণের মাথায় যেন আগুন ধরে যায়। ভাবল–বলে ফেলে সে সং টং সেজে যেতে পারবে না। কিন্তু বলার আগেই মা দরজার সামনে থেকে চলে গেছেন।

বেশ খানিকক্ষণ অনড় বসে থাকে কিরণ। খাট থেকে নেমে পোশাক বদলাবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। একসময় নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে পোশাক বদলে নেয়, এমন কি মুখে গালে গলায় পাউডারও বুলোয়, শাড়িতে দামী একটু সেন্টও ছড়িয়ে দেয়।

একটু সাজসজ্জা করে না গেলে এখনই হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। মুকুটনাথ এবং রেবতী দৌড়ে আসবেন। এই মুহূর্তে যখন সে কোনোরকম কনফ্রনটেশনে যাচ্ছে না তখন উত্তেজনা বাড়িয়ে কি লাভ? প্রভাকরের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তার অধৈর্য হলে চলবে না।

সুষমা এসে ঘরের ভেতর দাঁড়ায়। কোমরে দুই হাত রেখে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়ে কিরণকে কিছুক্ষণ দেখে নেয় সে। তারপর কর্কশ গলায় বলে, 'বিলকুল সিনেমার হিরোইন সেজেছিস দেখছি। বর এসেছে, মনে খুশির লহর খেলে যাচ্ছে!'

বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তিতে সারা মন ভরে আছে, তবু সুষমার সঙ্গে একটা মজা করতে ইচ্ছা হল। বলল, 'এক কাজ করবি সুষমা?'

ভুরু কুঁচকে সান্দিগ্ধ চোখে কিরণকে লক্ষ্য করে সুষমা। বলে 'কি?'

'হরীশকে তুই বিয়ে করবি? যদি করিস তো বাপুজিকে বলে ব্যবস্থা করে দিই।' বলে নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে তাকায় কিরণ।

সুষমা একেবারে ক্ষেপে যায়। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হিংস্র মুখে বলে, 'ঐ হাথীকে আমার দরকার নেই। তোর হাথী তোরই গলায় ঝুলুক। এখন চল, নিচে বাবুজি ডাকছে।'

একটু পর সুষমার সঙ্গে একতলায় বসার ঘরে চলে আসে কিরণ। এখানেই সেদিন রোহিনী এবং ত্রিকূটনারায়ণকে বসানো হয়েছিল।

এই মুহূর্তে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে আছে হরীশ আর রাজেশ। তাদের মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় মুকুটনাথ। হরীশের সামনে নিচু সেন্টার টেবলে প্রচুর মিঠাই আর নোনতা খাবার। আর ট্রে-তে রয়েছে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং কয়েকটা দামী কাপ-প্লেট।

মুকুটনাথ দিল্লী থেকে আসার পর কিরণের সঙ্গে দু' একটার বেশি কথা বলেন নি। তাঁর চোখমুখ দেখে টের পাওয়া গেছে, সারাক্ষণ তার ওপর বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। কিন্তু হরীশের সামনে হাসিমুখে, অত্যন্ত নরম গলায় ডাকলেন, 'আ বেটা, এখানে আয়।' কিরণকে নিজের পাশের সোফায় বসিয়ে বললেন, 'হরীশ আর রাজেশ এসেছে। রাজেশকে তো তুই আগে দেখিস নি। ও হরীশের ছোট মামা।'

রাজেশের মতো অল্পবয়সী যুবককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে কিনা প্রথমটা সে ভেবে উঠতে

"গায়েব!"

চলে গেছে!

ব্যথা-বেদনা পলকে আরাম !

দশটি প্রাকৃতিক উপাদান মিশিয়ে তৈরি স্নিগ্ধ সুগন্ধ মলম অম্রুতাঞ্জন। ৯০ বছরেরও ওপর ঘরে ঘরে এর সমাদর।
মাথা-ধরা, পেশীর বেদনা বা মচকানোর ব্যথা দেখা দেওয়ামাত্র আস্তে আস্তে অম্রুতাঞ্জন মালিশ করুন। দেখতে না দেখতে ব্যথা-বেদনার শান্তি ... আঃ কী আরাম !

অম্রুতাঞ্জন

ব্যথা দেবে চটপট সারিয়ে
আনবে মুখে হাসি ফিরিয়ে !

অম্রুতাঞ্জন লিমিটেড

পারল না। তারপর মনস্থির করে ফেলল। হাত জোড় করে বলল, 'নমস্তে—'

চোখ কুঁচকে কিরণকে একবার দেখে নিলেন মুকুটনাথ। বয়স কম হলেও সম্পর্কে রাজেশ তার গুরুজন। তার পায়ে মাথা ঠেকানো খুবই উচিত ছিল। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গেছে। রাহান সাহান এবং সহবত নিয়ে এখন চেঁচামেচি বা বকাবকি করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। মুকুটনাথ প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলেন।

রাজেশ অবশ্য খারাপ ভাবে ব্যাপারটা নেয় নি। সেও হাতজোড় করে বলে, 'নমস্তে—'

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। বলেন, 'আচ্ছা, তোমরা গল্পগুজব কর। আমি যাই। জরুরী কাজ আছে।'

সুষমা খানিকটা দূরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সঙ্গে করে বাইরে চলে গেলেন মুকুটনাথ। আগেও কিরণ লক্ষ্য করেছে, হরীশ এলে তাকে তার সামনে বসিয়ে কোনো এক অছিলায় বেরিয়ে গেছেন তিনি। এইভাবে আলাদা কথা বলার এবং মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছেন।

কিরণ ঘরে ঢোকামাত্র হরীশের ছোট ছোট গোল চোখ দুটো তার গায়ে যেন আটকে গিয়েছিল। তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্য তার দিক থেকে চোখ সরায় নি হরীশ।

এবারই শুধু নয়, আগেও যখন হরীশের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিরণের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছে সে। তার তাকানোটা এমন যে গা ঘিন ঘিন করে। মনে হয়, চামড়ার ওপর দিয়ে একটা নোংরা পোকা হেঁটে যাচ্ছে। কিরণ ভাবল, মুকুটনাথেরা জোরজার করে এই লোকটার সঙ্গে যদি তার সারা জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করেন, দু' দিনেই নির্ঘাত মরে যাবে সে।

হরীশ বলল, 'রাজু মামা তোমাকে তো আগে দেখেনি তাই ধরে নিয়ে এলাম।'

কিরণ বলে, 'উনি যে দয়া করে এসেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ।' বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে সেন্টার টেবিলে যে দামী দামী মিঠাই পড়ে আছে সেগুলো এখনও ছোঁয় নি হরীশরা। কিরণ এবার অনুরোধের সুরে বলে, 'একি, আপনারা তো কিছুই খাচ্ছেন না। প্লীজ, আরম্ভ করুন।'

'আপনি' না 'তুমি' কিরণকে কি বলবে, এই নিয়ে রাজেশকে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত দেখায়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের ভেতরের কুণ্ঠাটা কাটিয়ে ওঠে। কয়েক দিনের মধ্যে যে মেয়েটি তার ভাঞ্জা বা ভাগ্নের স্ত্রী হতে চলেছে তাকে 'আপনি' করে বলার মানে হয় না। রাজেশ বলে, 'তুমিও শুরু কর।'

কিরণ সবিনয়ে জানায়, আজ দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন খেলে ভীষণ কষ্ট হবে।

রাজেশ আর কিছু না বলে প্লেট থেকে একটা কলাকন্দ তুলে নেয়। হরীশও বিরাট আকারের গুলাবজামুন তুলে খেতে শুরু করে।

কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কোথায় থাকেন? কামতিগঞ্জেই কি?'

কোথায় থাকে, রাজেশ জানিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'জায়গাটা খুব ভাল। তোমাদের বিয়ের পর আমাদের ওখানে নিয়ে যাব। দূরে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, একটা নদীও রয়েছে। বেড়াবার পক্ষে চমৎকার। অবশ্য—'

কিরণ বলে, 'কী?'

'তুমি তো শুনেছি একরকম দিল্লীরই মেয়ে। এত বড় শহরে থাকার পর পাহাড় জঙ্গল কি ভাল লাগবে?' বলে হাসে রাজেশ।

এই মানুষটিকে মোটামুটি ভালই লাগে কিরণের। তার চোখেমুখে সারল্য মাখানো, কথাবার্তায় রয়েছে আন্তরিকতা।

হরীশের সঙ্গে বিয়ে হলে তবেই রাজেশদের কাছে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মরে গেলেও সে যে ঐ চর্বির পাহাড়কে বিয়ে করবে না, এই কথাটা এখন

এবারই শুধু নয়, আগেও যখন হরীশের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিরণের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছে সে। তার তাকানোটা এমন যে গা ঘিনঘিন করে। মনে হয়, চামড়ার ওপর দিয়ে একটা নোংরা পোকা হেঁটে যাচ্ছে।

জানালে সারা বাড়ি তোলপাড় হয়ে যাবে। প্রভাকরের চিঠি না আসা পর্যন্ত যখন সে কনফ্রনটেশনে যাচ্ছে না তখন উত্তেজনা সৃষ্টি করলে শুধু ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে স্বাভাবিকভাবে সে বলে, 'শহর যেমন আমার ভাল লাগে, নেচারও তেমনি পছন্দ করি।'

রাজেশ খুশি হয়ে বলে, 'ফাইন। আচ্ছা কিরণ—'

মুখ তুলে রাজেশের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় কিরণ।

রাজেশ জিজ্ঞেস করে, 'কত দিন যেন দিল্লীতে কাটিয়ে এলে?'

কিরণ বলে, 'চোদ্দ পনের বছর।'

'জানো, আমি কখনও দিল্লী যাই নি। ভাবছি, একবার যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। সবারই দেশের ক্যাপিটাল দেখে আসা উচিত।'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিল্লী সম্বন্ধে নানা খবর জেনে নেয় রাজেশ। তারপর বলে, 'অত বড় শহরে এতদিন থাকার পর হরীশদের কামতিগঞ্জ টাউনে গিয়ে থাকতে কি তোমার ভাল লাগবে?'

হরীশ একের পর এক লাড্ডু, প্যাঁড়া বা গুলাবজামুন খেয়ে যাচ্ছিল। একটা লাড্ডু চিবুতে চিবুতে জড়ানো গলায় সে বলে, 'নেহী নেহী—'

রাজেশ এবং কিরণ চমকে উঠে হরীশের দিকে তাকায়। রাজেশ বলে, 'কি হল?'

'কিরণকে কামতিগঞ্জে বেশিদিন থাকতে হবে না। অ্যাভারেজে মাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম দশ বারো দিন।'

'বাকি আঠার কুড়ি দিন কোথায় থাকবে?'

'বাবুজি এম-এল-এ হলে পাটনায়, এম-পি হলে দিল্লীতে। এম-পি হতে পারলে সার্টেনলি বাবুজি সেন্ট্রাল মিনিস্টার হবেন। তখন বছরে পাঁচ দিনও কিরণ কামতিগঞ্জে থাকতে পারবে কিনা, আই ডাউট। কিরণ হবে বাবুজির প্রাইভেট সেক্রেটারি।' কথার ফাঁকে ফাঁকে দু' চারটে ইংরেজি শব্দ গুঁজে দেয় হরীশ। সে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে, খুব সম্ভব তা প্রমাণ করার জন্য।

রাজেশের হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে যায়। সে ব্যস্ত ভাবে বলে, 'আরে তাই তো, দুবেজি তো পলিটিসিয়ান। এম-পি- কি মিনিস্টার বনলে তাঁকে দিল্লীতে থাকতেই হবে। কিরণ তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে তাকেও তো সেখানেই থাকতে হয়।'

কিরণ কোনো প্রতিবাদ করে না। সে শুধু হাসে।

এলোমেলো আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হঠাৎ রাজেশ বলে, 'দুবেজি বলছিলেন, তোমাদের নতুন মন্দির আর তোমার ঠাকুমাকে যেন দর্শন করে যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

কিরণ উঠে পড়ে, 'চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। আগে মন্দির দেখিয়ে তারপর ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাব।'

রাজেশ ব্যস্ত ভাবে বলে, 'না, না, সঙ্গে আসতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাব।'

'আপনি এ বাড়িতে নতুন এসেছেন। অসুবিধা হবে।'

'কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা গল্প কর।' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় রাজেশ।

প্রথমটা অবাক হয়ে যায় কিরণ। পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে। আগে থেকে ওরা দুজনে পরিকল্পনা ছকে এখানে এসেছে। আলাপ পরিচয়ের পর রাজেশ মন্দির এবং মহেশ্বরীকে দর্শন করার অছিলায় উঠে যাবে। উদ্দেশ্য, হরীশকে তার সঙ্গে আলাদা ভাবে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া।

কিন্তু রাজেশকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া অভদ্রতা। কিরণ একটা নৌকরকে ডেকে রাজেশের সঙ্গে যেতে বলে ফের সোফায় এসে বসে।

কিরণকে একা পেয়ে খুশিতে হরীশের মুখে আঠালো গ্যাদগেদে হাসি ফুটে ওঠে। বোঝা যায়

তার ভেতরে উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কিরণকে দেখার পর থেকে তার চোখে আর পাতা পড়ে নি। পলকহীন সে তাকিয়েই আছে।

হরীশ বলে, 'এবার দুবছর বাদে তোমাকে দেখলাম। মনে হচ্ছে ট্রু সেঞ্চুরিজ। অবশ্য–'এই পর্যন্ত বলে হাসিটাকে বিশাল মুখে আরো অনেকটা ছড়িয়ে দেয়।

কিরণ উত্তর দেয় না, ঠোঁট টিপে স্থির চোখে হরীশকে দেখতে থাকে।

হরীশ আবার বলে, 'এখন থেকে এক বছর দুবছর পর আর তোমাকে দেখতে হবে না। সব সময় তোমাকে কাছে কাছে পাব। এতদিনে আমার ড্রিমটা সত্যি হতে চলেছে।'

হঠাৎ মাথার ভেতর একটা শিরা যেন ছিঁড়ে যায় কিরণের। সে বলে, 'ড্রিমতো সত্যি হতে চলেছে কিন্তু তার আগে তোমার ক'টা খবর জানা দরকার।'

প্রচণ্ড উৎসাহে টেবলের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে হরীশ। বলে, 'কী খবর?'

'তুমি কি জানো দিল্লীতে থাকার সময় অনেক ছেলের সঙ্গে আমি ফ্রীলি মেলামেশা করেছি?'

হরীশ বলে, 'ও এই ব্যাপার। বেশ করেছ মিশেছ। আজকাল বড় বড় সিটিতে ছেলেমেয়েদের ফ্রী মিক্সিং চলছে। পাটনাতেও আমি এ সব দেখেছি। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দিল্লী বম্বে কলকাতা পাটনা তো আর ধরমপুরা কি কামতিগঞ্জ নয়। তা ছাড়া–'

'কী?'

'বাপুজি এম-পি কি মিনিস্টার হলে তোমাকে কত লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। আই ডোন্ট মাইণ্ড।'

'দ্যাটস রাইট। কিন্তু ধরো যদি যে সব ছেলের সঙ্গে মিশেছি তাদের কারো সঙ্গে আমার ইন্টিম্যাসি হয়ে থাকে?'

হরীশের হাসির জেল্লা নিভে যেতে থাকে। সে মরীয়া হয়ে বলে, 'ধুস, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ–স্রেফ দিল্লাগি।'

কিরণ চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'ধরো যদি ব্যাপারটা মজা না হয়–'

হরীশের মুখে যে নিভু নিভু হাসিটুকু এখনও আটকে আছে, সেটা একেবারেই মুছে যায়। ভারী গলায় সে বলে, 'এসব কথা শোনার জন্যে কি এতগুলো বছর আমি ওয়েট করছি কিরণ?'

এই সাদাসিধে, ঘি-মাখন খাওয়া বাপ-মায়ের আদুরে ছেলেটার জন্য হঠাৎ করুণাই হয় কিরণের। কিন্তু সে ধীরে ধীরে যে মারাত্মক প্রসঙ্গটার দিকে এগিয়ে গেছে সেখান থেকে ফেরার আর উপায় নেই। কিরণ লক্ষ্য করল, এর মধ্যেই গল গল করে ঘামতে শুরু করেছে হরীশ। সবটা শোনার পর নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়বে। যা হবার হোক, কাউকে না কাউকে ব্যাপারটা তো বলতেই হবে। হরীশকেই না হয় বলা যাক। তাকে বললে মুহূর্তে সবাই জেনে যাবে।

কিরণ বলে, 'তুমি বোধ হয় শোনো নি, একটি ছেলের সঙ্গে আমার ইন্টিম্যাসি এত বেড়ে গিয়েছিল যে কলেজের প্রিন্সিপাল বাপুজিকে সব জানিয়ে চিঠি লেখেন। বাপুজি সঙ্গে সঙ্গে শুবলাল ভকীলকে পাঠিয়ে আমাকে ধরমপুরায় নিয়ে আসেন।'

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে হরীশ। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'তোমার সঙ্গে ছেলেটির যা-ই হয়ে থাক, ও সব আমি গ্রাহ্য করি না। পাস্ট নিয়ে আমার হেড-এক নেই।'

কিরণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রেবতী ঘরে এসে ঢোকেন। বলেন, 'ঠাকুমা তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন হরীশ। এসো আমার সঙ্গে–'

'হ্যাঁ, মাতাজি–' অতি কষ্টে নিজেকে সোফা থেকে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করায় হরীশ। তারপর রেবতীকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে মহেশ্বরীর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কোন ছেলের সঙ্গে কিরণের কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা নিয়ে তার আর আগ্রহ নেই। কিরণকে যেভাবে হোক পেলেই সে খুশী, তার স্বপ্ন সার্থক।

এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও হরীশকে সবটা বলা গেল না। কিরণকে রীতিমত হতাশ দেখায়।

রেবতীরা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বলেন, 'তুইও আয়। এখানে একা একা বসে থেকে কী করবি?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় কিরণ।

(চলবে)

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সি পি এম অনুপ্রবেশ!

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি, পুণ্যার্থীর পবিত্রপীঠ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে পরিচালন ব্যবস্থা ও ট্রাস্টিদের সঙ্গে টক্কর দিতে সি পি এম নেতারা তৈরি করেছেন জঙ্গী ইউনিয়ন। বিধায়ক অশোক ঘোষ ভুক্তভোগী হয়ে দেখেছেন মন্দির প্রাঙ্গণে জবরদস্তি বামসমর্থকদের চাঁদা আদায়ের জুলুম। তবে কি ধর্মপীঠগুলি একে একে রাজনৈতিক কব্জায় চলে যাবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের ১২ জন উত্তরপুরুষ কি ভাবছেন? ধর্মমন্দিরে মার্কসবাদী অনুপ্রবেশের ভবিষ্যৎ কি? মন্দির নিয়ে রাজনীতির অন্তর্কথা সংগ্রহ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি ।

১লা বৈশাখ, এই পুণ্য তিথিতে মা ভবতারিণীর অপার করুণা লাভের আশায় অসংখ্য ভক্তের ভিড়, উপচে পড়ছে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের তামাম চত্বর। গঙ্গার ঘাট থেকে ভক্তদের লাইন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মা ভবতারিণীর মন্দির। এই দেবীই যুগাবতার পরমহংসদেবকে দিয়েছিলেন তাঁর ঐশী শক্তি ও সিদ্ধি। ধর্মপ্রাণ মনের সেই বিশ্বাস নিয়ে মানুষেরা এই পাষাণ প্রতিমার মধ্যে আজও উপলব্ধি করতে চান ঈশ্বর মহিমা।

গত বছর ১-লা বৈশাখ, ইংরেজি ১৫ এপ্রিল ১৯৮৭, কালীবাড়ির ভেতরে বাইরে তিল ধারনের জায়গা নেই কোথাও। তার মধ্যেই হঠাৎ মন্দিরের পুরোহিত কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো বিক্ষোভের ঝড়। এমনিতেই ট্রাস্টিবোর্ডের প্রতি বহুদিন ধরে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল পুরোহিত, কর্মচারীদের ভেতর। সেদিন শিব মন্দিরের পুরোহিত রেবতীরমণ চক্রবর্তীর সাসপেনশনকে কেন্দ্র করে তার বিস্ফোরণ ঘটল।

ঘটনার কয়েক দিন আগে এক ভক্তের হার চুরির অভিযোগে মন্দিরের কার্যকরী সম্পাদক কুশল চৌধুরী পুরোহিত রেবতীরমণ চক্রবর্তীকে পুজো না করার জন্য আদেশ দেন। তখনই মন্দিরের অন্যান্য পুরোহিতরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন, বছরের প্রথম দিন আমাদের সঙ্গে ও কাজ করতে পারবে না তা অন্যায়। তার ওপর মন্দিরের উৎসব আজ। সকলে মিলেই চাপ দেন ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য অচিন্ত্য নাথ দাসকে। অচিন্ত্যবাবুর চেষ্টায় রেবতীবাবুকে আবার পুজো করার অধিকার দেওয়া হয়। আপাতত সমস্যা মিটল বটে, কিন্তু পুরোহিত-

৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

নরেন্দ্রপুর o বর্ধমান o শান্তিনিকেতনে

জাতিস্মর দোলনচাঁপাকে দিয়ে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত?

বিতর্কে ঃ স্বামী লোকশ্বরানন্দ বনাম ১০ জন বিজ্ঞানী

স্বামী বিবেকানন্দের মানস কর্মভূম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে অধ্যাপককন্যা দোলনচাঁপা মিত্র জাতিস্মর হিসাবে বর্ধমানের সুবিখ্যাত দে পরিবারের প্রয়াত পুত্র নিশীথের জন্মান্তর বলে নিজেকে দাবি করেছেন। সেই দাবিকে প্রবন্ধ লিখে সমর্থন করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অস্বীকার করেছেন কলকাতা শহরের দশ বিজ্ঞানী। স্বামীজী ও বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের পাশাপাশি নরেন্দ্রপুর, বর্ধমান ও শান্তিনিকেতন থেকে দোলনচাঁপা বৃত্তান্তের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি।

শান্তিনিকেতনে দোলনচাঁপা

নরেন্দ্রপুর-এর রামকৃষ্ণ মিশন

ছবি: বিকাশ চক্র

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রবক্তা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তাঁর 'লাইফ আফটার ডেথ' বইটি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না।

বস্তুত স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী তাঁর বইতে দোলনচাঁপা মিত্র নামে এক জাতিস্মরের কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনার অবতারণা করেছেন, যে জাতিস্মর পুনর্জন্ম লাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দের মানস কর্মভূমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন–এর গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টারের সিনিয়র লেকচারার মানিক মিত্রের বাড়িতে।

মানিকবাবুর ভালো নাম উদার্যময় মিত্র। তবে মানিক নামেই তিনি সকলের কাছে বেশি পরিচিত। কাটিহারের মানুষ তিনি। চাকুরি জীবনের শুরু বিহারের পাটনাতে, পশুচিকিৎসক কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে। সরকারি চাকরি ছেড়ে মানিকবাবু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন ১৯৫৮ সালে। নরেন্দ্রপুরের চাকুরি জীবনে আসার ক্ষেত্রে যার অনুপ্রেরণা সব চাইতে বেশি কার্যকরী ছিল, তিনি স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। মহারাজজীর বিশেষ স্নেহে ধন্য হয়ে মিশনে যোগ দেবার পর ১৯৬২ সালে মানিকবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয় কণিকা মিত্রের। '৬৩ সালে জন্ম নেয় প্রথম সন্তান জয়ন্ত। দোলনের জন্ম ৮ আগস্ট ১৯৬৭।

টুকটুকে ফরসা গায়ের রঙ দোলনের। দোলনের তখন মাত্র একবছর বয়স। তখন থেকেই সে কথা বলতে শুরু করে। দু'বছরের মধ্যেই তার উচ্চারণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। মিশনের মধ্যেই মানিকবাবুর কোয়ার্টার। হাজারো রকমের গাছপাছালিতে ঘেরা আশ্রমের পরিবেশের মধ্যেই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল দোলন। কিন্তু বছর তিনেক বয়েস থেকেই দোলনের পোশাক পরিচ্ছেদ পছন্দের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেলেন মা কণিকাদেবী। লক্ষ্য করলেন দোলন ফ্রক পরতে চায় না, ছেলেদের মতো প্যান্ট শার্ট পরার দিকে তার আগ্রহ বেশি। নিজের দামী সুন্দর ফ্রকের চেয়ে দাদার বেঢপ মাপের প্যান্ট শার্ট পরেই তার আনন্দ বেশি।

১৯৭১ সালের গ্রীষ্মকালে দোলনকে দাদার জামা প্যান্ট পরে থাকতে দেখে মা একপ্রস্থ বকলেন মেয়েকে–এ কি উদ্ভট স্বভাব? মেয়েদের পোশাক না পরে সব সময়ই তুমি ছেলেদের পোশাক পরো! দোলন মায়ের বকুনি খেয়ে চুপ করে থাকল। মনে বড় কষ্ট হতে লাগল তার, কিন্তু সেই মুহূর্তে মুখে কিচ্ছু বলল না। দুপুরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে মা ডাকলেন–আয় দোলন, আমার পাশে শুবি, আয়।

দোলন ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিল–আমি তোমার পাশে শোব না। তুমি দুষ্টু মা। আমাকে সকালে বকেছ। তুমি আমাকে খুব বকো। আমার

দোলনচাঁপা মিত্র

বাবা মা ও দাদার সঙ্গে দোলন

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তি

প্রবীর ঘোষ

আগের মা আমাকে এমন বকত না, ভারি ভালবাসত।

মেয়ের কথা শুনে হেসে ফেললেন কণিকাদেবী। হাসতে হাসতেই বললেন, তোর আগের মা আবার কেউ ছিল নাকি?

–ছিলই তো! সেই মা দেখতে তোমার চেয়েও সুন্দর। কত গয়না পরত, আদর করত আমাকে। কখনোই বকত না।

–তোর সেই মা তাহলে এখন কোথায়? –হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন কণিকাদেবী।

–কোথায় আবার, নিজের বাড়িতেই আছে।

–নিজের বাড়ি মানে? কোথায় সে বাড়ি?

–কেন, বর্ধমান, সেখানে আমাদের মস্ত লাল দোতলা বাড়ি। –ছোট্ট দোলন ঘাড় নাড়ায়।

মেয়েকে আদর করতে করতে মা উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে আর কে কে থাকে রে?

–বাবা থাকে। আমার আগের জন্মের বাবা। বাবাও কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসত। আমি তো ছেলে ছিলাম। কতো শার্ট-প্যান্ট ছিলো আমার। খুব বড়লোক ছিলাম তো আমরা।

–আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আগের জন্মে না হয় ছেলেই ছিলি। এখন তো মেয়ে, তাই মেয়েদের পোশাক পরতে হয়। আয় শুবি আয়।

অভিমানী মেয়ের মান ভাঙে না তবু। মায়ের কাছে এসে গজগজ করে–জানো, আমাদের মোটর ছিল। মোটর চড়ে আমি স্কুলে যেতাম, কলেজে যেতাম। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল একটি মন্দির। বাড়িতে দুর্গা পুজো হত। আমার এক বন্ধু ছিল রঞ্জিত···!

একরত্তি ছোট্ট মেয়ের মুখে এইসব কথা শুনে মা কেমন যেন একটু ঘাবড়ে যান। অবাক হন। অবশ্য, তারপরেই মনকে সান্ত্বনা দেন, ওসব বাচ্চাদের কল্পনা!

কিছুদিনের মধ্যেই দোলন কেমন যেন পাল্টে যায়। সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। চিন্তাক্লিষ্ট ভাব। চোখে মুখে বিমর্ষতার ছাপ। প্রায়ই বর্ধমানের বাড়ির কথা বলে, বায়না ধরে বর্ধমানে নিয়ে যাবার জন্য। আগের জীবনের অনেক কথাই সে গড়গড়িয়ে বলে যেতে থাকে। বলে–তখন আমার ডাক নাম ছিল বুল্টি। একবার আমার খুব অসুখ করে। হাসপাতাল ছিলাম। হাসপাতালে একদিন বিছানা থেকে পড়ে গেছিলাম। পায়ে ব্যথা লেগেছিল।

–কোন হাসপাতালে ছিলি–প্রশ্ন করায় দোলন জানায়–কলকাতার হাসপাতালে। সেখানেই আমি মারা যাই।

দোলন তার বুল্টির জীবনের আরও অনেক কথা জানাতে থাকে। ফুটবল খেলত, ক্রিকেট খেলত। বাড়ির কাছেই একটি মন্দির ছিল। বাড়িতে তারা হরিণ পুষত। ময়ূর পুষত। নীল ডোরাকাটা একটা শার্ট ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। তাদের বর্ধমানের বাড়িটা মহারাজার প্রাসাদের কাছে।

দোলনের কথার মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় ছিল যা মানিকবাবু ও কণিকাদেবীকে চিন্তায় ফেলল। দোলন কি তাহলে জাতিস্মর?

এদিকে যত দিন যাচ্ছিল, দোলনের মনে তীব্রতর হচ্ছিল বর্ধমানে যাবার আকাঙ্ক্ষা। বাবা-মা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না এই মুহূর্তে কি করা উচিৎ। বর্ধমানে গিয়ে যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন কে জানে! তাঁদের কথায় কেউ বিশ্বাস করবে কিনা তারই বা ঠিক কোথায়? শেষ পর্যন্ত লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে সব কথা বললেন মানিকবাবু ও কণিকা দেবী। মহারাজ বললেন–হিন্দুধর্মে তো পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। তা তোমরা একবার বর্ধমানে গিয়ে দেখই না। অবশেষে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের নির্দেশ এবং বাস্তব ঘটনা জানার কৌতূহলে মানিকবাবু ঠিক করলেন দোলনকে নিয়ে বর্ধমানে যাবেন।

মাণিকবাবু ও কণিকা দেবী দোলনকে নিয়ে প্রথমবার বর্ধমান গেলেন ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে। সঙ্গে ছিলেন নিমপীঠের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। কানাইবাবুর বাড়ি ছিল বর্ধমানেই। দোলনকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল মহারাজার প্রাসাদের কাছে। কিন্তু অনেক ঘোরাঘুরি করেও সে পূর্বজন্মের বাড়িটি খুঁজে বার করতে পারল না।

সেদিনই অত্যন্ত বিমর্ষ মনে বাবা-মার সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণাকাতর দোলন ফিরে এল নরেন্দ্রপুরে। ভালো মত খায় না, খেলে না। মাঝে মাঝে নিজের মনে কাঁদে আর মা বাবার কাছে কান্নাভেজা গলায় আরেকবার বর্ধমান নিয়ে যাবার জন্য আবদার জানায়। ঠিক এ সময় থেকেই দোলন তার মাথার পেছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে! জিজ্ঞাসা করলে বলে, বুল্টির মাথাতেও এরকম ব্যথা ছিল। তাতেই সে মারা যায়। অথচ দোলনের ডাক্তার এ ব্যথার কোন কারণ খুঁজে পান না।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের গাছগাছালির উপর সেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার টুপ টুপ শব্দ মনের উপর অপরূপ মোহ ছড়িয়ে

নিশীথ দের বর্ধমানের সেই বাড়ি

যাচ্ছিল। আষাঢ়ের আকাশ জলে টলমল। জানলার কাছে বসে আছে একটি মেয়ে। ফর্সা, শান্ত ধীর স্থির। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে 'অসীম বাহিরে'। যেন তার স্মৃতির এ্যালবামে এক একটা অসহ্য সুন্দর ছবি ভেসে উঠছিল, হারিয়ে যাচ্ছিল। আবার মনে পড়ছিল। মেয়েটির যন্ত্রণাবিদ্ধ কপালের কুঞ্চিত রেখা আর রহস্যময় ভাবুক চোখ দুটি ওই কথাই প্রমাণ করছে মনে হয়।

দূরে কোথা থেকে হিম হাওয়ায় ভেসে আসছিল গানের কলি–

একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপনমনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় কয়ে কয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টি ধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহর গুলি
কোন সুরে আজ ভরিয়ে তুলি
কোন ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে
বাঁধনহারা বৃষ্টি ধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

মেয়েটি আরেকটু উদগ্রীব হয়ে জানলার কাছে সরে গিয়ে শুনতে চেষ্টা করছিল গানটি কোথা থেকে ভেসে আসছে।

গানের কথাগুলি কেমন যেন নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে মনে হয় মেয়েটির। বাইরে তাকিয়ে সে বৃষ্টি আর বাতাসের কথা মনে করে। মনে পড়ে এক অচেনা নিজেকে। মনে পড়ে নিজের পড়ার টেবিলের কথা, নিজের খাট আলমারি, প্রিয় পোশাক আশাকের কথা। একটা ঘোরানো সিঁড়ি ছিল, যে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে যেত, ব্যালকনিতে দাঁড়াত, দূরের আকাশ দেখত, পাখির ডাক শুনত। মনে পড়ে মা তাকে কত আদর করত, কাছে বসিয়ে খাওয়াতো। বাবাও ভালবাসত খুব। কাকা কাকীমাদেরও ভালবাসা পেয়েছে সে। ভাই-বোনেদের আদর আহ্লাদ পেয়েছে। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত আসত নিজের খেয়ালে, চলে যেত। মেয়েটি কিছুতেই ভুলতে পারে না এসব। এখানে বন্ধুবান্ধব, গল্প সিনেমা, গান নিয়ে মেতে থাকতে চায়। পুরনো অনেক কথাকেই একেবারে ভুলে যেতে চায়, এক অনিবার্য রহস্যময় খোঁচাতে তবু তা কিছুতেই হয়ে ওঠে না। কোন শ্রাবণসন্ধ্যা, বর্ষণমুখর দিন কিংবা গ্রীষ্ম অলস দিনে মেয়েটির মনে হয়–পুরনো সব দিনের কথা! মনে পড়ে, কখনো জলে চোখ ভারী হয়ে ওঠে–শেষ পর্যন্ত ওরা এমন অসম্মান করল। মা পর্যন্ত সন্তানকে দূরে সরিয়ে দেয়। পার্থক্য তো মাত্র একটা জন্মের!

পেছন থেকে একজন সহপাঠী এসে জিজ্ঞেস করে–কি করছিস দোলন, ওঠ চুপচাপ বসে বসে কি ভাবছিস অত?

কি যে ভাবছে দোলন সে কাউকে বলে উঠতে পারে না। বন্ধু বান্ধবদের বলতেও তার কেমন একটা সংকোচ জাগে। কে জানে ওরা কেমন ভাবে নেবে। জন্মান্তর, এতো অবিশ্বাস্য! তবে তার এত

অনাথশরণ দে, নিশীথের বাবা

কষ্ট কেন? সেদিন সেই বর্ধমান যাবার কথা কেন সে কিছুতেই ভুলতে পারে না? নিজের মধ্যে নিজে কেমন একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা অনুভব করে, কিন্তু এও জানে যে এর উপশমের কোনও উপায় নেই। সেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কখনো অস্ফুটে দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন–

তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি
দিতেছে জীবন ধূলাতে টানি
সারাক্ষণের বাক্য মনের সহস্র বিকারে।

দোলনের ঠোঁটে আবার কখনো ফিরে আসে সেই গানের কলি–

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।

মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব, একটা ব্যথা অহরহ জেগে থাকে দোলনের বুকের মধ্যে। দুই দিকে দুই মা, দুই বাবা, দুই ভাই, দুই পরিবার। একটা বাস্তব, একটা মানসিক। তাকে অহরহ দুই তরফে টানে! নাড়ি ছেঁড়া টানের সে ব্যথা নিজের বুকে চেপে রাখে দোলন। অবিশ্বাসের ভয়ে কাউকে বলতে পারে না। কষ্ট করে হাসে, শান্ত বিকেলের আশ্রমিক পরিবেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে, তানপুরা বাজায় মগ্ন হয়ে–তবু একটা চিনচিনে বেদনা–তারে ভোলা যে গেল না কিছুতে!

ষোল বছরের আগের সেদিনকার কথা মনে পড়লেই দোলন আজও কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। গলা শুকিয়ে ওঠে তার। অভিমানে মুখ চোখ রাঙা হয়ে যায়।

দিনটা ছিল ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ। প্রথমবার বর্ধমান থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসার পর এটি দোলনের দ্বিতীয়বার বর্ধমান যাত্রা। তবে
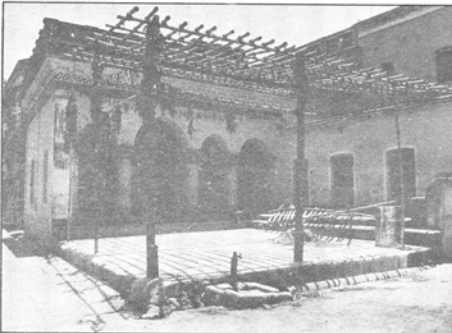
বর্ধমানে, বাড়ির সামনের মন্দির

এবারে আর সঙ্গে কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। সঙ্গে আছেন নীলাচল সামন্ত, তাঁর স্ত্রী স্বপ্না দেবী, দোলনের মা এবং দোলন। নীলাচলবাবু বর্ধমানের মানুষ। চাকরি করেন রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুরে। মানিকবাবুর সহপাঠী ও বন্ধু তিনি। বর্ধমানে তাঁদের বাড়িটিও মহারাজার প্রাসাদের খুব বেশি দূরে নয়। নীলাচলবাবুর স্ত্রী স্বপ্নাদেবীর বাপের বাড়ি রাজবাড়ির আরও বেশি কাছাকাছি। মানিকবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে যখন দোলনের যন্ত্রণাময় জাতিস্মরের কাহিনীগুলি নীলাচলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্নাদেবী জানলেন তখন তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতে চাইলেন। দোলনের আগের বাড়ি যে তাঁরা খুঁজে দিতে পারবেন, কিংবা এখনকার সকলের সঙ্গে যে পরিচয় ঘনিষ্ঠতা আছে তাও কিন্তু নয়, তবু মানিকবাবু, কণিকাদেবী নীলাচলবাবুর পরামর্শক্রমে ঠিক হলো দোলনকে নিয়ে বর্ধমান যাওয়া হবে। দিন স্থির হল ৩০ মার্চ। এদিকে ১৯৭৯ সালে বর্ধমান থেকে ফিরে আসার পর দোলন বাড়িতে প্রায়শই কান্নাকাটি করত—আমাকে আরেকবার বর্ধমান নিয়ে চলো, আমি আমার সেই বাড়ি ঠিক খুঁজে নিতে পারব।

কণিকাদেবী ও দোলন, নীলাচলবাবুর স্ত্রী সঙ্গে গিয়ে উঠলেন নীলাচলবাবুর শ্বশুর বাড়িতে। এবারে বর্ধমান এসে ছোট্ট দোলনের আনন্দ আর ধরেই না। বিকেলবেলা দোলনকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন কণিকাদেবী, স্বপ্নাদেবী এবং স্বপ্নাদেবীর বোন প্রতিমা। প্রতিমাদেবীর তখনও বিয়ে হয় নি। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দোলন একেবারে ছুটতে শুরু করে দেয়। কণিকাদেবীরা যে পিছিয়ে পড়ছেন সেদিকে তার তাকাবার ফুরসৎ নেই। সবচেয়ে আগে দোলন, পেছনে প্রতিমা দেবী। তার বেশ খানিকটা পেছনে কণিকাদেবী আর স্বপ্নাদেবী।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। অন্নপূর্ণা মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছে থমকে দাঁড়ায় দোলন। কণিকাদেবী সেখানে এসে পৌঁছলে দোলন আত্মস্থ আনন্দে চিৎকার করে উঠল—মা, মা—এই সেই অন্নপূর্ণা মন্দির। আবার দৌড়। দোলন এবার এসে দাঁড়াল একটি লালবাড়ির সামনে। মানুষপ্রমাণ উঁচু ভিতের উপর তৈরি বাড়ি, একতলায় উঠতে গেলে

মৃত্যুর পর জীবন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কোন লোক কিভাবে মারা যাবে তা তার কর্মই ঠিক করে দেয়। পুনর্জন্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কথা হল কিভাবে একজন মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করে? তিনি যখন কর্মনিয়ন্ত্রিত আত্মসংযম পর্ব সম্পূর্ণ করেন, তখনই তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়। তাঁর পরবর্তী পিতামাতার মধ্যে দিয়েই তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এমন নয় যে পিতামাতাই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা শুধু দেহাধারই তৈরি করেন, কিন্তু তার আগেই সেখানে তার অস্তিত্ব থাকে। দৈহিক ও মানসিক বৈচিত্র্য নিয়ে তার নিজের একটি স্বকীয় পরিচয় থাকে। পিতামাতার সঙ্গে তার একটি জ্ঞাতিত্ব থাকবে, কিন্তু কখনই তা খুব স্পষ্ট হবে না। সাধারণ পিতামাতার ঘরে অলৌকিক প্রতিভাশালী শিশুর জন্ম বা উচ্চমর্যাদাশীল পিতামাতার ঘরে নিতান্তই সাধারণ শিশুর জন্মকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আমি নিজেই একটি চার বছরের বালককে প্রকৃত ওস্তাদের মত তবলা বাজাতে দেখেছি। বহু সঙ্গীতজ্ঞ পরিবেষ্টিত কলকাতার এক বৃহৎ মঞ্চে জনসমক্ষে সে এ কাজ করেছিল। সে অনুষ্ঠানে এসেছিল তার বাবার হাত ধরে। মঞ্চের অদ্ভূত পরিবেশ দেখে সে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওস্তাদ যখন গাইতে শুরু করলেন তখন সে বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে তবলা বাজাতে শুরু করে। এজন্য সে কোন উৎসাহ বা এগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। সে পুরো এক ঘন্টা তবলা বাজায়। সে যখন বাজাচ্ছিল তখন তাকে অনেক বড় ও বয়স্ক দেখাচ্ছিল, তার হাবভাব ছিল তবলচির মত। সে তবলা বাজানোয় পারদর্শী, কিন্তু তার বাবা তবলা সম্পর্কে কিছুই জানত না, এমন কি তার পরিবারেও ছিল না কোন সঙ্গীতজ্ঞ। গ্রাম্য বাবা-মা'র অধিকাংশ সময় কাটে কৃষিকাজে। তাদের সঙ্গীত চর্চার সময়ই নেই। বালকটিকে আবিষ্কার করেন এক প্রতিবেশী, যিনি নিজে একজন ভাল তবলচি। তিনি দেখতে পান ছেলেটি একটি পেতলের ঘড়ায় উচ্চাঙ্গের তাল তুলছে। ছেলেটিকে একটি তবলা দেওয়া হলে সে খুশি হয় এবং নিজের রুচি অনুযায়ী বাজাতে থাকে। এই ভদ্রলোকই ছেলেটির বাবা-মার কাছে তাকে কলকাতার মানুষের সঙ্গে পরিচয় করানোর পরামর্শ দেন।

আমি আরেকটি ন'বছরের মেয়ের কথা জানি, যার বাবা-মা সংস্কৃত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, সে অনর্গল সংস্কৃত বলে। এসবের একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল পূর্বজন্মের প্রতিভাস। আমরা আমাদের কার্যকারিতা, প্রবণতা ও রুচির দ্বারা পরিচিত হই। বর্তমান জীবনে তার সবটা অর্জন করা যায় না। তাদের কিছু অংশ আসে আমাদের অতীত জীবন থেকে।

যেসব মানুষ তাদের পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা দাবি করে তাদের নিয়ে এখন বিপুল গবেষণা চলছে। এসব গবেষণা সমর্থন করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব গবেষণায় জন্মান্তরবাদের স্বপক্ষে চাঞ্চল্যকর তথ্য উত্থাপিত হয়েছে। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ইয়ান স্টিভেনসন বহু ঘটনা নথিভুক্ত করেছেন, সেগুলি থেকে তাঁর সহকর্মীরাও জন্মান্তরবাদের সত্যতা অবহিত হয়েছেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক স্টিভেনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং আলোচনা করেছি এই বিষয় নিয়ে। তিনি দর্শন নিয়ে মাথা ঘামান না, মাথা ঘামান ঘটনা নিয়ে। তিনি বলেন, সারা পৃথিবী জুড়েই এরকম ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে এসব হয় তা তিনি জানেন না। তিনি এ বিষয়ে যেসব বই লিখেছেন তার প্রথম খণ্ডে দোলনচাঁপার কথা আছে। আমি মেয়েটি এবং তার বাবা-মাকে খুব ভাল করে জানি। তার যখন তিন-চার বছর বয়স তখন সে বলতে শুরু করে যে, সে আগের জন্মে একজন পুরুষ ছিল এবং সে জন্মেছিল বর্ধমানের একটি সুপরিচিত পরিবারে। ছ'বছর বয়সের সময় সে আগের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। তাকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হলে সে বাড়ির পথ দেখাতে পারবে বলে জানায়। তাকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সে বাড়ি চেনাতে পারে না—যদিও পরে তার গোচরীভূত হয়। সে বাবা-মা'র হাত ধরে বাড়িটির খুব কাছে নিয়ে যায়। তারপর সে আরেকবার চেষ্টা করে এবং সফল হয়। সে শুধু বাবা-মা'কে সঠিক বাড়িতেই নিয়ে যায় নি, পরন্তু সে পরিবারের সমস্ত লোকজনকেই সনাক্ত করেছিল। এমন কি তার প্রতিদিনের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় এবং জিনিসপত্র দেখিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটি এখন মাঝে মাঝে আগের বাড়ির কথা বলে, প্রায়শ নয়। একটি বড় ঘটনার এটি একটি সংক্ষিপ্তসার মাত্র। স্টিভেনসন বলেন, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এরকম কয়েক শ' ঘটনা জানতে পেরেছেন। তিনি জানিয়েছেন ঘটনাগুলি সত্য হিসাবে গ্রহণের আগে সেগুলি যাচাই ও পুনর্যাচাই করা হয়েছে।

সৌজন্যে : দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা।

দোলন সম্পর্কে দশবিজ্ঞানী

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী দোলনচাঁপার পুনর্জন্মের ঘটনা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে কলকাতার বিজ্ঞানী মহলের প্রতিক্রিয়া কী, তা জানতে তাদের কাছে গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি। শোনা যাচ্ছে ইদানিং বিজ্ঞানী মহলও নাকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, পরামনোবিজ্ঞান নিয়েও চলছে গবেষণা—এই পটভূমিতে দোলন-চাঁপার ঘটনাটি বিজ্ঞানী মহলে কতটা সাড়া জাগাতে পারে এই সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হতেই তিনি জানালেন, নিশীথ ও তার পরিবারের বিষয়ে যেসব তথ্য দোলন ঠিক ঠিক জানিয়েছিল, সেগুলো কারো কাছে শোনার কোনও সম্ভাবনা দোলনের ছিল কি না, সেটাই সবচেয়ে বড় পয়েন্ট। গোটা রিপোর্টটা পড়ে দেখতে পাচ্ছি দোলনের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা ছিল। এমন কিছু কিছু মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের অধিকারী মানুষ রয়েছেন, যারা কোনও একটি ঘটনা শোনার ও জানার পর দ্রুত নিজের সত্তার মধ্যে সেই ঘটনার নায়ক বা নায়িকার সত্তাকে অনুভব করে থাকে। ধীরেন্দ্রবাবুর মতে, 'নিশীথের মাথার ব্যথা দোলনের মাথায় অনুভূত হওয়ার মধ্যেও কোন অলৌকিক ব্যাপার নেই। নিজের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে এই ধরনের ব্যথা নিজের শরীরে অনুভব করার বহু ঘটনা আমি দেখেছি। জাতিস্মরতা আসলে ভূতে ভর কিংবা ভগবানের ভর করার মতই একটা মানসিক রোগ।' আরেক বিজ্ঞানী বিনায়ক দত্তরায়ের কাছে এই ব্যাপারটা এক রকম অমানবিক বলেই মনে হয়েছে। তাঁর মতে, প্যারাসাইকোলজিস্ট ও আধ্যাত্মবাদীরা মিথ্যের ধুয়ো তুলে দোলনকে মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর ফলে মেয়েটির যে মানসিক ভারসাম্যের অভাব হতে পারে সে কথা একবারও কেউ ভাবছেন না। তিনি ব্যাখ্যা করে জানালেন যে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একটি মানুষ অনেক সময় নিজের সত্তার মধ্যে অন্যের সত্তাকে অনুভব করে থাকে। সেই সময় মানুষটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া। বিনায়কবাবুর গলায় আক্ষেপ ফুটে উঠল, 'অথচ প্রায়শই দেখা যায় মানুষটির বাবা মা তখন চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তাকে জাতিস্মর প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে সন্তানের ক্ষতি করেন।'

দিলীপ বসু

গৌতম ভট্টাচার্য্য

জ্যোতির্ময় দত্ত

বিনায়কবাবুর মত বিজ্ঞানী জ্যোতির্ময় দত্তও এই জাতিস্মর নিয়ে মাতামাতি করাকে হুজুগ বলেই বর্ণনা করলেন। তার কাছে এটি অপবিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সাধারণ মানুষ যাতে এ ব্যাপারে সচেতন হন সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলে উপকারই হবে বলে তার বক্তব্য। দোলনচাঁপার এই জাতিস্মরতার বিষয়টি সম্পর্কে গুড সার্টিফিকেট দিতে নারাজ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুবিমল সেন। তাঁর কথায়, 'রিপোর্টটি পড়ে মনে হচ্ছে, জাতিস্মরে বিশ্বাসীরা যেভাবে ঘটনাকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে অনেক গলদ আছে।' সুবিমলবাবুর কথায় রীতিমত সংশয়, 'দোলনচাঁপার স্বপক্ষে এমন কোন তত্ত্ব নেই, যাতে তাঁর জন্মান্তর ক্ষমতায় বিশ্বাস করা যায়।'

দোলনচাঁপার পুনর্জন্ম সংক্রান্ত ঘটনাটিকে কলকাতার বিজ্ঞানীমহল যে সংশয়ের চোখে দেখছেন, বিজ্ঞানী অঞ্জন কুন্ডুর কথাতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তিনি জানালেন, "আমি বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কিনা তা বড় কথা নয়। কেউ কোন কিছু প্রমাণ করে দেখাতে পারলে আমি তা মেনে নেব। দোলনচাঁপার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়নি। অতএব বিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কোথায়? দোলনচাঁপার পুনর্জন্ম সম্পর্কে রিপোর্ট একপেশে হওয়াতে যুক্তি দিয়ে গোটা বিষয়টি বুঝে

রাজকুমার মৈত্র

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অঞ্জন কুণ্ডু

ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।' দোলনচাঁপার জাতিস্মরতার বিষয়টি নিয়ে একদল মানুষের হইচইকে নিতান্তই অপবিজ্ঞান বলে ধরে নিয়েছেন বিজ্ঞানী গৌতম ভট্টাচার্য। তিনি দোলনচাঁপা সম্পর্কে রিপোর্টটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সোজাসুজি জানালেন যে দোলনচাঁপাকে যারা জাতিস্মর প্রমাণ করতে চাইছেন, তাঁদের ধারণা একেবারেই মিথ্যে। তিনি বলতে লাগলেন, 'বায়োলজিক্যালি জীবন ব্যাপারটা জাতিস্মরতাবাদের পরিপূর্ণ বিরোধী। জন্মান্তরবাদ দাঁড়িয়ে আছে একান্তভাবে অন্ধবিশ্বাসের ওপর।'

বিজ্ঞানী রাজকুমার মৈত্র অবশ্য মনে করেন যে বিজ্ঞানী মাত্রই যুক্তিবাদী হবেন। কিন্তু কিছু কিছু বিজ্ঞানীর এই যুক্তিহীন চিন্তার পেছনে রয়েছে ছেলেবেলা থেকে পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত পরিবেশ। দোলনের ব্যাপারে তিনিও নিঃসংশয় নন। তার মতে, 'আমাকে যদি আত্মায় বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বায়োলজির বিষয়ে যা জানি তা ভুলে যেতে পারি।' বলা বাহুল্য দোলনচাঁপা সম্পর্কেই যে তাঁর এই স্বীকারোক্তি, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

জাতিস্মরতা, ঈশ্বর-অমরত্ব কিংবা আত্মার অস্তিত্বকে কখনোই মেনে নিতে রাজি নন বিজ্ঞানী বিনয় দাস মহাপাত্র। তিনি জানালেন, 'প্যারানর্মাল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে অনেকেই অনুসন্ধান করছেন, ইয়ান স্টিভেনসন বা এইচ এন ব্যানার্জির মত প্যারাসাইকোলজিস্টরা কি এমন একজন জাতিস্মরের দৃষ্টান্ত হাজির করতে পেরেছেন যে তার পত্ত জীবনের কথা মনে রেখেছে!' এবার এল দোলনচাঁপা প্রসঙ্গ। বিনয়বাবু জানালেন যে 'দোলনচাঁপার তথাকথিত অনেক কথা কেন মিলে গিয়েছিল, তা অবশ্য ধাঁধায় ভরা। আমি এ দোলনচাঁপার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছি না। রিপোর্ট যা পড়লাম তাতে ব্যাপারটা একটা স্টান্টবাজি। আসলে যুক্তি দিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।'

পরামনোবিজ্ঞানের এই ধোঁয়াচ্ছন্ন বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলের যে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই, তা লক্ষ্য করা গেল। বিজ্ঞানী মনোরঞ্জন ভট্টাচর্যের মতে, 'একজন বিজ্ঞানী খেলোয়াড় শিল্পী কিংবা চোর হতে পারেন। তার এই ব্যক্তিগত চরিত্র বিজ্ঞানের বাইরের ব্যাপার। কোন বিজ্ঞানী যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিংবা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন—তবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। এটি সাধারণ মানুষের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।' মনোরঞ্জন-বাবুর কথারই পুনরুক্তি শোনা গেল দিলীপ বসুর বক্তব্যে। প্রশ্ন শুনে প্রতিক্রিয়া জানাবার আগেই বিজ্ঞান সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ কয়েকটি কথা বললেন, 'ঈশ্বর বিশ্বাস একজনের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এরসঙ্গে বিজ্ঞান সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। আত্মার অস্তিত্ব কিংবা অমরত্ব বা জন্মান্তরও একইভাবে ব্যক্তি বিশ্বাসের ব্যাপার।' দোলনচাঁপা সম্পর্কে রিপোর্ট বিষয়টি দিলীপবাবু গভীরভাবে স্টাডি করেছেন। তাঁর মতে, 'এর আগে অনেকেই প্যারানর্মাল বা তথাকথিত অতিন্দ্রিয় বিষয়ের ওপর দীর্ঘ পরিশ্রম লব্ধ গবেষণা করেছে। উই পে থ্যাংকস টু দেম। এইবারও এই রিপোর্টটি পড়েছি। এটি অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হলে সমাজের লাভই হবে। এটা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর জোরালো আঘাত বলেই গন্য হবে।'
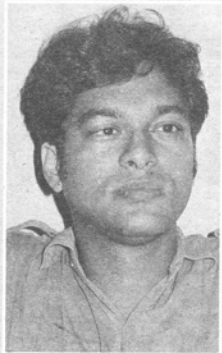
জন্মান্তর নিয়ে বিজ্ঞানীদের এই সংশয়ের পাশাপাশি বরেণ্য ব্যক্তি স্বামী লোকেশ্বরানন্দর বক্তব্য রীতিমত পরস্পর বিরোধী। স্বামীজীর বক্তব্যকে মানতে নারাজ কলকাতার প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা। এই বিতর্ক কতদিন চলবে, তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা লড়াই বরাবরই চলে আসছে। দোলনচাঁপার পুনর্জন্ম সংক্রান্ত ঘটনাটি হয়তো এই বিষয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

নিজস্ব প্রতিনিধি।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি। কিন্তু দোলন দাঁড়াল আর একটি সিঁড়ির সামনে। নরেন্দ্রপুরে থাকতে কণিকাদেবীর কাছে লাল দোতলাবাড়ি, আর ওই সিঁড়ির গল্প করেছিল। প্রতিমাদেবী এসব জানতেন না। দোলনের মুখে তাদের পূর্বজন্মের বাড়ির কথা শুনে মনে করেছিলেন বুল্টি বোধহয় তাঁদের পাশের বাড়িতে থাকত। কারণ বুল্টির বয়সী আরেকটি ছেলেও দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। দোলনকে অন্য বাড়ির সামনে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াতে দেখে প্রতিমা দেবী দোলনকে জিজ্ঞাসা করলেন–ওখানে কেন? দোলন বলে–এই তো আমার সেই বাড়ি। এর দোতলায় আমি থাকতাম।

কণিকাদেবী ও স্বপ্নাদেবী এসে পৌছলেন এবার। দূরে কয়েকটি ছেলে কি যেন খেলছিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কণিকাদেবী এই মুহূর্তে কি করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। দোলনের প্রসঙ্গটি এ বাড়িতে তুলবেনই বা কি করে? তাঁরাই বা কেমন ভাবে নেবেন! এদিকে দোলন তখন আনন্দে আত্মহারা। সিঁড়ির উপর একবার দাঁড়াচ্ছে, পকেটে বাঁ হাত আর মুখে ডানহাতের আঙুল তর্জনী দেবার ভঙ্গিতে আবার কখনও বা পুরুষালি অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় উপর নীচ করছে। পরে জানা গেছে দোলনের পূর্বজন্মে বুল্টি ওরফে নিশীথেরও ওই ভংগিটি ছিল মুদ্রাদোষ।

শেষ পর্যন্ত স্বপ্নাদেবীরা ঠিক করলেন যারা খেলছিল, তাদেরকে দিয়ে বাড়ির ভেতরে খবর পাঠাবেন। ডাকতেই ছেলেরা কাছে এল। খবরও পৌছে দিল বাড়ির ভেতরে। বাড়িতে তখন বাড়ির ছেলেরা কেউ ছিলেন না। মেয়েরা সব শুনে স্তম্ভিত হলেন। এদিকে দোলন তখন ঘরময় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। অনৈসর্গিক আলোড়নের তাড়নায় যেতে চাইছে নিজের ঘরে। হতবাক সকলে ওকে অনুসরণ করে। দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘরের দিকে সে। কণিকাদেবীকে ডেকে বলে, এই আমার খাট, এখানে আমি শুতাম। সকলে দেখে, হাসিখুশি দোলন নিজেকে ভুলে বর্ধমানের এই দে পরিবারের মৃত সন্তান বুল্টি ওরফে নিশীথ হয়ে যাচ্ছে।

ঘরে ছিল দুটো আলমারি। একটি সুন্দর করে বার্নিশ করা, অন্যটি সাধারণ। রুদ্ধশ্বাস কণিকাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, কোনটা তোমার আলমারি?

–কেন এইটে। বলে আঙুল দেখিয়ে দিল বার্নিশ করা ঝকঝকে আলমারিটির দিকে। তারপর বলল, আলমারির চাবি কোথায়?

প্রয়াত বুল্টির বোন রীতা বের করে দিল দুটো চাবি। দোলন ঠিক ঠাক চিনতে পারল কোনটা কোথাকার চাবি। তাড়াহুড়ো করে দোলন বলল, আমার নীল ডোরা কাটা শার্টটা কোথায়, দাও। আমার নরেন্দ্রপুরের মা'কে দেখাই। আলমারি থেকে শার্টটা বের করে দিতেই শার্টটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে দোলন কণিকাদেবীকে বলল, দেখ দেখ, এই শার্টটার কথাই তোমাকে বলেছিলাম। এটা আমার

লক্ষ্মী দে, নিশীথের এই আত্মীয়া দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন

খুব প্রিয় ছিল।

কণিকাদেবীর মুহূর্তেই সর্ব শরীরে কেমন একটা অস্বস্তি হতে শুরু করল। তিনি যেন নিজেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না–এও কি সম্ভব! যাকে তিনি পেটে ধরেছেন, এতদিন আদর যত্নে বড় করে তুলেছেন সেই দোলন সত্যিই এ বাড়ির ছেলে নিশীথ ছিল? কে জানে মাতৃত্বের অধিকার খর্ব হচ্ছে দেখে কিংবা অন্য কারণে তার মানসিক অস্বস্তিটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। ঘোরাচ্ছিল মাথা। তিনি বললেন, আমি একটু ড্রয়িংরুমে বসব।

দোলন এবার এক ছুটে পৌঁছে গেল সেই ভদ্রমহিলার কাছে। যাঁর দিকে সে এতক্ষণ অপলক তাকিয়েছিল। ছুটে গিয়ে ঘন হয়ে দাঁড়াল তাঁর কাছে। ভদ্রমহিলা মুহূর্তের জন্য কেমন যেন শিউরে উঠলেন। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে বললেন–এসব কি হচ্ছে! আপনার মেয়েকে নিয়ে যান। আমার প্রয়োজন নেই। যে গেছে সে চলে গেছে।

কণিকাদেবীকে ড্রয়িংরুমে এনে বসানো হল। দোলন আজ সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলল, আমার পড়ার ঘরে যাব। নরেন্দ্রপুরে থাকতে সে কোনদিন পড়ার ঘরের কথা উল্লেখ করে নি। এখানে রীতাকে নিয়ে পড়ার ঘরে গেল, টেবিল দেখল। জিজ্ঞেসও করল–এখন তার টেবিলে কে পড়ে, ইত্যাদি।

নিশীথ কি তাহলে দোলন হয়ে এসেছে? সত্যি কি এরকম হয়? কৌতুহলে বাড়ির সকলের মধ্যে তখন গুঞ্জন। কিন্তু দোলনের আড়ষ্টতা নেই। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সে হাঁটছে এখানে। ড্রয়িংরুমে কণিকাদেবীর পাশে তখন বসেছিলেন নিশীথের কাকা কাকিমারা। বাইরে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। নানা প্রশ্ন নানা জনে করছে দোলনকে–আমি কে বলো। তোমার পাশে যাকে দেখছ তিনি তোমার কে হতেন? দোলন উত্তর দিচ্ছে। ঘরে তখন রীতিমত ভিড় জমে গেছে।

একঘর লোকের সামনে দোলনকে জিজ্ঞেস করা হল–এঁদের মধ্যে তোমার মা কে? দোলন নীরব। অন্য কারোর দিকে সে তাকায় নি। মাত্র একজনের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কণিকাদেবী বললেন, তোমাকে এতদূর নিয়ে এলাম, বল, কে তোমার মা? দোলন তখনও নীরব। সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কণিকাদেবী আবার বললেন, বল, কে তোমার মা?

দোলন এবার এক ছুটে পৌঁছে গেল সেই ভদ্রমহিলার কাছে। যাঁর দিকে সে এতক্ষণ অপলক তাকিয়েছিল। ছুটে গিয়ে ঘন হয়ে দাঁড়াল তাঁর কাছে। ভদ্রমহিলা মুহূর্তের জন্য কেমন যেন শিউরে উঠলেন। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে বললেন–এসব কি হচ্ছে! আপনার মেয়েকে নিয়ে যান। আমার প্রয়োজন নেই। যে গেছে সে চলে গেছে।

দোলন আদর পাবার প্রত্যাশায় এগিয়ে গেছিল নিশীথের মায়ের কাছে। এর আগে নিশীথের ঠাকুমা তাকে কোলে বসিয়েছেন, আদর করেছেন, কাকা কাকীমারা কোলে তুলে নিয়েছেন, গ্রুপ ফোটো থেকে সে শিশিরকে চিনে বার করেছে ঠিকমত। কিন্তু দোলনকে দেখে নিশীথের মায়ের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে। তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। দোলন যদি তাঁর নিশীথই হয় তাহলেও কি কণিকাদেবী মেয়েকে দেবেন–এরকম কোন চিন্তায় কিনা কে জানে নিশীথের মা নিজেকে ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছিলেন না। পীড়িত হচ্ছিলেন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায়। সবাই বললেন, দোলনকে একটিবার আদর করার জন্য কিন্তু নিশীথের মা ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে। চোখেমুখে জল দিয়ে ঢুকলেন বেডরুমে। খিল তুলে দিলেন। কারোর ডাকাডাকিতে সাড়া দিলেন না।

নিশীথের মায়ের কথাতে দোলন যে খুব আহত হয়েছিল সেটা তাকে দেখে খুব বোঝা যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত না থেমে ঘর থেকে সোজা নেমে তখন সে

গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। যে বাড়িতে আসামাত্র দোলন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিল, হঠাৎই তার আনন্দ গভীর দুঃখে পরিণত হল। চোখে টলটল করছে জল, ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে—আর এ বাড়িতে কোনদিন আসব না! কোনদিন আসব না এখানে!

যে বর্ধমান যাবার জন্য দোলন এক বছরেরও বেশি সময় কান্নাকাটি করেছে—সেই বর্ধমান থেকে হতাশ হয়ে নরেন্দ্রপুরে ফিরে এল দোলন। এখানে ফিরে আসার পর বর্ধমান কিংবা আগের জীবন নিয়ে আর খব একটা কথাও বলত না। তবে মাঝে মাঝে চুপ করে থাকত। কি সব ভাবত নিজের মনে! বাবা মা সব সময়েই চেষ্টা করতেন এটা ওটা দিয়ে পুরনো স্মৃতিটি ভুলিয়ে রাখতে। হয়তো দোলনও বা চাইছিল সবকিছু ভুলে যেতে।

দোলনচাঁপার কাহিনী হয়তো বা এখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ইচ্ছায় দোলনের জাতিস্মরতা সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হল আনন্দবাজার পত্রিকায়। দোলনের বাবা মানিকবাবু বললেন, স্বামীজী চেয়েছিলেন খবরটি প্রকাশিত হবার পর এই নিয়ে গবেষণার কাজে কোন বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে, তার মধ্য থেকে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।

দোলনের সম্পর্কে খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর মানিকবাবু কয়েকজন জ্যোতিষীর কাছ থেকে চিঠি পেলেন। তাঁরা দোলনের জন্মসময় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। প্রণব পাল এগিয়ে এলেন বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য। পেশায় তিনি অধ্যাপক, কিন্তু নেশায় প্যারাসাইকোলজিস্ট অর্থাৎ অতিন্দ্রিয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী।

শুরু হল তদন্ত। প্রাথমিক তদন্ত চালিয়ে প্রণববাবু দোলনচাঁপার ঘটনাটি জানালেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ান স্টিভেনসনকে। খবর পেয়ে স্টিভেনসন এলেন ভারতে। অধ্যাপক পালকে সঙ্গে নিয়ে স্টিভেনসন তাঁর অনুসন্ধান শুরু করলেন। নরেন্দ্রপুর, বর্ধমান দুজায়গাতেই কাজ চলল তদন্তের। কিন্তু বর্ধমানের দে পরিবার তাকে এ কাজে তেমন সাহায্য করেন নি বলে স্টিভেনসন লিখেছেন তাঁর রিপোর্টে।

তাঁর 'কেসেস অব দ্য রিইনকারনেশন টাইপ' বইটির প্রথম খণ্ডে দোলনচাঁপার কথা লিখতে গিয়ে তিনি বললেন—'দোলন মেড অল একসেপ্ট আ ফিউ অব দ্য স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস লাইফ।'

স্টিভেনসনের পর বিখ্যাত প্যারাসাই-কোলজিস্ট ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক মিত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মানিকবাবু, কণিকাদেবী ও দোলনকে নিয়ে বর্ধমানে যান। ডঃ হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন আরও একজন বিদেশি পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ হেমেন্দ্রনাথ কিন্তু অন্যান্যদের মত এবারেও অনাদি দে'র সক্রিয় সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হলেন। মানিকবাবু বললেন, আমরা তো প্রত্যাখ্যাত হয়েইছি, যাঁরা তদন্ত করতে গেছেন তাঁরাও দে পরিবারের দুর্ব্যবহার পেয়েছেন। স্টিভেনসন তো তাঁর বইতে দে পরিবারের দুর্ব্যবহারের বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন 'এর কারণটি অন্য কিছু নয়, দোলন তথা নিশীথ তাঁদের সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে দাঁড়াতে পারে এই প্রচ্ছন্ন ভয়ে তাঁরা বোধকরি সব সময় আড়ষ্ট! এমন কি তদন্তে দেখা গেছে যে পরিবারের আত্মীয়দের সঙ্গেও তাঁদের সুসম্পর্ক নেই।' স্টিভেনসন সাহেব যাই বলুন, আলোকপাতের অনুসন্ধায়করা ভাল ব্যবহারই পেয়েছেন তাদের কাছে।

পুনর্জন্মের 'নিশীথ'?

শুরু হল তদন্ত। প্রাথমিক তদন্ত চালিয়ে প্রণববাবু দোলনচাঁপার ঘটনাটি জানালেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ান স্টিভেনসনকে। খবর পেয়ে স্টিভেনসন এলেন ভারতে। অধ্যাপক পালকে সঙ্গে নিয়ে স্টিভেনসন তাঁর অনুসন্ধান শুরু করলেন। নরেন্দ্রপুর, বর্ধমান দুজায়গাতেই কাজ চলল তদন্তের।

বর্ধমানের বাড়িতে সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়ে দোলনের শিশু মনে যে আঘাত লেগেছিল, তার ক্ষত একুশটি বসন্ত পার হওয়া সত্ত্বেও দোলন ভুলতে পারে নি। অথচ সে আন্তরিক ভাবেই এই দুঃখগুলোকে ভুলতে চায়। দোলন বলে, কি আর করা যাবে, বাস্তবে এ জীবনকেই তো আমাকে মানিয়ে চলতে হবে।

আপ্রাণ চেষ্টাও করছে সে। ছেলেদের পোশাকের দিকে তার যে দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই সে আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে দোলন। কে জানে এই বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে ব্যথা কতখানি, কতখানি মনের জোর? তবু সবটা আজও ভুলতে পারে নি। নিশীথের ছোটকাকা প্রণব দে আর কাকীমা লক্ষ্মী দে'র দোলন কি কোনদিন ভুলতে পারবে!

১৯৮৫ সালে প্রণব দে আর লক্ষ্মী দে যখন মানিকবাবুর অফিসে এলেন, মানিকবাবু সাগ্রহে তাঁদেরকে কোয়ার্টারে আনলেন। দোলনকে চোখের দেখা দেখতে এসেছেন তাঁরা। ঘরে তাঁদেরকে বসিয়ে মানিকবাবু ডাকলেন দোলনকে। ঘরে ঢুকেই দোলন বলে—ছোট কাকীমা এতদিনে এলে? ছোটকাকারও এতদিনে সময় হল! বর্ধমানের দে পরিবারের অধিকাংশই দোলন বিষয়ে উদাসীন হলেও কাকা প্রণব দে এবং কাকীমা লক্ষ্মী দে দোলনকে তাঁদের নিশীথের মতই আদর করেন, ভালবাসেন। দোলনও খুব ভালবাসে তাঁদের। আজও যোগাযোগ আছে নরেন্দ্রপুরের মিত্র আর গোয়াবাগানের এই দম্পতির সঙ্গে। যোগসূত্র মিত্রদের দোলন, দে পরিবারের নিশীথ!

দোলন '৮৭ সালে হরিনাভি স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর মায়ের ইচ্ছাতে ভর্তি হল শান্তিনিকেতনে বি-মিউজ ক্লাশে। এক্ষেত্রে দাদা জয়ন্তেরও একটা ভূমিকা আছে। দোলন খুব ভালো গান গাইতে পারে ছোটবেলা থেকেই। তার সঙ্গে গান গাইতেন বাবা মানিক মিত্রও। দাদা জয়ন্ত মিত্রও ভালো গান গান। তবে দোলনের সবচেয়ে বড় সঙ্গী আর বন্ধু হলেন তাঁর বাবা। মেয়ের সঙ্গে তিনি গান করেন, খেলেন, হাসেন, নানা প্রসঙ্গে আলোচনায় ডুবিয়ে রাখেন দোলনকে, যাতে সে পুরনো স্মৃতিগুলোকে নিয়ে কোন কিছু ভাবনাচিন্তা না করে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশে অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্লাশে তালিম নিচ্ছে দোলন। বাবা-মা'ও মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পড়াতে পেরে মনে মনে খুশি। মেয়ে অন্তত পুরনো ব্যথাগুলো ভুলে অন্য এক জগতে থাকবে, ছাত্রছাত্রী সবার সঙ্গে থাকবে আরেক পরিবেশে।

কে জানে শান্তিনিকেতনের শান্ত আবহাওয়ায় আর গানের পরিমণ্ডলে কেমন আত্মমগ্ন আছে দোলন কিংবা ভুলতে পারছে কিনা অতীতের স্মৃতি, নিজের মধ্যে নিশীথের সত্তা! তবে এখন সে নিজের মধ্যে অনুভব করে প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।

ছবি। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

দোলনের জাতিস্মরতার মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক ও মনোবিজ্ঞানবেত্তার দাবিদার প্রবীর ঘোষ আমাদের আমন্ত্রণে দোলনচাঁপা মিত্রের জাতিস্মরতা বিষয়ক ঘটনাটির সত্যানুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রবীরবাবু বর্ধমান, শান্তিনিকেতন ও নরেন্দ্রপুরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সরজমিন সাক্ষাৎকার শেষে দোলন সংক্রান্ত কেসহিস্ট্রি পর্যালোচনা করে যুক্তিবাদী বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজস্ব বিশ্লেষণী মতামত পেশ করেছেন।

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১) দোলন নিশীথদের বর্ধমানের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল।	মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন	যে মন্দিরের সামনে দোলনকে দাঁড় করানো হয়েছিল তার কাছে অনাথদের বাড়িই সবচেয়ে বড়।
২) নিশীথ দের জীবিতকালে বর্ধমানের বাড়ির রং ছিল টুকটুকে লাল।	মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথ দে, শিশির দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে	ভুল। দে পরিবারের বিভিন্ন জনের সাক্ষ্যে এবং স্থানীয় মানুষের সাক্ষ্যে জানতে পারি বাড়ির রং চিরকালই হালকা গেরুয়া।
৩) দোলন গ্রুপ ছবি থেকে নিশীথের বাবা অনাথবাবুকে চিনিয়ে দিয়েছিল।	কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথ দে, শিশির, লক্ষ্মী দে	লক্ষ্মী দে বলেন, ওর ঠিক স্মরণে নেই। অনাথ দে এবং নিশীথ দে জানান, দোলন অনাথ দের ছবি বলে যাকে দেখিয়ে ছিল সেটা ছিল অনাথ দে'র ভাই অনিলকুমার দে'র ছবি
৪) দোলন নিশীথের ভাই শিশিরকে চিনিয়ে দিয়েছিল প্রথম বর্ধমান যাত্রায় ছবিতে এবং	দোলন, কণিকা মিত্র, শিশির দে, অনাথ দে	অনাথ দে এবং শিশির দে জানান গ্রুপ ছবি থেকে শিশিরকে দেখিয়ে দেবার ঘটনা সত্যি নয়।
'৭৫ সালের তৃতীয় যাত্রায় শিশিরকে বাস্তবে দেখিয়ে দেয়।	দোলন, কণিকা মিত্র, শিশির দে, অনাথ দে	'৭৫ এর তৃতীয় যাত্রায় শিশির যে নিশীথের ভাই সেটা অপ্রকাশ্য ছিল না। ফলে নতুন করে চিনিয়ে দেবার প্রশ্নই ছিল না।
৫) দোলন নিশীথের ছোট বোন রিতাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।	কণিকা মিত্র, শিশির দে, অনাথ দে, লক্ষ্মী দে	কণিকা দেবী এবং লক্ষ্মী দেবীর কথায় দোলনের বক্তব্যের সমর্থন মিললেও শিশির দে এবং অনাথ দে'র কথায় রিতা তখন ঘরেই ছিল না। অতএব রিতাকে চেনাবার প্রশ্নই ওঠে না।
৬) দোলন লক্ষ্মী দেকেও বাড়ির ছোট কাকীমা বলে জানিয়েছিল।	লক্ষ্মী দেবী, দোলন, শিশির, অনাথ দে, প্রণব কুমার দে	লক্ষ্মী দেবী বলেন, 'দোলন এ কথা বলেছিল।' শিশির বলেন, 'প্রকাশ্যে আর কারও সামনে দোলন এ কথা বলে নি।' সুতরাং লক্ষ্মী কাকীমার ঘটনাটা সত্যি কি মিথ্যে সে কথা আমি বলতে পারব না। প্রণব দে এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী দের সঙ্গে অনাথ দে এবং শিশির দে পরিবারের সম্পর্ক বেশ কিছু বছর ধরেই খুবই খারাপ। ১৯৭৫ সালে গোয়াবাগানের বাড়ির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে পার্টিশন স্যুট করেন প্রণব দে। ১৯৮১ সাল থেকে বাড়ির দখল নিয়ে আরও একটি কেস শুরু হয়েছে বলে জানালেন লক্ষ্মী দে এবং প্রণব দে। অনাথ দে এবং নিশীথ দে'র ধারণা তাঁদের অপ্রস্তুত করার জন্য লক্ষ্মী দেবীকে চিনিয়ে দেবার ঘটনাটা বানানো হলে তাঁরা আশ্চর্য হবেন না।

প্রবীর ঘোষ, ঘটনাটিকে অবৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করেছেন

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
৭) দোলন নিশীথের শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, শিশির দে, অনাথ দে, অনিল দে	অনাথ দে এবং শিশির দে জানালেন নিশীথের নির্দিষ্ট কোনও শোবার ঘর ছিল না। বেশ কয়েকটি ঘরেই বিভিন্ন সময়ে শুতো। যে ঘরটা দোলন দেখিয়েছিল সে ঘরেও নিশীথ শুতো।

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
৮) দোলন নিশীথের পড়ার ঘর চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা দেবী, অনিল দে, লক্ষ্মী দে, শিশির দে	দোলন একটা পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। সেখানে চেয়ার, টেবিলে বই-পত্র ছিল। দোলন একটু দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'এখানে আমি পড়তাম।' অনাথ দে'র ভাই অনিল দে এবং শিশির এ কথা জানান। নিশীথ সত্যিই ও ঘরে পড়ত। পড়ার ঘরের পরিবেশ দেখে 'এ ঘরে পড়তাম' বলার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই।
৯) দোলন নিশীথের পোশাকের আলমারি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, শিশির দে, অনাথ দে	শিশির দে এবং অনাথ দে জানান, 'তেমন করে নির্দিষ্ট ভাবে কোনও বিশেষ আলমারি দোলন দেখিয়ে দেয় নি। একটা আলমারি দোলন খুলেছিল। সেটা নিশীথের নিজস্ব আলমারি নয়।' নিশীথ এবং আরও অনেকেরই পোশাক ওতে থাকত। আর একটা কথা। নিশীথের পোশাক শুধুমাত্র ওই আলমারিতে থাকত না। আরও অনেক আলমারিতেই থাকত। দোলনও বলেছে, ওই আলমারিতে আরও অনেকের জামা-কাপড় ছিল।
১০) দোলন ওই আলমারির চাবি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, নিশীথ দে	কণিকা মিত্র এবং লক্ষ্মী দে দোলনের কথা সমর্থন করলেও শিশির দে জানালেন, 'আলমারির চাবি চেনাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ চাবিই দোলনকে দেওয়া হয়নি।'
১১) আলমারিতে নীল ডোরা কাটা শার্ট ছিল।	শিশির দে	ছিল। কিন্তু সেটা আমার শার্ট। এই কথা জানিয়েছেন শিশির।
১২) বাড়িতে হরিণ ও ময়ূর ছিল।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে	আংশিক সত্য। তিনজনেই জানালেন হরিণ কোনও দিনই ছিল না। ময়ূর ছিল।
১৩) বাড়িটা দোতলা।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে	বাড়িটা তিন তলা, নিশীথের আমলেই।
১৪) স্কুল ছিল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মোটরে স্কুলে যেতাম।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে	নিশীথ রাজ স্কুলে পড়ত। সেটা নিশীথের বাড়ির খুব কাছে। স্কুলে প্রথম দিকে হেঁটে এবং পরে সাইকেলে যেত।
১৫) কলেজে মোটরে যেতাম।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে	নিশীথ রাজ কলেজে পড়ত। সাইকেলে কলেজে যেত।
১৬) ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতাম।	অনাথ দে, শিশির দে	ফুটবল, ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। তাই সকলেই খেলে। নিশীথও খেলত। শিশির জানালেন, 'আমিও খেলতাম, প্রতিটি পাড়ার আর দশটা সাধারণ ছেলেও খেলে।'
১৭) ছোট্ট বয়স থেকেই ছেলেদের পোশাকের প্রতি আকর্ষণ ছিল।	দোলন, মানিক দে, কণিকা দে	ছেলেদের মিশনের কোয়ার্টারে থেকে দোলন সঙ্গী হিসেবে প্রধানত ছেলেদেরই পেয়েছে। তাদের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছে। এই পরিবেশে ছেলেদের পোশাকের প্রতি মেয়েদের পোশাকের চেয়ে বেশি আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। আমি এই প্রতিবেদক স্বয়ং চার বোনের মধ্যে মানুষ হচ্ছিলাম বলে ছেলেবেলায় একবার পুজোর পোশাক হিসেবে ফ্রকের বায়না ধরেছিলাম।

বিজ্ঞানী বিনয় দাস মহাপাত্র

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১৮) বাড়ি বর্ধমানে, ধনী পরিবারে জন্ম, কাছে মন্দির, পদবী দে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাই। ও মারা যাই।	দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, অনাথ দে, লক্ষ্মী দে, প্রণব দে	প্রতি সাক্ষ্য প্রমাণ এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ বলছে এগুলো সত্যি। মানিক মিত্র এবং কণিকা দেবী বলেছেন তাঁর কেউই কোন দিনই বর্ধমানে যান নি। দোলনের প্রথম বর্ধমান যাত্রাই ওঁর মা-বাবারও প্রথম যাত্রা। অনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে কোনও

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		রকম পরিচয়ও ছিল না বলে মিত্র পরিবারও জানিয়েছেন। অথএব মা-বাবার কাছ থেকে নিশীথদের কথা দোলন শুনেছিল এবং অবচেতন মনে তা ছিল। একনাগাড়ে নিশীথের কথা ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ক কোষের কার্যকলাপের বিশৃংখলতার দরুন দোলন নিজের সত্তার মধ্যে নিশীথের সত্তাকে অনুভব করেছিল, এই মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব খাটে না বলে মানিক মিত্রের বিশ্বাস। নিশীথ ও তার পরিবারের গল্প দোলনের শোনার সম্ভাবনা ছিল কি না এটা জাতিস্মরের এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোলনদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষজনের অনেকেই বর্ধমানের মানুষ এবং অনাথবাবুদের পরিবারের পরিচিত। ১) নীলাচল সামন্ত মানিক মিত্রের বন্ধু। নিশীথের পরিবারকে চিনতেন। নিশীথের ঠাকুরদা চারুবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল। ২) স্বপ্না সামন্ত, নীলাচল সামন্তর স্ত্রী। নিশীথদের পরিবারের অনেক কিছুই জানতেন। ধনী পরিবারের বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। স্বপ্নাদেবীর বোন প্রতিমা দাঁ নিশীথদের আত্মীয় পৃথ্বীশ দে এবং তাঁর স্ত্রী মীরা দে'র পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। ৩) কানাইলাল ব্যানার্জি। মানিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বাড়িতে আসতেন। তিনি বর্ধমানের মানুষ। দে পরিবারের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-পরিচয় না থাকলেও দে পরিবারের বিষয়ে অনেক কিছুই জানতেন। ৪) শশাংক ঘোষ। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। মানিকবাবুর বন্ধু। বাড়িতে আসতেন। দে পরিবারের বিষয়ে জানতেন। ৫) রাজেন্দ্র চক্রবর্তী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দে পরিবারকে জানতেন। মানিকবাবুর বন্ধু হিসেবে মাঝে মধ্যে নরেন্দ্রপুরে মানিকবাবুর বাড়ি যেতেন। ৬) ডাঃ হেমাঙ্গ চক্রবর্তী বর্ধমান থেকে এসে নরেন্দ্রপুরে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেই সঙ্গে শুরু করেছিলেন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস। মানিকবাবুর পরিবারের সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুর পরিবারের সখ্যতা ছিল। হেমাঙ্গবাবু অনাথ স্মরণ দে'র পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। হেমাঙ্গবাবুর ছেলেও ছিলেন নিশীথের বন্ধু। এদের কেউ কোনও দিন অনাথবাবু ও নিশীথের গল্প মানিকবাবুদের বাড়িতে বসে করেননি অথবা হেমাঙ্গবাবুর ছেলের কাছ থেকে নিশীথের গল্প কখনও শোনেনি এমন নিশ্চিত বিশ্বাস করার মত কোনও তথ্য আমার হাতে নেই।
১৯) দোলন তার মাথায় ব্যথা অনুভব করত।	দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র	কিছু কিছু মানুষ মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা আবেগপ্রবণ, মস্তিষ্ক কোষের সহনশীলতা কম। বিশেষ সংবেদনশীলতার জন্য বহু সময় এরা নিজেদের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে 'সমব্যথী চিহ্ন' বা অন্যের ব্যথা নিজের শরীরে সৃষ্টি করেন, অনুভব করেন। এই ধরনের বহু ঘটনাই মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে। দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়।
২০) বর্তমানে দোলনের মাথায় কোনও ব্যথা নেই। নিশীথের নিয়ে চিন্তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও কমছিল।		মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবেগ প্রবণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সত্তার মধ্যে নিশীথের সত্তাকে অনুভব করার প্রবণতা কমেছে, কমেছে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে অন্যের ব্যথা অনুভব করার প্রবণতা।
২১) অ, আ, ক, খ, A, B, C, D, ১, ২, ৩, ৪ থেকেই পড়াশুনো শুরু করতে হয়েছিল। বি·কম পর্যন্ত যা পড়েছে তার কিছুই মনে ছিল না।	দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র	জাতিস্মর হলে পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতির মতো পূর্বজন্মের লেখা-পড়ার স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মানসিকভাবে কারও সত্তাকে অনুভব করলে তার ব্যবহার অনুকরণ করতে পারে কিন্তু তার জ্ঞান প্রয়োগ সম্ভব নয়। দোলনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

ছবি: তাপস কুমার দেব

৪১ পৃষ্ঠার পর

কর্মচারীদের ভেতর একত্র হওয়ার প্রবণতা বেড়ে উঠলো। পাশে এসে দাঁড়ালেন সি পি এমের কামারহাটি ও আড়িয়াদহর ব্রাঞ্চ কমিটির নেতারা। নিজেদের দাবি মেটানোর জন্য আন্দোলনের রাস্তা পেয়ে গেলেন স্টাফরা। কয়েকদিন বাদেই ঐতিহাসিক মে মাসে মন্দিরের মোট ৬০ জন স্টাফের ৫০ জনকে নিয়ে গড়ে উঠলো দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন। যার প্রেসিডেন্ট হলেন সি পি এম–এর কামারহাটি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত চ্যাটার্জি। মন্দির কর্মচারী ছাড়াও এই ইউনিয়নের হয়ে প্রকাশ্যে প্রচার চালাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ ও কামারহাটির পরিচিত সি পি এম সমর্থকরা। নিত্যযাত্রী ভক্তদের মনে আশংকা জেগে ওঠে, সি পি এম কি কালীবাড়িকে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তির মুঠোয় আনতে চায়?

উত্তর হাওড়ার কংগ্রেস বিধায়ক অশোক ঘোষ সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন পূজার্চনায়। কার পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করাতেই পরিবারটিকে ঘিরে ধরে কয়েকজন যুবক–'চাঁদা দিতে হবে'

–কিসের চাঁদা?

–সি পি এমের।

–আমি সি পি এমকে সাপোর্ট করি না।

–করেন আর নাই করেন, এসেছেন যখন তখন চাঁদা দিয়ে তবে যাবেন।

–জবরদস্তি নাকি!

–যদি ভাবেন তাই। এখানে যারা আসেন তাদের চাঁদা দিতে হয়। সাম্প্রতিকসময়ে বিধায়কের বক্তব্য এটি, 'রাজনীতি ঢুকল দক্ষিণেশ্বরে।'

৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ সালে তখনকার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সাহেবান বাগিচার মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী ৫৪ বিঘা জমি জন হেস্টি সাহেবের এস্টেটের ম্যানেজিং একসিকিউটিভ জেমস হেস্টির কাছ থেকে ৪২,৫০০ টাকায় কেনেন রানী রাসমণি। দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যহ দেবসেবা করার ইচ্ছে ছিল রাসমণি দেবীর স্বামী রামচন্দ্র দাসের। তাঁর মৃত্যুর পর স্বামীর একান্ত অভিপ্রায় পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসেন রানী।

১২৫৫ বঙ্গাব্দে, কাশী যাবার জন্য বেরিয়েছিলেন রানী রাসমণি। তখনও কলকাতা থেকে কাশী যাওয়ার রেলপথ হয়নি। গঙ্গাই ছিল যাওয়ার সহজ উপায়। আত্মীয়স্বজন লোকলস্কর নিয়ে বজরা করে বিশাল দল যাবে রানীর সঙ্গে। সাজানো হল একশ'টি ছোট বড় নৌকো। যাত্রার ঠিক আগের রাতে রানী ইস্টদেবীর দর্শন পেলেন স্বপ্নে। দেবী ভবতারিণী বললেন, কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভাগীরথীর তীরে মনোরম-জায়গা দেখে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমার মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে তোমার নিত্যপূজা ও ভোগ আমি গ্রহণ করবো।

কাশী যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল রানীর। স্বপ্নাদেশে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য কিনলেন

রামকৃষ্ণদেবের দুই উত্তরপুরুষ অভয়দার ও ইন্দ্রজিৎ

দক্ষিণেশ্বরের জমি। ১৮৫৬ সালের ৩১ মে, পুণ্য স্নানযাত্রার দিন নবরত্ন মন্দিরে জগদীশ্বরী কালীমাতা ঠাকুরানী, দ্বাদশ শিবমন্দির ও বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই দেবালয়কে জগদীশ্বরী কালী মাতা ঠাকুরানীর নামে লিখিত দানপত্রে নিজেকে প্রথম সেবাইত রূপে নিযুক্ত করেন রানী। লিখিত দানপত্র অনুসারে তাঁরই বংশধররা বংশানুক্রমিক সেবাইত হবেন, পরিচালনা করবেন মন্দিরের প্রশাসনিক কাজ। এবং সেদিন থেকেই মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে পরিণত হলো। বংশধরদের আর কোন সত্ব থাকল না। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ সালে রানী রাসমণি অর্পণনামায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে দেবোত্তররূপে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু এই দেবোত্তর সম্পত্তিকে ঘিরে মন্দিরের প্রশাসনিক মহলে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। মন্দির কর্মচারিদের অভিযোগ ট্রাস্টিদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তি মালিকানার জোর ফলাচ্ছে। ফলে ট্রাস্টির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পুরোহিত-কর্মচারীদের বচসা শুরু হয়। আর এরই ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভক্তদের কাছে যা কল্পনাতীত। বলতে বলতে কিছুটা সামলে নিলেন উত্তম নায়েক। মন্দির এলাকায় ফুল মিষ্টির দোকানদার। খরিদ্দার সামলানোর ফাঁক ফোকরেই বলতে থাকেন, 'মন্দিরের ট্রেড ইউনিয়নটির প্রেসিডেন্ট সি পি এম এর নেতা হলেও আমার মনে হয় না তিনি রাজনৈতিক মুনাফা লুটবেন। মনে হয় এই গুজবের জন্য দায়ী কংগ্রেস নেতা অশোক ঘোষ। উইমকোর ফ্যাকট্রি বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন দুঃস্থ লেবারদের জন্য ফ্যাকট্রির সি পি এম সমর্থিত সিটু ইউনিয়ন মন্দির কম্পাউন্ডে চাঁদা তোলে। কয়েক দিন আগে অশোক ঘোষ এখানে এসেছিলেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া হলে গোলমাল বাধে। আর তারপরেই মন্দিরে সি পি এম চাঁদা তুলছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে।

তবে ভবিষ্যতে এই ইউনিয়নের কার্যকলাপ কোনদিকে গড়াবে, সেটাই প্রশ্ন। একজন সক্রিয় সি পি এম ক্যাডার নেতা হয়ে ইউনিয়নের মধ্যে পার্টির মতাদর্শ ছড়াতেই পারেন কারণ তিনিই তো প্রেসিডেন্ট। যে কোন নেতাই চাইবেন নিজের ভিত দৃঢ় করতে। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তবাবু তেমন অভিপ্রায় আছে বলে মনে করি না। যদি তাই হয়, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও রাজনীতির লড়াই শুরু হবে। আমাদেরই বা কি করার আছে। যা করার করবে ট্রাস্টি।'

রানীর মৃত্যুর পর তাঁর চার কন্যা পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী, জগদম্বার ওপর পড়ল মন্দিরের প্রশাসনিক দায়িত্ব। ১৮৭২ সালে পদ্মমণির ছেলে বলরামদাস একটি স্কিম প্রস্তুত করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন। ১৮৭৪ সালের ২১ আগস্ট এই আবেদনের প্রিলিমিনারি ডিক্রি দেন হাইকোর্ট। ১৩ এপ্রিল ১৮৭৬ সালে মহামান্য আদালত এই ডিক্রিতে সম্মতি দেন। এর আগে মন্দিরের প্রশাসনিক কাজ দেখাশোনা করতেন ত্রৈলোক্য বিশ্বাস এবং সেই সময়কার শীর্ষ সেবায়েতগণ।

৪ ডিসেম্বর ১৯০৫, এই সেবাত্তর এস্টেট পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশে অ্যাসিসটেন্ট রেফারি স্কিম প্রস্তুত করলে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১২ সালে স্কিমটি আদালতের সম্মতি পায়। প্রমথ চৌধুরীর পর কয়েক বছর রিসিভার হন কিরণচন্দ্র দত্ত। কাজ করেন ১৯২৯ সাল পর্যন্ত।

ট্রাস্টি মহলে বিবাদ শুরু কিরণচন্দ্র দত্তর আমল থেকে। সেই সময় পদ্মমণির পৌত্র

IS 2344
উজ্বল প্রভাতের
তারার ঝিলিমিলি

প্রভাত জর্দা উৎপাদন

আইনের সতর্ক বাণী তামাক চেবানো স্বাস্থ্যের জন্য হানিকারক

যোগেন্দ্রমোহন দাস আদালতে রিসিভার কিরণচন্দ্রের অপসারণ দাবি করেন। নতুন স্কিম তৈরির জন্য আবেদন করেন আদালতে। ১৬ জুলাই ১৯২৯ সালে আদালত নতুন স্কিম প্রস্তুত করেন। নতুন স্কিম অনুযায়ী স্থির হয় সেবায়েতগণের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত তিনজন ট্রাস্টির হাতে এস্টেটের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকবে। নির্বাচন হবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে।

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে প্রথম 'বোর্ড অব ট্রাস্টি' রূপে নিযুক্ত হলেন যোগেন্দ্রমোহন দাস, নন্দলাল চৌধুরী ও কানাইলাল দলুই। এরপর বহু চেষ্টা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে মন্দিরের প্রশাসন ও দেবসেবা চলতে থাকে। এর মধ্যেই সেবায়েতদের ভেতর ট্রাস্টি নির্বাচন নিয়ে ঘরোয়া বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ক চরমে উঠলে মীমাংসার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন সেবায়েতগণ। ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬, হাইকোর্ট এই বিতর্কের মীমাংসা করে রায় দেন, একজন সেবায়েত ১টি ভোটের পরিবর্তে যে সেবায়েতের যতটুকু সেবা-পূজায়-অংশ তার ভোটাধিকারও ততটুকু। এদিকে বিতর্কের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন বাধা পড়ে। সংবিধানিক সংকট দেখা দেওয়ায় হাইকোর্ট স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেন। স্পেশাল অফিসার ৪ এপ্রিল '৭৮ নতুন নিয়ম অনুসারে নির্বাচন করে ট্রাস্টিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার নির্দেশ দেন।

এইভাবে দীর্ঘ ৯ বছর হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসাররাই মন্দিরের প্রশাসন চালাতে থাকেন। কিন্তু অফিসাররা ঠিক মত সহযোগিতা না পাওয়ায় মন্দিরের প্রশাসন ভেঙে পড়ে। মন্দিরকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন রানী রাসমণি পরিবারের কুশল চৌধুরী। তাঁর চেষ্টায় সেবায়েতগণের মধ্যে আবার ঐক্যমত ফিরে আসে। ১৪ জুন, ১৯৮৬ নির্বাচনের মাধ্যমে ট্রাস্টির কার্যভার গ্রহণ করেন পরেশ চন্দ্র হাজরা, সত্যরঞ্জন চৌধুরী ও অচিন্ত্য দাস। মন্দিরের কার্যকরী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন কুশল চৌধুরী।

মন্দিরে আবার সচল অবস্থা ফিরে আসে। শুরু হয় মন্দির মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পুরোহিত কর্মচারীদের মধ্যে আবার অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে মূলত মাইনে নিয়ে। প্রশ্ন জাগে, মন্দির কর্তৃত্ব নিয়ে বারে বারে ট্রাস্টি ও কর্মচারিদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে কেন?

সাধারণভাবে মন্দিরের প্রতিদিনের যাত্রীসংখ্যার গড় ২০ হাজার। শনিবার ও মঙ্গলবারে এটি ৪০ হাজার পর্যন্ত হয়। উৎসবে-তিথিতে লক্ষ যাত্রীর ভিড়। আয়ও সেই অনুপাতে। প্রণামী বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ে তহবিলে। পুরোহিতেরা মাইনে ছাড়া প্রণামীর টাকা পায় না। অন্যদিকে মাসিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার পরিচালন ক্ষমতা, কম কথা নয়। আর তাই নিয়ে বিতর্ক।

কথা হচ্ছিল ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য অচিন্ত্য দাস–এর সঙ্গে। বলছিলেন, মন্দিরেও যদি পার্টি পলিটিকস শুরু হয় তবে আর দেবসেবা চলবে কি করে? প্রশাসন চালাতে গেলে কর্মচারীদের যথেচ্ছ কার্যকলাপে বাধা দিতে হয়। এতে যদি ওরা ইউনিয়ন করে বসে, আর কি বলার আছে? শুনেছি মন্দিরের এই ট্রেড ইউনিয়নটি সিটু সমর্থিত। স্থানীয় সি পি এম নেতা লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তার প্রেসিডেন্ট।

লক্ষ্মীকান্তবাবু তা অস্বীকার করেন। বলেন, মন্দিরের কর্মচারীরা ট্রাস্টির অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের ন্যায্য দাবির জন্য একত্রিত হয়েছে। আমার কাছে সাহায্য চাইলে আমিই বা কেন এগিয়ে যাব না। এর মধ্যে পার্টিবাজি বা সি পি এম প্রসঙ্গ আসে কেন?

লক্ষ্মীকান্তবাবুর মতে, 'পার্টি ফাণ্ডের জন্য সি পি এম এর ছেলেরা এখানে চাঁদা তোলে না।

মন্দির ট্রেড ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরের পাশেই বন্ধ হয়ে যাওয়া উইমকোর দুঃস্থ লেবারদের সাহায্যের জন্য ওই ফ্যাকট্রিরই সিটুর ছেলেরা চাঁদা তোলে। জোর-জবরদস্তি তো করে না ওরা।' ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্যরকমের, তা অনেকে বললেন।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলেন, 'ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, তবে আমি জোর গলায় বলব আমরা মন্দিরের ভেতর রাজনীতি করতে আসিনি। এই মুহূর্তে পাল্টা কোন ইউনিয়ন মন্দিরের শ্রমিক স্বার্থে চালু হলে আমরা নিজেদের ইউনিয়ন ভেঙে দেব। ওদের কাজকে সমর্থন জানাবো। বর্তমান ইউনিয়নের মধ্যে শুধু আমি নই, কংগ্রেস নেতা সলিল বিশ্বাসও উপদেষ্টাদের মধ্যে আছেন (যদিও কামারহাটি কংগ্রেস কমিটির বক্তব্য ওই নামে আমাদের কোন দলীয় কর্মী মন্দির ট্রেডইউনিয়নে নেই। এটা সি পি এমের মান বাঁচানরো জন্য রটনা।)।'

মন্দিরের ভেতর ট্রেড ইউনিয়ন গড়া কতটা ন্যায়সঙ্গত তা নিয়ে সম্প্রতি মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। মন্দিরের পূজারী প্রণব ঘোষাল বহুদিন ধরেই মন্দির সেবায় নিযুক্ত। প্রধান মন্দিরে পালা অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধান মন্দিরের ভেতর অন্যান্য পূজারীদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের বর্তমান প্রশাসন সম্পর্কে বলেন, 'বর্তমান ট্রাস্টি নিযুক্ত হওয়ার পর আশা করেছিলাম পুরোহিত, কর্মচারীদের দুর্দশা মিটবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। কুশলবাবু যে আশা জাগিয়ে মন্দিরের অবক্ষয় ঘোচালেন, পরে তা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। বরং ব্যক্তি-মালিকানার মত শাসন চালাতে থাকেন। মূলত তাঁর জন্যই আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন জন্ম নেয়।'

–'এই শ্রমিক জাগরণের পরই ট্রাস্টির টনক নড়ে। বুঝতে পারেন চোখ রাঙিয়ে আর কিছু করা যাবে না। অচিন্ত্যবাবু অবশ্য আমাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। আমরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মন্দিরে কাজও খুব ভালো করছেন তিনি। কিন্তু এই ইউনিয়ন পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বললে তা ভুল হবে। মন্দিরের কর্মচারী, সেবকরা নিজেদের অভাব অভিযোগ মালিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই একত্রিত হয়েছে। এর মধ্যে সি পি এম আসে কেন? এসব ওপর মহলের সাজানো বুলি। নিজেদের প্রশাসনিক অপরাধগুলি ঢাকবার জন্য পরিচালকরা নিছক অপপ্রচার চালাচ্ছে। মন্দিরের ডেইলি হাজার হাজার টাকা ইনকাম। সেই সব টাকা যাচ্ছে কোথায়? অথচ কর্মচারীদের সামান্য টাকা বাড়ানোর সময় ট্রাস্টি ফাণ্ডে টাকা নেই! মায়ের ভোগটাই ভালোভাবে দেওয়া হয় না। যতসব দু' নম্বর চাল ডাল তরিতরকারি মন্দিরে আসে! এসব

দিকে আমরা লক্ষ্য দিতেই, চাকে ঘা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আদালতে মামলা দায়ের করে আমাদের একত্রিত হওয়াকে বানচাল করতে চাইছে ওরা। মন্দিরে রাজনীতি হচ্ছে বলে ঢোল পেটাচ্ছে।'

তবে কর্মচারিদের একাংশ যাই বলুক, কুশল চৌধুরীর আমলেই নিয়মিত মন্দির সংস্কার হয়। আগেকার বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত উৎসব ফের চালু হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন কক্ষগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে আইনমতই। আর কুশলবাবু বা অচিন্ত্যবাবু মন্দিরে ব্যক্তিস্বার্থ দেখছেন–এ অভিযোগ ইউনিয়নের নেতারাও করতে পারেননি। এঁদের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল।

সমস্যা শুধু আজকের নয়, সেকালের দক্ষিণেশ্বরেও কম বিপত্তি যায় নি। একদম প্রতিষ্ঠা লগ্নেই রাসমণি দেবীকেও পণ্ডিত সমাজের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। দেবতাকে অন্নভোগ দেবার অধিকার কোন শূদ্রানীর নেই বলে সেসময় প্রবল বিতর্ক হয়। সেই সংকট থেকে রানীকে উদ্ধার করেন ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য। তাঁরই নির্দেশে রানী দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি গুরুকে দান করেন। অনেক বাধা বিপত্তির পর পুরোহিত হলেন রামকুমার নিজেই। পরে তাঁর ভাই গদাধর। যিনি পরবর্তীকালে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ১৮৭৬ সালে রামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর বংশধরেরাই মা ভবতারিণীর পূজা করে আসছেন।

আজও সেই ধারা অপরিবর্তিত। বর্তমান রামকৃষ্ণদেবের বারোজন উত্তরপুরুষ ভবতারিণীর মন্দিরে পুরোহিত রূপে নিযুক্ত। এঁরা হলেন–পাঁচুগোপাল, নন্দগোপাল, মোহন, কমলাকান্ত, শ্যামল, গোপাল, সুবল, গৌতম, শশাংকশেখর, ধর্মদাস ও তারাদাস। ত্রিশ বছর আগে এক কালীপুজোয় কেবল একদিনই এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। ওইদিন মা ভবতারিণী মন্দিরের পুরোহিত গুরুদাস ও শিবমন্দিরের পুরোহিত নন্দগোপাল দু'জনে একসঙ্গে গঙ্গায় ডুবে মারা যান।

সেদিন রাত দশটা নাগাদ লোকজন নিয়ে গুরুদাস ও নন্দগোপাল গঙ্গার ঘাটে যান। গঙ্গার এক চোরা বান ভাসিয়ে নেয় গুরুদাস, নন্দলাল ও তার সাতজন সঙ্গীদের। মন্দির প্রাঙ্গণে তখন ঢাকঢোল। ভক্তদের চিৎকার। কেউ আর সেই বিপদাপন্নের আর্ত চিৎকার শুনতে পায় নি। ন'জন তলিয়ে যায় গঙ্গার বানে। পরে সকলকেই পাওয়া যায় ডুবুরি নামিয়ে, গুরুদাসের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আড়িয়াদহে বুড়ো শিবতলার ঘাটে।

এই দুর্ঘটনার ফলে মায়ের পূজা নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয়। গুরুদাসের মৃত্যুতে তার বংশে অশৌচ পড়ে যায়, পুজো করতে পারবেন না কেউ। নিরুপায় কর্তাব্যক্তিরা কেবল সেদিনই রাধাগোবিন্দজী মন্দিরের পুরোহিত দুর্গাদাসকে দিয়ে মা ভবতারিণীর পূজা করিয়েছিলেন।

প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে মা ভবতারিণীর মন্দিরে পৌঁছুতেই দেখা হলো পুরোহিত পাঁচুগোপালের ছেলে অভয়ঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পুজোর ব্যস্ততম মুহূর্তেও সময় করে নিলেন। বললেন, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জন্য আজ এই মন্দিরের নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লেও, তাঁর উত্তরপুরুষ হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি? চোখের সামনেই দেখছি বহু অন্যায়, মালিকপক্ষের চোখ রাঙানি। তবুও তো মায়ের জন্য এসব সহ্য করে পড়ে আছি। বাধা হয়েছি ইউনিয়ন গড়ার। আর এতেই ট্রাস্টির লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন আমাদের ওপর। তবে রামকৃষ্ণদেবের উত্তরপুরুষ হিসেবে আমিও নিজেকে মন্দিরের সেবায় বিলিয়ে দিতে চাই। চাই না

মন্দিরের পুরোহিত রেবতীরমন চক্রবর্তী

এই ইউনিয়ন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে উঠুক। তাতে মন্দিরের পরিবেশ বিষিয়ে উঠবে। সেই বিষাক্ত পরিবেশে কখনও দেবসেবা সম্ভব নয়।'

অভয়ঙ্করবাবুর সঙ্গে যোগ দিলেন রামকৃষ্ণ দেবের আরেক বংশধর ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অল্প বয়স। এই বয়সেই মন্দিরের পুজোয় এগিয়ে এসেছেন। বললেন, 'মন্দিরের ভেতর রাজনীতি কখনোই স্বীকার করা যায় না। আমি চাই না বিশ্বজুড়ে এই মন্দিরের যে সুনাম আছে তা রাজনীতির এঁদোপুকুরে নষ্ট হয়ে যাক।'

মন্দির এলাকার প্রধান তোরণ পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই সারি সারি ফুল-মিষ্টি, পুজোর উপকরণের দোকান। পুজো দিতে আসা ভক্তদের কাছে এই সব দোকানগুলি এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। দোকানগুলির মধ্যে সব সময়ই চলে দুরন্ত কম্পিটিশন। ফলে মহিলা-পুরুষ যাঁরাই পুজো দিতে আসুননা কেন প্রকাশ্যে হাত ধরে নিজের দোকানে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করতেও পিছপা হয় না এইসব দোকানের ছেলেরা।

অচিন্ত্যবাবু বলছিলেন, মন্দিরের চৌহদ্দিতে সমাজ-বিরোধীদের মদ, গাঁজা, চরসের আড্ডা চলে। ঠাকুরের নগদ-খানার ওপরেই এসব সমানে চলছে। অনেক বলে কয়েও বন্ধ করা যায় না। মাঝে মধ্যে নিরীহ ভক্তদের ওপরও চড়াও হয় তারা। এমন কয়েকজনকে পুলিস আটকও করেছে। তবে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার আপাতত কম। এ ব্যাপারে পুলিসের সহযোগিতা সত্যিই প্রশংসার। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, মন্দিরের মধ্যে সি পি এম এর রাজনৈতিক মুনাফা লোটার চেষ্টা।

অচিন্ত্যবাবুর মন্তব্য সমর্থন করে মন্দিরের কার্যকরী সম্পাদক কুশল চৌধুরী বলেন, 'বাকি আর থাকল কি? কয়েকদিন বাদেই দেখতে পাবেন মন্দিরের ভেতর লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। পোস্টার পড়েছে। ইনক্লাব-জিন্দাবাদ চলছে। মন্দিরের পরিবেশকে সেইদিকে নিয়ে যেতে চাই না বলেই তো আইনের শরণাপন্ন হয়েছি। আর এজন্যই ইউনিয়নের সদস্যারা এবং বিশেষ রাজনৈতিক দল নানারকম চাপ দিচ্ছে। সি পি এম নেতা লক্ষ্মীকান্ত চ্যাটার্জিও কর্মচারীদের বোনাসের জন্য এসেছিলেন। ভাবুন তো দেবসেবা করতে এসে বোনাস চাওয়া হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, মন্দিরের নিরীহ কর্মচারীদের মাথা ঘুরিয়ে সি পি এম দলীয় মুনাফা লোটার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা চাই মন্দিরের সুস্থ ধর্মীয় পরিবেশ। রামকৃষ্ণদেবের ঐশী শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। চাই রানী রাসমণির কীর্তিকে অমর করে রাখতে। সেজন্য মন্দিরের কর্মচারীরা যদি সাহায্যে না এগিয়ে এসে রাজনীতি করেন, তবে আমাদেরই বা মন্দিরের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার শক্তি কতটুকু?'

ইউনিয়নের এক সদস্য বাবলু চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মন্দিরের সকলেই তাকে সি পি এম–এর একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে জানলেও তিনি তা অস্বীকার করেন। বলেন, 'ইউনিয়নের কার্যপদ্ধতি কেমন হবে তার জন্য আমরা লক্ষ্মীকান্তবাবুর পরামর্শ নিই। তিনি ছাড়া আমাদের সাহায্য করার মত আর কে আছেন বলুন?'

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসে। দক্ষিণেশ্বরের ভেতর তখন আরেক মেলা। দৃশ্যপটের ঠাট ঠমকেও কিছুটা অদল বদল ঠেকে। গঙ্গার পাড়ে ঠেকানো নৌকাগুলিও বাতাসে হেলেদুলে ওঠে। ভিড় জমে গঙ্গার ধারে। সান বাঁধানো গোটা চত্বরেই তখন তরুণ-তরুণীরা ভিড় জমিয়েছে। বেলুড়ের শেষ নৌকাটিও ফিরেছে ঘাটে। আজতো জল ছুঁয়ে কেউবা ভেতরের পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে চায়। মায়ের অপার করুণা তাই আজও তাঁর মূর্তির মুখে, হাসি লীন হয়ে যায় নি। জানি না সেই দিন আসবে কি না!

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

দোষ

স্যুটিং চলছে 'রাজনর্তকী' ছবির। বিরাট ফ্লোর জুড়ে রাজবাড়ির সেট পড়েছে। ভিতরে নৃত্যদৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। শিল্পী সুধা চন্দ্রণ। স্বভাবতই উটকো দর্শকেরা আসছেন দলবেঁধে। লাগাম ছাড়া ভিড় হচ্ছে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, বিশেষ পরিচিত ছাড়া কেউ ফ্লোরে ঢুকতে পারবে না। গেটে বসলো পাহারা।

সেদিন দু'জন সাংবাদিক গিয়েছিলেন, ওই ছবির স্যুটিং দেখতে। তারা দুজন বেমালুম ঢুকে গেলেন ফ্লোরে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঢুকতে গিয়েছিলেন ময়লা পোশাক পরা এক যুবক। দারোয়ান দিলেন তাকে আটকে! যুবকটি খুবই অবাক হয়ে বললো, 'বেশ আমি তাহ'লে চলে যাচ্ছি।'

দারোয়ানটি অবাক চোখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বললো, 'খুব ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে একদম চিনতে পারি নি।'

ছবির নায়ক তাপস পাল একটু হেসে বললেন, 'আরে না, তোমার কোন দোষ নেই, যত দোষ এ ছবির মেকআপম্যানের!'

দুই নৌকোয়

জয় ব্যানার্জি সম্ভবত একমাত্র অভিনেতা যিনি একই সঙ্গে দুই শিবিরের দুই পরিচালকের ছবিতেই অভিনয় করছেন। শিবির দুটি হলো, সুখেন দাস ও অঞ্জন চৌধুরীর। এই দুই পরিচালকের মধ্যেকার রেষারেষির ব্যাপারটা সবাই জানেন। সাধারণত কোন শিল্পী একজনের ছবিতে কাজ করলে খুব প্রয়োজন বোধ না করলে অপরজন ডাকেন না। জয় প্রথমে সুখেনবাবুর 'জীবনমরণ,' 'মিলন তিথি' ইত্যাদি ছবিতে কাজ করেছেন। তখন কিন্তু অঞ্জনবাবু জয়ের দিকে ফিরে তাকান নি। যেই ওই দুটি ছবির কাজ শেষ হলো অমনি জয় সই করলেন, 'বিদ্রোহী' আর 'স্বর্গসুখ' ছবিতে। তারপর 'হীরক জয়ন্তী' তে একেবারে নায়ক। কিন্তু ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে জয় আবার ফিরলেন সুখেনবাবুর ছত্রছায়ায়। অভিনয় করলেন 'মা এক মন্দির'-এ। ওইসঙ্গে সব নিয়ম ভেঙে নাম লেখালেন অঞ্জনবাবুর নতুন ছবি 'সংঘর্ষ'-এ। এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া 'হীরক জয়ন্তী' তো আছেই।

অবশেষে নায়িকা

অবশেষে অনুপমা নায়িকা হলেন। শুধু নায়িকা হওয়া নয়, এ নিয়ে নিজের নামটাও পাল্টালেন অনুপমা। শোনা যায় অনেক ভেবে চিন্তে এমন কি সংখ্যাতত্ত্ব বিচার করে ওই নামটাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছে। অর্ধেন্দু চ্যাটার্জির নতুন ছবি 'ভ্রান্ত পথিক'-এর নায়িকা হয়েছেন অনুপমা। ওঁর বিপরীতে আছেন অনুপ জালোটা। ছবির কাজও এখন প্রায় শেষ হবার মুখে!

ওই ছবির নায়িকা হওয়ার আগে পর্যন্ত রোল পাওয়ার জন্য অনুপমা ও তাঁর মাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় নি। মা-মেয়ে দুজনেই ঘুরেছেন পরিচালক-প্রযোজকদের দরজায় দরজায়। কাজ জুটেছে দু'চারটে ছবিতে তবে কোনটাই নায়িকার নয়, তাদের বন্ধু বান্ধবের চরিত্রে। হাঁ, একটি ছবিতে নায়িকার চরিত্র জুটেছিল, তার দিন কয়েক কাজ করার পর পরিচালক ওকে নাকি বাদ দিয়ে দেন। সব মিলিয়ে মোটেই আশাব্যঞ্জক অতীত নয়। তবু কিভাবে যেন 'ভ্রান্ত পথিক'-এর নায়িকা চরিত্রটা জুটে গেল। এ ছবি অনুপমাকে নিয়ে আসতেই পারে পাদপ্রদীপের একেবারে সামনের সারিতে। চেষ্টায় কি না হয়?

আসল মদ

সাধারণত ছবির স্যুটিং-এর সময় মদের বদলে বোতলে কোনও ঠান্ডা পানীয় থাকে। যাতে চুমুক দিতে দিতে শিল্পী মাতালদের মতো আচার ব্যবহার করে থাকেন। এ ধারাবাহিকতাই এতদিন চলছিল বাংলা ছবিতে। হঠাৎ-ই সেদিন পরিচালক তপন সাহা তাঁর নতুন ছবি 'আলিঙ্গন'-এর স্যুটিং এর সময় ঠিক করলেন, না নকল নয়, আসল মদই রাখা হবে ছবিতে। যে কথা সেই কাজ। এলো সাতশো টাকা দামের বিরাট চেহারার এক শ্যাম্পেনের বোতল। আসল বোতল দেখে নিয়মিত মদ্যপায়ীদের চোখ চকচক করে উঠলো। স্যুটিং-এ ছবির ভিলেন সৌমিত্র ব্যানার্জি খুললেন বোতলটা। ছবি উঠলো চমৎকার! না, তপনবাবু উপস্থিত আগ্রহীদের নিরাশ করেন নি, অতিরিক্ত শ্যাম্পেনটুকু সবাইকে দিলেন সমানভাবে ভাগ করে।

শ্রীদেবীর নতুন ভূমিকা

১৯৮৫ সালের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি দরবার দুই অভিনেতা ও এক অভিনেত্রীকে ময়দানে নামিয়েছিলেন। এরা তিনজন হলেন অমিতাভ বচ্চন, বৈজয়ন্তীমালা ও সুনীল দত্ত। বিরোধীদের হাত থেকে ওরা আসন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

সম্প্রতি মাদ্রাজ ও এলাহাবাদের আসন নিয়ে সমস্যা দেখা দিলেও কেন্দ্র চোখ পড়েছে গ্ল্যামার জগতের দিকে। এবং তা থেকে ফায়দা তোলার জন্য তারা আবার উঠে পড়ে লেগেছেন। ইদানিং যে গ্ল্যামারাস বাংলোর দিকে নজর পড়েছে, সেই বাংলোর মালকিন হলেন শ্রীদেবী। এই বাড়ির মালকিনের লাখ টাকা ট্যাক্স বাকি পড়লেও নাকি আয়কর দপ্তর তেমন কিছুই করতে পারেননি।

হিন্দি ছাড়া মালয়ালম, তামিল, তেলেগু এবং কন্নড় ফিল্মের সিংহাসন দখল করার পর শ্রীদেবী এখন রাজনীতির আকাশে তারকা হতে চাইছেন। এই যোগ দেওয়ার ঘোষণার ব্যাপারটা বোধহয় শিগগিরই হয়ে যাবে। তবে সঙ্গী মিঠুনের কাছ থেকে গ্রীন সিগনালের অপেক্ষা করছেন তিনি। মিঠুনের রাজনৈতিক চরিত্র আবার বেশ রহস্যময়। বোম্বাই–এ চলচ্চিত্র ধর্মঘটের সময় তিনি রাজ বব্বরের মতই কংগ্রেসের বিরোধিতায় হাত বাড়িয়েছিলেন। তিনি কখনও শিবসেনার মত দক্ষিণপন্থী, কখনও বা মধ্যপন্থী (জনতা পার্টি) শোনা যায় এছাড়াও তিনি প্রাক্তন নকশালপন্থী, বর্তমানে বামপন্থী। যদি শ্রীদেবী কংগ্রেসে যোগ দেন তাহলে নাচ আর কার সঙ্গে নাচবেন বেচারা!

ঋষি কাপুরের নতুন হিরোইন

নতুন নায়িকাদের সঙ্গে অভিনয় করার দুই কীর্তিমান নায়ক দেব আনন্দ ও শাম্মী কাপুরকে টেক্কা দিয়েছেন ভাইপো ঋষি কাপুর। বিনীতা গোয়েল নামে একেবারেই এক আনকোরা নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছেন ঋষি 'জনম জনম' ছবিতে। এ ব্যাপারে ঋষিকে কিন্তু 'লাকি'ই বলতে হবে। কারণ তার সাথে যেসব নতুন নায়িকা, যেমন ডিম্পল, সোনম অভিনয় করেছেন সেইসব ছবিই বাজারে সুপারহিট হয়েছে। বাবা দেবেন্দ্র গোয়েল প্রচুর হিট ছবি বানিয়েছেন।

বিনীতা অবশ্য একটু অন্য ধরনের মেয়ে। যেসব প্রযোজকের মেয়েরা বাবা মামার সোর্স ব্যবহার করে ছবিতে অভিনয় করে থাকে, সে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যখন ফিল্মের ব্যাপারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল, তখন তাকে ঘিরে রচিত হয় অনেক অনুরোধ, উপরোধ। সোনায় সোহাগা হল ওর নির্দেশক মামা ব্রীজ ওকে দিয়ে হিরোর সঙ্গে রোমান্স এবং ভিলেনের সঙ্গে বলাৎকারের দৃশ্য চিত্রায়িত করছেন।

'বাবুমশাই'ও 'শাহেনশাহ'

গরীবের অমিতাভ যেভাবে ভূষিত মিঠুন চক্রবর্তী আজকাল বড়ই দামী হয়ে উঠেছেন। নিজের ব্যস্ততার জন্য যখন বিনোদ একটার পর একটা ছবি ছাড়তে শুরু করেছেন, তখন মিঠুনের দিকে পাল্লা ঝুঁকতে শুরু করেছে। বিনোদের এই উদাসীনতার দরুন অমিতাভ এখন সপ্তায় একটা করে ছবিতে কাজ শুরু করছেন। আর প্রতিটি ছবিতে অমিতাভের সেকেন্ড লীড নিচ্ছেন মিঠুন, আগে বিনোদ আর শশিকাপুর যে রোলগুলো নিতেন।

বর্তমানে মিঠুন অমিতাভের সঙ্গে বিনোদের ছেড়ে দেওয়া 'জাদুগর', 'সাধুসন্ত', 'অগ্নিপথ', 'অজুবা' প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় এক ডজন ছবিতে অভিনয় করছেন। অমিতাভও তাঁর পুরনো হিরোইন মাধবীকে ফিরিয়ে আনার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছেন। 'অন্ধা কানুন'এ মাধবী ছোট রোলে অভিনয় করেছিলেন। এরপর তিনি জোর করেই মাধবীকে 'অগ্নিপথ'এ নামান। রাখিকাকেও একটা নতুন ছবিতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ওই ছবিটির নাম 'সচ'। এখন বাকি শুধু রেখা। তাঁকে পার করার জন্যও নাকি সেলিম খানকে কিছু ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লেখাচ্ছেন, অমিতাভ।

সঞ্জয় দত্তের নতুন নেশা

আউটডোর শুটিং এর লোকেশানে শুটিং করার জন্য পুরো ইউনিটকে ডেকে আনার পর তাদের সামনে একান্তের আফেয়ারে জড়িয়ে পড়ার যে বদনাম রাজকুমার, ধর্মেন্দ্র, রেখার ছিল, সঞ্জয় দত্তও সেই দলে নাম লেখালেন। সঞ্জয় এখন বোধহয় নিশ্চিত হয়ে গেছেন, তাকে ছাড়া স্টারডম অচল।

মার্চ মাসে সঞ্জয় শুটিং–এর এক সিডিউলের দিনে তিন ফিল্ম পরিচালককে রীতিমত নাকানি চোবানি খাইয়েছিলেন। ফলে ওই পরিচালকদের অন্য শিল্পীদের নিয়ে শুটিং স্থলে পৌঁছতে হয়। আর সারাদিন দৌড়ঝাঁপ, হাঁকাহাকি চলে। তাঁরা জানতে পারলেন যে সঞ্জয় তার নতুন 'ড্রাগস'–এর সঙ্গে 'টপ সিক্রেট মিটিং' করছেন। দুর্দিনের বন্ধু পাপ্পু শর্মা ও অশোক গায়কোয়াড়কেও তিনি কম নাকানি চোবানি খাওয়াননি। পাপ্পু শর্মার 'ক্রোধ' ছবির আউটডোর শুটিং–এ সঞ্জয় সারাদিনেও পৌঁছননি। ফলে গোটা দিন ইউনিটের লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় কাটান, কখন তিনি ফিরে আসবেন। এরপর ইউনিটকে শুকনো মুখেই চলে যেতে হলো।

কিন্তু আসল কথাটা কি? সেটা হলো সঞ্জয়ের নতুন 'ড্রাগ' কী? শুনলে অবাক হবেন না তো? ওই নতুন ড্রাগ হলো ফারহা! এই সেই ফারহা যে নাকি কড়া কথা শুনলে কারাটে চালিয়ে দেয়। এখন কিন্তু তার মধ্যে সেরকম কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আশ্রয়

রাত কেটে গেছে। আকাশে রুপোলি চাঁদ। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমি উঠে বসলাম। আল্লা সত্যিই মহান, সবার বড়। আল্লাই আমাকে এত ঐশ্বর্য দিয়েছেন।

একটু আগেই বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু মৃদুমৃদু বাতাসে গাছগুলোর পাতা কাঁপছে তিরতির করে। গোলাপের চারাগুলো বৃষ্টিতে ভিজে বেশ তরতাজা দেখাচ্ছে। চারদিকে বৃষ্টিভেজা তাজাতাজা ভাব। কিন্তু শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা দিনে কি এমন ঘটল যার ফলে চারদিক কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে? মনে হচ্ছে কারো তৃষিত হৃদয় কাউকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে চলেছে।

ফুলের ঝাড় এবং বড় বড় গাছ ঘেরা এই

শামসমহলকে আজ বড় চুপচাপ আর নিস্তব্ধ দেখাচ্ছে। সারা মহল যেন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। আয়েশা, মোয়াজ, আব্বা মিঞা, আম্মা এবং আমার আদরের স্বামী মসউদ আজ আর এখানে নেই। মসউদ, যার নাম শুনলে আমি আমার জীবন ও যৌবন পলকে আহুতি দিতে পারি, সে কি আজ আকাশের তারা হয়ে গিয়েছে?

বৃষ্টি থামতেই মরজান পালংকটা লনে এনে রাখল। এখন তো এই মরজান আমার জীবন ও মৃত্যুর সাথী। বাবা কাজের মেয়েটিকে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। মরজান ছিল বিধবা।

আমি সাদা ফুটফুটে বিছানাতে গা এলিয়ে দিলাম। রুপোর থালাতে যে রকম সাদা সাদা চাঁদের কিরণ চলকে পড়ে, তেমনই দেখাচ্ছে চাঁদ। তুলোর গোলারা ভিজে বাতাসে উড়ে উড়ে কানামাছি খেলা শুরু করেছে। এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চাঁদিনী রাতেও আমার মনে হঠাৎ ওই মৃদু বাতাস আগুন জ্বালিয়ে দিল। আমি আরেকটু কাত হয়ে শুলাম। চিৎ হয়ে শুয়েও রক্ষা নেই। চাঁদের আলো চোখে এসে পড়ল। ওই আলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে পড়লাম আরেক বিপদে। মনের আগুনে আমি ভিতরে ভিতরে জ্বলছি। সেইসব দিনের কথা ভাবলেই মনের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে।

…আমি বউ হয়েছি। আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা চৌকির ওপর বসিয়ে দিয়েছে। ঘরে বাইরে অতিথি অভ্যাগতদের আনাগোনা। তাদের চিৎকার চেঁচামেচি। আমি প্রায় ঝুঁকে পড়ছিলাম। বউ-এর জন্য দুধ আনতে পাঠানো হয়েছে। আমাকে পুরো দুধ খাওয়ানো হলো। তারপর একটা বাচ্চাকে ডেকে এনে আমার লজ্জা ভাঙাবার চেষ্টা করল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।

'কে আছে বাচ্চা, এদিকে এসো।' আমার মাসতুতো শাশুড়ি ডেকে ওঠে।

'গোলাম হাজির'। একটি গলা শোনা যায়। আমার ছোট্ট দেওর মওয়াজ সাড়া দেয়।

'হাঁা, হাঁা মিঞা, তুমিও এসো' মাসী বলল। মওয়াজকে ছোট্ট বলেই মনে করেন তিনি। মওয়াজ আমার সামনে এসে বসল। ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে মওয়াজ মোটেই বাচ্চা ছেলে নয়। আমি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। চোখ বুজে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলাম।

'বৌদি, চোখ খুলে আমার দিকে তাকান। দেখুন আমি কি রকম সুন্দর একটা বাচ্চা ছেলে।'

মওয়াজের কথা শুনে সকলে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে।

আমি চোখ খুলিনি। মওয়াজ চিৎকার করে বলে উঠল, 'বৌদি দ্যাখো আমার বাপ লুঠ হয়ে গেল। তুমি চোখ খুলে কেন দেখছ না?' উপস্থিত সকলেই আমাকে ছেড়ে ওকে দেখতে থাকে। সবাই বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসেছে। সত্যি, মওয়াজ কি এতই সুন্দর? এরপরই আমি চোখের

পাতা খুলে মওয়াজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মওয়াজ বেশ দুষ্টুদুষ্টু মুখে জানাল, 'আমার হাত সাগর ছুঁতে চলেছে।'

পূবদিক থেকে আসা এক টুকরো মেঘ চাঁদ ঢেকে দেবার উপক্রম করেছে। তারপর মেঘ এসে চাঁদ ঢেকে দেবার পর মনে হলো কারো আসন পাতা হয়েছে আকাশে। ওই মেঘের মধ্যে আমি মসউদকে দেখতে পেলাম। মসউদ···ওই গাছের নিচে বসে দুজনে কত সময় কাটিয়েছি। জীবন কত সুখময় ছিল তখন। আজ ওর স্মৃতিই আমার জীবন।

দুই ভাই-এর মেজাজেও কত ফারাক। মসউদ ঠাণ্ডা আর নরম প্রকৃতির। কখনোই রাগ করত না। খুবই কোমল হৃদয় এবং আমাকে ভালোও বাসত খুব। কিন্তু মওয়াজ তুলনায় চঞ্চল আর বদমাইস। সেইসঙ্গে হঠাৎ রেগে যায়। অব্বা মিঞা মওয়াজকে খুব পছন্দ করতেন। মসউদকে মাঝে মাঝেই বলতেন, 'মওয়াজ তো মোমের পুতুল।' এবং মওয়াজকে কাছে নিয়ে বলতে শোনা যেত, 'এই-ই হলো আমার আসল ছেলে। ওই আমার কথা ভাবে।' ঘটনাটি সত্য ছিল।

প্রথম সাক্ষাতে মসউদ এই ব্যাপারটা আমাকে জানিয়েছিল।

মওয়াজ ওর খুব আদরের ভাই। মসউদ সব থেকে বড়। মওয়াজের থেকে আয়েশা তিন বছরের ছোট। আয়েশাকে সবাই খুব ভালোবেসে 'আশি' বলে ডাকত। বিয়ের দ্বিতীয় সকালেও ভিড় কাটে নি। আত্মীয়স্বজনেরা ঘর ছেড়ে যায় নি। ঘরদোর ঠাসা। ক্যামেরা কাঁধে ধরে ঘরে এল মওয়াজ। আশি আগে থেকেই ঘরে ছিল। মসউদ এখনও বাথরুমে। মওয়াজকে দেখে আমি মাথা নুইয়ে নিলাম। ও নমস্কার করে আমার কাছাকাছি এল।

আশি বলল, 'ব্যাপার কি ভাই, এত সাত সক্কালে কি মনে করে?'

দরজা বন্ধ করে ও বলল, 'বউ দেখতে এলাম।'

—'খালি হাতে কেউ কি বউ দেখতে আসে?' আশি হাত নাচিয়ে বলে উঠল, 'পকেটে কিছু আছে?'

—'তার মানে?' মওয়াজ কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

—'ক্যাবলা! বউ দেখতে এসেছ। শুধু হাতে মুখ দেখে কি হবে? টাকা পয়সা কিংবা আংটি বা অন্য কিছু তো দিতে হয়।' আশির রকম সকম দেখে আমার খুব হাসি পেয়ে গেল।

—'বাহ্! আমাকে কি কেউ কিছু দিয়েছে যে আমি দিতে যাব?' মওয়াজের গলাতে আপত্তির সুর।

—'তুমি কবে বউ হলে?' আশি শুধোয়।

—'বাহ্! গোটা দুনিয়া জানে। কালই আমি বৌদির মুখ দেখেছি। বউদিকে জিজ্ঞেস করো, আমি কি দিয়েছি।' মওয়াজ প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলে।

এই সময় আম্মাজান এসে মওয়াজের মুখোমুখি হয়ে জোর এক ধমক লাগাল, 'তোকে কতবার বলেছি না বউমাকে ভাবীজান বলে ডাকবি।'

'জান তো দাদার হবে। ও তো আমার শুধু বৌদি।'

আমি আর আশি প্রায় হেসেই ফেললাম। আম্মা ওর পিঠে এক থাপ্পড় কষিয়ে চলে গেলেন।

একের পর এক স্মৃতি মনে পড়তেই আমার চোখ ভিজে আসতে লাগল।

আমার শ্বশুরের বড় কারবার ছিল। ক্ষেতও ছিল। মসউদ এম-কম· করেই কারবারে যোগ দেয়। শহরের কাছেই একটা নদীর ধারে এই 'শামসমহল' নামে বাংলো। এই সেই শামসমহল, যেখানে আমি কোনরকমে ব্যাকুল হয়ে দিন গুজরান করছি। এখানেই আমি নিজের কবরে জীবিত হিসেবে শায়িত।

মসউদের অফিস ছিল শহরে। প্রায়ই ফিরতে দেরি হতো। তবে এ ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। তাছাড়া আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগই বা থাকবে কেন! একদিন মসউদের দেরি দেখে মওয়াজ বেশ ঝামেলা করে বসল। ওইদিন আমার শরীর খুব খারাপ ছিল। মওয়াজ সারাদিন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ কিনে আনা ···মওয়াজকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মসউদ বার দুই অফিস থেকে ফোন করে আমার খবর নিয়েছিল। তবে একবারের জন্যও ও আসে নি। মসউদ আসতেই মওয়াজ চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভাই, বউদির শরীর এত খারাপ–তুমি জেনেশুনেই দেরি করে এলে?'

'মিঞা! তুমি তো রয়েছ।' মসউদ আদর করে ভাই-এর কাঁধে হাত রাখে।

'ভাই! তুমি থাকলে বউদি যে উপশম পেত, আমি থাকলে কি তা সম্ভব?' বলেই রাগে গরগর করতে করতে মওয়াজ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি ভাবলাম আমার দেখভালের জন্য সারাদিনের ধকলে মওয়াজ খুব বিরক্ত হয়েছে, তাই অত রাগের কথা বলল। আমি মনে মনে বেশ লজ্জাই পেলাম। পরে আশির কথাতে বুঝতে পারলাম মওয়াজ আসলে মসউদের উদাসীনতায় রেগে গিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী সুখ দুঃখের সাথী। এরকম ছোটখাটো ব্যাপার ভবিষ্যতে দুজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে বলে পরে আম্মা সাবধান করে দিলেন।

শামসমহলের পিছনে নদী বয়ে চলেছে-আর তার কিনারেই একটা বড় লন আছে। সেখানে মার্বেল পাথরের বেঞ্চি। ওর পাশেই অ্যাকোরিয়ামে রঙ বেরঙের মাছ কানামাছি খেলছে। জলের মধ্যে মাছের খেলা আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতাম। মওয়াজ আর আশি জলে পাথর ছুঁড়ে মারবে। লনের চারকোণে ও মাঝখানে ছোট ছোট আলো লাগানোয় গোটা লন ঝকঝক করছে। রাতের বেলাতে আলোয় নদীর বুক ঝিলমিল করছে। আম্মা বেলফুল পছন্দ করেন। তা দিয়ে গয়না বানাতেন তিনি। আব্বা নানা জায়গায় বেলফুলের চারা বসিয়েছিলেন। লনের চারপাশে গাছের সারি। এখানেই আমরা খেলতাম, ঘুরতাম। গরমে এই বেঞ্চিতে বসে আম খেতাম। ক্যারাম পেটানো চলত। দোলনাতে দুলতাম আমরা। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জলে নেমে একজন আরেকজনের পিছনে ছুটতাম। জল ছেটাতে ছেটাতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতাম আমরা। আম্মা খুব বকাবকি শুরু করে দিতেন।

এ রকমই এক সন্ধ্যেবেলায় আমি ক্যারাম খেলছিলাম। সেদিন ছিল মসউদের ছুটি। ঘাসে প্রচুর মশার ওড়াওড়ি। একটা মশা এসে আমাকে কামড়ে দিল। আমি মসউদকে বললাম, 'এই মশাটা কি জোরে কামড়াল!'

'বড় সাহস আছে মশাটার।' মওয়াজ কথার মাঝখানে হঠাৎ করে বলে উঠল। মওয়াজ আব্বার আব্বার মত গম্ভীর গলাতে বলতে লাগল, 'বেল্লিক! বেয়াদব। বদমাশ কোথাকার। হাতের কাছে আয়, পিষে দেব।' সে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ওভাবে অমৃত খেলেও আমার হাত থেকে নিস্তার নেই।'

আমি রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়লাম। কিছু জবাব দিতে দ্বিধা হচ্ছিল। দেওর-বৌদির মধ্যে এরকম ঠাট্টা রীতিমত লজ্জার।

জীবনের কানায় কানায় খুশি ছিল পরিপূর্ণ। রঙ্গে রঙ্গে বর্ণময়। আমি, আশি আর মওয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের যাবতীয় ইচ্ছা চেপে রাখতাম। মসউদ সকালে বেরিয়ে যেত আর সারা সময় ওদের বায়নাক্কা পালতে হতো। ওদের সঙ্গে আমার বৌদি আর বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে মওয়াজকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আশি কলেজ থেকে এসে মায়ের সঙ্গে কাজে লেগে যেত। কুটনো কোটা, জল তোলা এইসব কাজ। মওয়াজ নিজের ঘরে কখন যে ঢুকতো, তাও জানি না। বারবার মনে হতো মওয়াজ কি আমার ওপর রাগ করে আছে?

একবার মনে হলো ওর ঘরে একবার যাই–কিন্তু যাওয়া হয়নি। কারণ মওয়াজ-এর ঘরে ঢোকার সুযোগ পেতাম না। অনেক রাত পর্যন্ত মওয়াজের ঘরে আলো জ্বলতো। এত রাতে ও কি করে? তবে কি মওয়াজ রাত জাগছে!

পরে বুঝতে পারলাম মওয়াজ বি·এ· পরীক্ষা দিচ্ছে। সারা বছর ফাঁকি দেবার মাসুল হিসেবে সে রাত জেগে পড়ছে। আব্বাজানও তাকে বকাঝকা দিয়েছেন। পরীক্ষা শেষ হবার পর মওয়াজ আবার আগের মতো হয়ে গেল।

হায়! স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতে আমি কোথায় এসে পৌঁছেছি। সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি আসার পর মরজান পালংকটা বারান্দাতে নিয়ে এল। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল এইখানেই মসউদের লাশ পড়েছিল। মসউদের সঙ্গে আড়াই বছর ঘর করার পর আমি বিধবা হয়ে যাই।

মসউদের মৃত্যুর সাথে আমার জীবনের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। শামসমহলের সর্বত্রই বিরাজ করতে থাকে নীরবতা। ওর ওই চঞ্চলতা আর ছটফটানিও যেন কোথাও হারিয়ে গেছে। মসউদ মারা যাবার পর কেন জানি না আমি সবার চোখে কাঁটা হয়ে গেলাম। সবাই কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠল আমার ওপর। আম্মাও অকারণে দুর্ব্যবহার করত। একদিন তার বকাবকিতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আমি ৪৮ ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। সবাই আমাকে নিয়ে পড়ল। মওয়াজ এমনভাবে পরিচর্যা করতে লাগল মনে হল সে খুব আঘাত পেয়েছে।

মসউদের মৃত্যুর পর আট মাস কেটে গেছে। আমার মনে হতো গোটা ঘরে কেবলই এক মনোমালিন্যের ছায়া ঘোরাফেরা করছে। বুঝতে পারলাম না আমার কোন কথায় এই পরিস্থিতি হলো। শীঘ্রই আমার ওই আশংকা সত্যিতে পরিণত হলো। মওয়াজ আমাকে এড়িয়ে যায়। কোন কোন সপ্তাহে টিকি পর্যন্ত দেখা যেত না। আগে খুব দুঃখ হতো—তারপর গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি খুব ব্যথিত হয়ে পড়লাম।

কখনো কখনো আব্বা মিঞার গলা সপ্তমে চড়ে যেত। তাকে আগে কখনো রাগতে দেখিনি। সেদিনের বজ্রগম্ভীর আওয়াজে আমার হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। মনে হলো আমার বুঝি কোতল হবে। আব্বা একবার যা বলতেন ওটাই ফাইনাল ছিল। কথা কখনো ফিরিয়ে নিতেন না। তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়ানো যেত না।

মওয়াজের সঙ্গেও আমার সম্পর্কটা কি রকম হয়ে উঠল। তবে আশি জানাল যে মওয়াজের পরীক্ষা, তাই সে ব্যস্ত রয়েছে। এ কথা শুনে আমার মনের সংশয় কেটে গেল। আবার ভাবলাম, মওয়াজের মুখোমুখি হয়ে আমি ওর ভয় ভাঙিয়ে দেব। মওয়াজের চোখমুখের চেহারা কি রকম পর্যুদস্ত ও অস্বাভাবিক। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কেন সে এত অসন্তুষ্ট রয়েছে।

আমি এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সব কিরকম এক অমঙ্গলের আভাস। আমি মনে মনে বড় শংকিত হয়ে পড়লাম। এইরকম পরিস্থিতিতে আমি ঠিক করলাম ক'দিন মায়ের কাছে ঘুরে আসব নইলে মন ঠিক থাকবে না। সেই কথা আম্মাজানের কাছে বলতে গিয়েই ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলাম আম্মা আর মওয়াজের মধ্যে কথাবার্তা। এবং প্রসঙ্গটা আমাকে নিয়ে। পুরো বুঝতে পারলাম আব্বা চাইছেন মওয়াজের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। এ বিষয়ে যথাসম্ভব মগজ ধোলাই হচ্ছিল মওয়াজের। সে এই প্রস্তাবে রাজী নয়। তার গলা কাঁপছিল এবং বারংবার মায়ের প্রস্তাবে না করছিল। আমি আর কিছু শুনতে পারছিলাম না। মাথা ঘুরতে লাগল।

ঘরে ফিরে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। মওয়াজকে নিয়ে আমি কখনো এসব ভাবিনি। আমাকে যদি মওয়াজের ব্যাপারে মত চাইত, আমি স্পষ্ট না করে দিতাম। মওয়াজকে আমি অন্য চোখে দেখি। কি ভাবে যে এ সম্পর্ক হবে, কে জানে! এসব কথা ভেবে আমি বারবার চোখের জল ফেলতে লাগলাম। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

বেশ রাত হয়ে গেছে। আকাশ আরও মেঘে ছেয়ে এসেছে। কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। কালো মেঘ দেখে আমার মন কেমন শিউরে উঠল। আমি যেন আব্বাজানকে দেখতে পেলাম——। আব্বাজান বলছে, 'বদমাশ, পাজি—চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। এরকম অবাধ্যদের জন্য এখানে কোন জায়গা নেই।'

আব্বাজানের চিৎকারে আমার বুক কেঁপে উঠল। ইচ্ছে হল তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করি। এসব কি হচ্ছে। এসব ঠিক নয়। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

আশি কাঁদতে কাঁদতে বলল, মওয়াজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

আমি বুঝতে পারলাম না কেন এইসব ঘটনা ঘটছে।

সেটা ছিল অক্টোবরের একটা রাত। বিষণ্ণ সেই সন্ধ্যায় আমার মন খুব খারাপ লাগছিল। ঘরে ফিরে ক্লান্তিভরে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর দরজায় হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুলে যাকে দেখলাম তাকে দেখে চমকে উঠলাম। এ কি মওয়াজ! 'শোনো!' দেখলাম ও একটা আকাশি রঙের কুর্তা পায়জামা পরেছে। চমৎকার চেহারা। গলাতে তাবিজ ঝুলছে। চুল পরিপাটি করে সাজানো। চোখে চোখ পড়তেই অনুভব করলাম—দুজনেই বিবশ হয়ে পড়েছি। সত্যি বলতে কি ওর সঙ্গে চোখে চোখ পড়তেই আমি মোহাবিষ্টের মত হয়ে পড়লাম। তারপরই নিজেকে বাঁচাতে মাথা নিচু করলাম।

মওয়াজ কপালে হাত ছুঁয়ে সেলাম করল।

'তুমি আমার ওপর রেগে নেই তো?'

আমি চোখ নিচু করে মাথা নাড়লাম।

'আব্বা, আম্মা আমার ওপর রেগে আছে। তুমি রেগে নেই তো?' বলতে বলতেই খাটের ওপর বসে পড়ল। আমি মুখে কিছু না বলে চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিলাম।

ও বলতে থাকে, 'তুমি হয়তো ভাবছো——' আর কিছু বলতে গিয়েও ও থেমে গেল।

আমি যে ভাবছি না—এটা বলা মিথ্যা হবে। আমি সত্যি ভাবছি যে আব্বাজান কেন এরকম করছেন। এসব আমি হৃদয় দিয়েই ভেবেছি।

'বৌদি, আমি অনেক চেষ্টা করেছি।' ও একটু থামল, তারপর বলতে শুরু করে, 'অনেকদিন ধরেই আমি যুদ্ধ করেছি। আমি বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। আমি বাবাকে কিভাবে বোঝাব, আম্মাকে কিভাবে বলব যে বৌদি মায়েরই সমান। মা কখনো কি বউ হতে পারে?' এরপর ও আমার পায়ে মাথা ছোঁয়াল।

এতদিন ধরে ওর মনে যে ঝড় গোপনে গোপনে বইছিল, সেই ঝড় থেকে মওয়াজ আজ যেন মুক্তি পেল। ওকে একেবারে বাচ্চার মত লাগল। ওকে দেখে আমি মমতা অনুভব করলাম। আমার মনে যে ভুল বোঝাবুঝির বিষবাষ্প ছিল তা মুহূর্তেই উবে গেল। আমি নিঃশব্দেই ঝুঁকে পড়ে মাথাতে চুম্বন করলাম এবং দুহাত মাথার ওপর রাখলাম। কেউ কোন কথা বলতে পারছিলাম না। আমার দু চোখ জলে ভরে এল। ফোটায় ফোটায় তা পড়তে লাগল ওর মাথাতে। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মওয়াজ। এরকমভাবে ওকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। ও উঠে চোখের জল মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি যদি চুপ থাকি তাহলে মওয়াজের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। এই ভেবে আমি আব্বাজানের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। আপশোসের বিষয়, তার সময় ও সুযোগ হল না। পরের দিন সকালে এল এক চরম মুহূর্ত। জানতে পারলাম, আব্বাজান—এর প্রিয়পুত্র আর দুনিয়াতে নেই। তাঁর জেদ বজায় রইল কি না, বুঝতে পারলাম না।

জেদি একগুঁয়ে আব্বার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে কোনদিন পড়ে নি। নীরব থাকলেও তার হৃদয় চুইয়ে যে জল ঝরছিল, তা বুঝতে পারলাম। বুকে বিঁধলেও মুখে তা প্রকাশ করছিলেন না। কেবল অনুভব করে অস্থির হয়ে উঠছিলেন।

আশির বিয়ের পর গোটা মহল আমার হয়ে গেল। আম্মা ওর জন্য কিছুই বানান নি। কিছুই তৈরি করেন নি। মাসী ওকে বললেন, 'বউমা, তুমি কষ্ট পেও না। আমরা তোমার পর নই।' কিন্তু আশির কষ্ট কে বুঝবে। আমি তাকে আমার সমস্ত কিছু দিয়ে বললাম, 'তুমি আমার সব কিছু নিয়ে যাও। কিন্তু আমার ভাগ্যটা নিও না। ও বড় কষ্টের জিনিস।'

আজ আশি তার ডাক্তার স্বামীকে নিয়ে সাত সমুদ্রের ওপারে সুখী দম্পতি হিসেবে এক বাচ্চার মা হিসেবে সুখে দিন কাটাচ্ছে। ও লিখেছে, 'বৌদি, অনেক দুঃখ সয়েছো। এসো, এখানে এসে আমার সুখের ভাগ নাও।'

আমি তাকে জানিয়েছি আমার ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। চারটি আত্মা এ মহলে বেড়াচ্ছে। আব্বা মিঞা চান আমি যেন এসব ছেড়ে চলে না যাই। আমি এসব ছেড়ে গেলে মসউদ, আব্বা, মওয়াজ, আম্মার আত্মারা কষ্ট পাবেন। আমার অস্তিত্ব ওদেরকে খুশি করে, তাই আমি এই বন্ধন ছেড়ে যেতে পারি না। আমি এমনই এক আশ্রয় গড়েছি যেখানে আমি ছাড়া আর কেউই নেই। ভাগ্যের পরিহাস!

রাত কেটে গেছে। চাঁদের গায়ে মেঘের আনাগোনা। দূরের মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমি উঠে বসলাম। আল্লাহ সত্যিই করুণাময়, সত্যি বড় মনের মালিক। করুণাময় ঈশ্বরই আমাকে অগাধ সম্পত্তির মালিক করে দিয়েছেন, যে জমিতে ওরা শায়িত, আর আমি তার ওপরে জীবিত রয়ে গেছি।
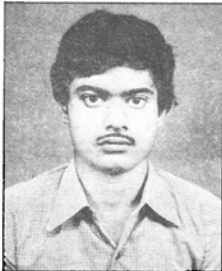
ডাঃ অমিতাভ বসু

চাঁদিপুরে মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের রহস্যময় মৃত্যু !

ওড়িশার চাঁদিপুরে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডা: অমিতাভ বসুর রহস্যজনক জলডুবি মৃত্যুর ৮ মাস পরে খড়দহনিবাসী ডা: অজয় বসু অমিতাভের ছয় ডাক্তার-বন্ধু এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। কেন অজয়বাবু আদৌ অমিতাভের মৃত্যুকাহিনী বিশ্বাস করেন না? ডা: অজয় বসু রাজ্য প্রশাসনের উপরমহলকে সন্দেহের চোখে দেখছেন কেন? ডা: অমিতাভ মৃত্যুরহস্যের নেপথ্যে তার পিতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কার কালো হাত দেখতে পাচ্ছেন? গুরুপ্রসাদ মহান্তির সরজমিন রিপোর্ট।

ডাক্তারেরা :চাঁদিপুর সমুদ্রতটে

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭। ঘড়িতে তখন প্রায় সন্ধ্যে ৬টা বাজে। চাঁদিপুরের আনন্দময়ী হোটেলের সামনে সজোরে ব্রেক কষল একটি প্রাইভেট কার। গাড়ি থেকে ত্বরিতে নামলেন খড়দহের প্রভাবশালী চিকিৎসক ডঃ অজয় বসু, তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী বসু এবং অন্য দুজন। তীব্র উদ্বিগ্ন মুখে ছুটে এলেন হোটেল ম্যানেজারের কাছে। অজয়বাবুকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল তাঁর ছেলের সহকর্মী ও বন্ধু ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য এবং শুভাশিস ব্যানার্জি। ওদের সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর আরও চারজন বন্ধু। জানালো—আপনাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ লজে থাকার ব্যবস্থা করা আছে।

বিন্দুমাত্র তর সইছিল না অজয়বাবুর। কোথায় তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে না হয়েছে সেটা বড় ব্যাপার নয় এই মুহূর্তে। উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—অমিতাভর খবর কি? ও কেমন আছে?

ইন্দ্রনীল ও শুভাশিস দুজনেই মাথা নিচু করে থাকে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ কাটে। তারপর দুজনেই মাথা দোলায়—ভাবটা এমনি যে ও আর নেই। হঠাৎই যেন বজ্রাঘাত হল অজয়বাবুর মাথায়। এ কি শুনছেন তিনি? একমাত্র ছেলে অমিতাভ মারা গেছে! ছেলের মৃত্যুসংবাদে গায়ত্রী দেবী সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেলেন। অজয়-বাবু চোখের সামনে অন্ধকার দেখছেন। অথচ অবাক কাণ্ড ইন্দ্রনীল ও শুভাশিস নির্বিকার। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী মারা গেছে অথচ তাদের মধ্যে শোকের লেশমাত্র নেই। ইন্দ্রনীল বলে—সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটার পর আমরা ওকে হসপিটাল নিয়ে যাই। সেখানে ডাক্তাররা অমিতাভকে ভালো করে চেকআপ করেন। ইন্টার মাসক্যালারি ইনজেকশনও দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত অমিতাভকে তাঁরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অজয়বাবু আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে যন্ত্রণায় বিবশ হয়ে যাচ্ছিল সারা শরীর। অমিতাভের মা ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে যখন বালেশ্বর পুলিশ স্টেশনে আনা হল সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

থানায় পৌঁছে অজয়বাবু দেখলেন পাজিখিন

৮৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

সিপিআই-সিপিএম লড়াই নারায়ণ চৌবের পরিবার আক্রমণের নেপথ্যপট

সংসদ সদস্য নারায়ণ চৌবে, পুর চেয়ারম্যান এম রহমান সহ সি পি আই এর রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ের নেতাদের রাজনৈতিক জমিনতো বটেই-বাড়িঘর, পরিবার পরিজনও সি পি এম হামলার শিকার হচ্ছে। নারায়ণ চৌবে কি স্ত্রীকে কংগ্রেসে পাঠিয়ে প্রেসার পলিটিক্স চালু করলেন? চৌবে পুত্র কি সত্যিই সমাজ বিরোধী? চৌবে পরিবার আক্রমণের পিছনে সি পি আই রাজ্য নেতৃত্ব পুনর্গঠনের প্রশ্ন কিভাবে জড়িত? বামঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গ ও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে সি পি আই সি পি এম লড়াই-এর নেপথ্যপট বিশ্লেষণ করেছেন রমাপ্রসাদ ঘোষাল।

সি পি আই নেতা নারায়ণ চৌবে

২৯ মে ১৯৮৮। রবিবার সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরের শিক্ষক ভবনে ৮টি কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সি পি আই নেতা ও সংসদ সদস্য নারায়ণ চৌবের সহধর্মিণী শ্রীমতী গৌরী চৌবেকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সম্বর্ধনা জানান। সেখানে গৌরী দেবী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে 'মিথ্যেবাদী' আখ্যা দিয়ে-বলেন, 'সি পি এম-এর হাতে আমার ছেলেদের এবং স্বামীর জীবন বিপন্ন। ওরা বোমা পিস্তল নিয়ে আমার বাড়ি আক্রমণ করেছে, ঘরছাড়া করেছে ছেলে গৌতমকে, হত্যার হুমকি দিচ্ছে প্রকাশ্যে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার। তাই সি পি এম গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি।' মেদিনীপুর জেলা সি পি আই-এর স্তম্ভবিশেষ এবং এ আই টি ইউ সি-র শীর্ষনেতা নারায়ণ চৌবের স্ত্রীর এই কংগ্রেসে যোগদান একদিকে যেমন বামঐক্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছে তেমনি অন্যদিকে সি পি আই সি পি এম সম্পর্ক, সি পি আই-এর রাজ্য পর্যায়ের অন্তর্কলহ এবং সি পি এম-এর ফ্রন্ট মধ্যবর্তী দাদাগিরির মুখোশ খুলে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনসভাগুলিতে স্বয়ং নারায়ণ চৌবেও সি পি এম-এর হাতে জীবন বিপন্নের কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

নারায়ণ চৌবে কেন এবং কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন

অভিযোগ ২৭ এপ্রিল বুধবার খড়্গপুরের মালঞ্চ এলাকায় মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সি পি আই সদস্য নারায়ণ চৌবের বাড়িতে একদল সি পি এম সমর্থক হামলা চালায় ও বোমা ছোঁড়ে। একই সময়ে আরও একদল সি পি এম সমর্থক খুরদা রোডে সি পি আই অফিসে ব্যাপক হিংসাত্মক আক্রমণ চালায়। এর আগে

তরুণ নেতা গৌতম চৌবে
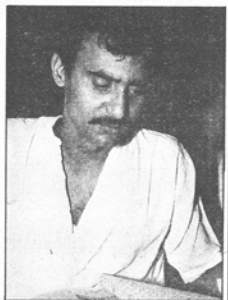
পুরো এপ্রিল মাস ধরেই খড়্গপুরের এলাকায় এলাকায় সি পি আই–সি পি এম-এর সংঘর্ষ চলছে। যার ফলে নারায়ণ চৌবের বড় ছেলে সি পি আই-এর স্থানীয় নেতা গৌতম চৌবে প্রাণের ভয়ে শহর ছাড়তে বাধ্য হন।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-এর যা কিছু জনসমর্থন আছে তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেই সত্তর শতাংশ। আর এই মেদিনীপুর জেলার সংগঠনকে ধরে রেখেছেন ওই নারায়ণ চৌবেই। শুধুমাত্র পারটি সংগঠনই নয় সাউথ ইস্টার্ন রেলের সি পি আই প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নেরও প্রাণপুরুষ ওই নারায়ণ চৌবে। মেদিনীপুর জেলার বামপন্থী শ্রমিক ফ্রন্টে তিনি উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। স্ত্রী গৌরী চৌবে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বামপন্থী কর্মচারি ইউনিয়নের সদস্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌতম সি পি আই-এর স্থানীয় নেতা এবং হোল টাইমার। ছোট ছেলে মানস চৌবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় এ আই এস এফ নেতৃত্বে ছাত্ররাজনীতি করেন। সারা ভারতে বাম ঐক্যের উদ্যোগ নিয়ে আগ্রহী সি পি এম যখন এ হেন সি পি আই নেতাকে আক্রমণ করে, তখন তার নেপথ্যপটটা হয়ে ওঠে বেশ জটিল।

নারায়ণ চৌবেকে খড়্গপুর তথা মেদিনীপুর

জেলায় দুর্বল করা ছাড়াও কিন্তু এই আক্রমণের পিছনে আরও বড় রাজনৈতিক কারণ আছে। সেই গোপন রহস্যটি উন্মোচন করতে গেলে সি পি আই রাজ্যসম্পাদক পদ থেকে বিশ্বনাথ মুখার্জির পদত্যাগও রাজ্য পরিষদ পুনর্গঠনের পটভূমিটির দিকে নজর রাখতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নেতাদের মধ্যে সি পি এম-এর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দুটি বিপরীতমুখি ধারা প্রবাহমান। নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, গুরুদাস দাশগুপ্ত ও স্বাধীন গুহরা চাইছেন সি পি এম-এর ফ্রন্ট রাজনীতিতে দাদাগিরি মেনে নিয়ে যে কোন প্রকারে ফ্রন্টে টিকে থেকে সরকারি ক্ষমতার ভোগদখল চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু নারায়ণ চৌবে, কমলাপতি রায় ও অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জির মত জঙ্গী শ্রমিক নেতারা সি পি এম-এর দাদাগিরি মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণের রাজনীতি করতে রাজী নন। তারা মনে করেন স্বাতন্ত্য বজায় না রেখে সি পি এম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলে মন্ত্রীত্বের ছিটেফোঁটা জুটলেও সংগঠন বজায় রাখা যাবে না। এভাবেই গত পাঁচ বছরের সি পি আই পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-এর আগ্রাসী সাংগঠনিক রাজনীতির কাছে একটু একটু করে পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে। স্বভাবতই পার্টির এই চরমপন্থী লাইনের নেতারা রাজ্য সম্পাদকের পদটি নিজেদের দখলে আনতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে তারা হয় নারায়ণ চৌবে নয় কমলাপতি রায়ের মত দৃঢ়চিত্তির নেতাকে চাইছেন। অন্যদিকে গুরুদাস দাশগুপ্ত বা স্বাধীন গুহর মত নরমপন্থী নেতারা চাইছেন মধ্যপন্থী নেতা নন্দগোপাল ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। রাজ্য সি পি এমও চায় এই নন্দগোপাল ভট্টাচার্য সম্পাদক হন। কোন অবস্থাতেই নারায়ণ চৌবে নয়।

সি পি আই এর ভেতরকার দলীয় রাজনীতিতে সি পি এম-এর মাথা ঘামানোর প্রশ্ন উঠলে সত্যি আশ্চর্যের বিষয় হয়ে পড়ে। তবু এ কথা খুবই সত্যি যে শরীক দলগুলির মধ্যেকার দলীয় রাজনীতি নিয়ে সি পি এম বেশ ভালভাবেই মাথা ঘামায়। প্রমাণ, বামফ্রন্টের দুই শরীক মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক এবং ডি এস পি-র রাজ্য কমিটি গড়া নিয়ে সি পি এম-এর ভূমিকা। মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জির মৃত্যুর পর দলে যখনই সংকট এল তখন ওই দলের সাধারণ সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী তারা দত্তকে মনোনয়ন দেওয়া হল না তারকেশ্বরের বিধানসভা আসনে। বরং সি পি এম পুরোপুরি অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী শান্তি চ্যাটার্জিকে ডেকে এনে মনোনয়ন দেওয়াল। শান্তি দেবী রামবাবুর স্ত্রী হলেও, রাজনীতি তিনি এর আগে কখনো করেন নি। অন্যদিকে ডি এস পি-র ক্ষমতা দখল নিয়ে সম্পাদক অরুণ মিত্রের সঙ্গে তদানীন্তন সংসদীয় নেতা স্বদেশ মাজির বিরোধ বাধে। ডি এস পি-র দলীয় এম এল এ-রা স্বদেশ মাজিকে সমর্থন জানালেও পরিবর্তিত কমিটিকে সি পি এম মানে না। এবং শেষ পর্যন্ত দলীয় বিবাদের গ্রাউন্ড তৈরি করে বামফ্রন্টের সিটিং এম এল এ-কে মনোনয়ন দেওয়ার নীতি লংঘন করে ফ্রন্টের মনোনয়ন সি পি এম দেয় না স্বদেশ মাজিকে। উল্টে এই সিটে নিজের দলের ক্যান্ডিডেট শিবরাম বসুকে মনোনয়ন দিয়ে দেয়। ডি এস পি-র তল্পিবাহক নেতৃত্ব তাকে সমর্থন করে। এভাবেই অন্য দলের সংগঠন নিয়ে সি পি এম মাথা ঘামায়। মাথা না ঘামালে হাত তোলা পার্টিগুলি তৈরি হবে কি করে?

বিশ্বনাথ মুখার্জি ছবি: বিকাশ চক্রবর্তি

কি করেই বা নির্বিবাদে চলবে আগ্রাসী নীতির সাফল্য।

সি পি আই এর ক্ষেত্রেও সি পি এম একই পলিসি নিয়েছে। নারায়ণ চৌবে যদি সি পি আই এর রাজ্য সম্পাদক হন, তখন সি পি আই কোন ভাবেই সি পি এম স্তাবকের ভূমিকা চালিয়ে যাবে না। বিশ্বনাথ মুখার্জির আমলের চলৎশক্তি রহিত সংগঠনের মত আপোষের লাইনে না চলে, নিজের শক্তি সংগঠিত করবেই। তাকে রুখতেই কি সি পি এম-এর এই নারায়ণ চৌবে বিরোধী কার্যক্রম? ইতিমধ্যেই পুলিশ নারায়ণ চৌবের বড় ছেলে গৌতম চৌবের বিরুদ্ধে গত দেড় বছরে মোট ১২টি এফ আই আর নিয়েছে। তার মধ্যে ৭টির চার্জসিটও তৈরি হয়ে গিয়েছে। গৌতম চৌবেকে সমাজ বিরোধী প্রতিপন্ন করতে আয়মা এলাকায় সি পি এম সমর্থক হরেন কোটালের হত্যাকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এবং নারায়ণ চৌবেকে পরিবার সহ আক্রমণের নেপথ্যপট যে শুধুমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ নেই তার প্রমাণ কলকাতার রবীন্দ্রভারতীতে পাঠরত ছোট ছেলে মানস চৌবেকেও নাকি খুন করা হবে মার্কা হুমকি দেওয়া হয়েছে!

খড়গপুরে সি পি এম-সি পি আই লড়াই-এর প্রেক্ষাপট

এপ্রিল মাসে নারায়ণ চৌবের বাড়ি ও সি পি আই অফিস আক্রমণ দিয়ে চলতি মরসুমের সি পি আই–সি পি এম লড়াই শুরু হলেও এর প্রেক্ষাপটটি রেলওয়ে ও খড়গপুরে শিল্পসংস্থাগুলির কর্মচারি সংগঠনগুলির ভিত্তিতে বেশ বিস্তৃত। ৩০ এপ্রিল আয়মা এলাকার সংঘর্ষ ও দল দুটির ভূমিকা পর্যালোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সি পি এম নেতা কালী নায়েক ও সি পি এম পুর কমিশনার অনীত মণ্ডলের থানায় লিখিত এজাহার মোতাবেক জানা যায়, '৩০ এপ্রিলের ঘটনা সি পি আই-এর পূর্বপরিকল্পিত'। কালীবাবুর কথামত, সি পি আই সমর্থক মাস্টারজী রামদেও জনৈক সি পি এম কর্মী রামানন্দকে চিঠি লিখে হুমকি দেয়। তারপর বোমা নিয়ে মোপেডে করে তাড়া করে তাকে। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তাড়ায় মোপেড ফেলে রেখে পালায়। অন্যদিকে এ ঘটনা সম্পর্কে নারায়ণ চৌবের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেন থানায় এই ঘটনা নিয়ে যিনি লিখিত এজাহার দিয়েছেন সেই অনীত মণ্ডলের বাড়ি নিমপুরা, ঘটনাস্থল আয়মায় নয়। তিন কিলোমিটার দূরে ঘটনার রাত্রে তিনি কি করছিলেন।

খড়গপুর পুলিশে এম পি নারায়ণ চৌবের বড় ছেলে সি পি আই-এর যুব সম্পাদক গৌতম চৌবের নামে ১২টি এফ আই আর লজ করেছে। সি পি এম নেতা যতীন মিত্র অভিযোগ করেছেন, 'দেড় বছর আগে গৌতম চৌবে বিদেশ থেকে ফেরার পর থেকেই খড়গপুরে সি পি এম–সি পি আই সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। কেননা, গৌতম তার রাজনৈতিক জমিন শক্ত করতে সমাজবিরোধীদের কাজে লাগাচ্ছে। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে নিজেও নিজেকে একজন রাজনৈতিক সমাজবিরোধী রূপে জনমানসে প্রতিপন্ন করে তুলেছে।'

যতীন মিত্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে খড়গপুর শহরের সি পি আই নেতা জ্যোতিলাল ব্যানার্জি বলেছেন, বিদেশ থেকে ফেরার পর গৌতম পার্টি সংগঠনে সব সময়ের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছে। ও আমাদের যুব সংগঠনের সম্পাদক হওয়ার পর, লেবার বেল্টে বহু সি পি এম সমর্থকরা আমাদের দলে এসেছে। তাইতেই গৌতমের উপর সি পি এম-র রাগ।

গৌতম চৌবের সম্পর্কে সি পি আই বা সি পি এম দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরের বক্তব্যের পাশাপাশি কংগ্রেস শিবিরের বক্তব্যটি তুলে ধরলে পাঠক নিজেই গৌতমের চরিত্রটি ঠিক ঠিক ভাবে সনাক্ত করতে পারবেন। খড়গপুরের বিধায়ক এবং মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সর্দার জ্ঞান সিং মোহন পালকে গৌতম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন–গৌতম কখনোই সমাজবিরোধী নয়। সে ভাল ছেলে। এবং নিজেকে একজন সদর্থক

রাজনৈতিক নেতা বলে প্রতিপন্ন করেছে। জ্ঞান সিং আয়মার লড়াইকে দুদল সমাজবিরোধীর লড়াই বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এটি আসলে হরেন-মুরলীর লড়াই। দুদল সমাজবিরোধীর লড়াইকে সি পি এম–সি পি আই নিজেদের রাজনৈতিক লড়াই বলে চালাতে চাইছে। আয়মায় ওইদিন বোমাবাজি হয় মুড়িমুড়কির মত, নিহত হয় দুজন। লুট হয় ৫টি পানবিড়ির গুমটি। কমপক্ষে ১২টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সারা শহর জুড়ে পুলিশকে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়। বামফ্রন্টের অন্তর্দলীয় কোন্দলের জন্য নিরীহ এলাকাবাসীকে কষ্টভোগ করতে হচ্ছে এটাই দুঃখের।'

নারায়ণ চৌবে গত দেড় বছর ধরে রেলওয়ে সম্পত্তি চুরি নিয়ে এবং এই রেলশহরে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে রেলমন্ত্রীকে নানান তথ্য দিতে থাকেন। তার উপর ভিত্তি করে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রেলপুলিশ তৎপর হতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলে ঘা পড়েছে যথেষ্ট। শুরু হয়েছে নারায়ণ-বিরোধী-চক্রান্ত। অন্যদিকে খড়্গপুর শহর ও লোকালের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে গৌতম চৌবে রাজনৈতিক রণাঙ্গন বানিয়ে আসরে নেমে পড়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় এম পি-র কারিসমার সাহায্যে তার সঙ্গে এসে জুটেছে একদল সমর্থক। পায়ের তলা থেকে মাটি ছাড়া হচ্ছে সি পি এম-এর। বাঁধছে হাতাহাতি লড়াই। গত ২৩ মে এ কারণেই অফিসের মধ্যে আক্রান্ত হন খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সি পি আই নেতা এম এ রহমান। এবং জেলা সি পি আই-এর মতে এই আক্রমণ পূর্বপরিকল্পিত ও সি পি এম সমর্থকদের একাংশের মদতে ঘটে। খড়্গপুরের সি পি আই-সি পি এম সংঘর্ষের জের এখন গোটা জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। ১৮ মে সদর মহকুমার গড়বেতা এলাকায় সি পি আই আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক তিনকড়ি খাঁড়া পার্টি মিটিং সেরে বাড়ি ফেরার পথে সি পি এম সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হন। ওই সপ্তাহের ওই এলাকার সি পি আই নেতা মানিক রুইদাস, শ্যামাপদ সরকার ও রণকিশোর মণ্ডল রাস্তার মধ্যে আক্রান্ত হন সি পি এম কর্মীদের কাছে। শুধু গড়বেতা নয়, মোহনপুর, দাঁতন ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার এই দুই শরীকের লড়াই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর পুলিশ এ ব্যাপারে খুব বেশি একটা উদ্যোগী নয়। সি পি আই-এর মতে পুলিশের ভূমিকা হল সি পি এম-এর নির্দেশমত কাজ করা। তাই সব ঘটনাতেই সি পি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বেশি।

পঞ্চায়েত ও পুরনির্বাচন নিয়েও সি পি আই–সি পি এম–এর কাজিয়া বিশাল।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম কম বেশি এক হাজার আসনে পাল্টা প্রার্থী দিয়েছিল বলে অন্তত ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি আই–এর হাতছাড়া হয়েছে। সি পি আই রাজ্য

'সি পি এম গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি' : গৌরী চৌবে

সম্পাদকমণ্ডলীর গত বৈঠকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমীক্ষায় এজন্য সি পি এম–এর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ঐ সমীক্ষায় সি পি আই বলেছে, বামফ্রন্টের পাঁচ দফা সূত্র অনুযায়ী প্রায় দুই হাজার পাঁচশ আসনে সি পি এম–এর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়। কিন্তু বর্ধমান ও হাওড়া ছাড়া প্রায় সব জেলায় সি পি এম তা মানে নি। এই নিয়ে নির্বাচনের আগে সি পি আই থেকে সি পি এম এর রাজ্য নেতৃত্বকে বলেও কিছু লাভ হয় নি।

সি পি এম কিভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনাকে সাবোতাজ করেছে তা ব্যাখ্যা করে সি পি আই বলেছে, সি পি আই–এর কম বেশি এক হাজার আসনে সি পি এম প্রধানত স্বাধীন প্রতীকে এবং কিছু আসনে দলীয় প্রতীকে পাল্টা প্রার্থী দেয়। 'তাদের স্থানীয় শাখা ও আঞ্চলিক কমিটি এই পাল্টা প্রার্থীদের জেতানোর জন্য এবং সম্ভব নাহলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য প্রকাশ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই পাল্টা প্রার্থী দেওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায় সেইসব ক্ষেত্রে যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের প্রাধান্য ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সেইসব পঞ্চায়েতে যাতে আমাদের সংখ্যাধিক্য না হয়। আমাদের পক্ষে এটা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে। প্রায় পনেরটা বা তার বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কংগ্রেসের দখলে যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না–কারণ এইসব স্থানে বামপন্থীদের ভোট কংগ্রেসের ভোটের চাইতে বেশি।' সি পি আই–এর অভিযোগ, ভোটের আগে সি পি আই–এর কাছে সি পি এম–র বিভিন্ন জেলার নেতারা এই বিষয়ে মৌখিক ভাবে এই গুরুতর অন্যায় স্বীকারও করেন। কিন্তু কাজের বেলায় তাঁরা সংশোধন কিছুই করেন নি। কিছু জেলার ক্ষেত্রে সি পি আই সুনিশ্চিত যে সি পি এম জেলা কমিটি এগুলির শুধু প্রশ্রয় দেন নি, মদতও দিয়েছেন। কারণ জেলা কমিটির অনুমোদন ছাড়া দলীয় প্রতীক পাওয়া সম্ভব নয়। বহু জায়গায় দলীয় প্রতীকেই সি পি এম পাল্টা প্রার্থী দিয়েছেন। স্বাধীন প্রতীকে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারাও বেশির ভাগই সেই সব অঞ্চলের সুপরিচিত সি পি এম কর্মী।

জ্যোতি বসুর ভূমিকা

রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু খড়্গপুরের ঘটনা নিয়ে এক বিবৃতি দেন। তাতে তিনি প্রকারান্তরে ঘটনার সমস্ত দোষই সি পি আই তথা গৌতম চৌবের ঘাড়ে চাপান। অবশ্য নারায়ণ চৌবে তাকে অসত্য ভাষণ আখ্যা দিয়ে বলেন, 'জ্যোতিবাবু বিধানসভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তা আসলে খড়্গপুরের সি পি এম নেতা অনীত মণ্ডলের বক্তব্য। অনীতবাবু আয়মায় সি পি এম সমাজবিরোধী হরেন কোটালের খুন সম্পর্কে থানায় যে এজাহার দিয়েছিলেন–জ্যোতি বসু হুবহু তাই বলেছেন। সি পি এম বামফ্রন্টের নীতি ভাঙছে, ভাঙছে বাম ঐক্যকে। ওরা নীতি মানে না। এভাবেই ওরা সর্বনাশের রাস্তা তৈরি করছেন।' –নারায়ণ চৌবে জ্যোতি বসু তথা সি পি এম সম্পর্কে এসব কথা বলেন ১৫ মে রবিবারে পুরনো মালঞ্চার প্রকাশ্য সমাবেশে।

এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তথা বামফ্রন্টের সর্বোচ্চ

নেতা জ্যোতি বসুকে ১৭ মে মেদিনীপুর জনসভার প্রাক্কালে সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ওসব নারায়ণ-ফারায়ণ নিয়ে কোন কথা হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জ্যোতি বসুর ওই সভায় নারায়ণ চৌবেও বক্তা হিসাবে ছিলেন। তখন সাংবাদিক তাকে মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে জিজ্ঞাসা করে, এখানে নারায়ণ চৌবের ঘটনা নিয়ে কোন কথা হয়েছে কি? তারই উত্তরে জ্যোতিবাবু নারায়ণ চৌবে সম্পর্কে এরকম অবমাননাকর মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের জের রাজ্যের কমিউনিস্ট মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নারায়ণ চৌবে দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট নেতা। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন পড়তেন তখন থেকে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে হাতেখড়ি। বাংলার বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় চরিত্র। এ হেন দুঁদে নেতাকে জ্যোতিবাবুর 'নারায়ণ ফারায়ন' মার্কা বক্তব্য রাজনৈতিক ভদ্রতার প্রশ্ন তুলেছে।

সর্বভারতীয় বাম ঐক্যে জ্যোতি বসু একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের আগ্রহ দেখিয়েছেন। শুধু বামই নয়, ত্রিপুরা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তথাকথিত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে বিরোধী ঐক্য গড়ার ব্যাপারে তিনি দারুণ উৎসাহ দেখিয়েছেন। তাই ভাতৃপ্রতিম সংগঠন সি পি আই সম্পর্কে তাঁর যে কোন প্রতিক্রিয়া অবশ্যই মূল্যবান।

জাতীয় স্তরে সি পি এম-সি পি আই সম্পর্ক

পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে সি পি এম ও সি পি আই–এর বিরোধের ঘটনাটি সি পি এম–র কেন্দ্রিয় কমিটির মুখপত্র পিপ্‌লস ডেমোক্রেসিতে ফলাও করে ছাপা হবার পর এখন যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো–পশ্চিমবঙ্গের বাম–ফ্রন্টের দুই প্রভাবশালী শরিকদল কি তবে মুখোমুখি সংঘর্ষে নামছে? পিপ্‌লস ডেমোক্রেসিতে সি পি আই–এর ভূমিকার যেভাবে নিন্দা করা হয়েছে তাতে অবশ্য এ কথা স্পষ্ট যে সি পি এম ও সি পি আই–এর বিরোধটি যদি চরম সীমায় পৌছয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যরাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সি পি আই–সি পি এম বিরোধটি জাতীয়স্তরেও সমান ভাবে লক্ষ্য করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামারাওয়ের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগগুলি যখন অন্ধ্রপ্রদেশের উচ্চতর আদালতে বিচারযোগ্য বলে বিবেচিত হল, তখন সি পি আই অন্ধ্রশাখা রামারাওয়ের পদত্যাগ দাবি করে। অথচ সি পি এম অন্যরকম নীতি নিয়েছিল। সে সময় সি পি আই শুধু রামারাও–এর পদত্যাগই দাবি করেনি, তাঁরা তেলেগু দেশমের প্রশাসনিক নীতিরও সমালোচনা করে। এমন কি তাঁরা একথা জনসমক্ষে প্রচারও করে যে অন্ধ্রে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি আছে।

এদিকে তেলেগু দেশম সম্পর্কে সি পি আই এর নীতি কেমন হবে সে সম্পর্কে দলে মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছে। দলের কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ শাখা দলের সাম্প্রতিক জাতীয় বৈঠকে এই মতও ব্যক্ত করে–তেলেগু দেশমের সঙ্গে যদি সি পি আই রাজনৈতিক বিরোধিতার পথ বেছে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে কংগ্রেসকেই সাহায্য করা হবে। এতে বাম ঐক্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অন্যপক্ষে সি পি আই এর অন্ধ্র ও পাঞ্জাব শাখা এই বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করে। দলের কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রতি বিষোদ্‌গার করে মন্তব্য করে–বামফ্রন্টের সি পি এম অনুগত নীতির ফলে দলের মধ্যে নাভিশ্বাস উঠেছে। সি পি এম–এর প্রতি তাদের দল যদি অতিমাত্রায় আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে সি পি আই দলটি হয়তো বা রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তেলেগু দেশমের 'মহানাডু' উপলক্ষে আয়োজিত বিরোধী ঐক্যের বৈঠকে যখন সি পি এম মেনে নিয়েছে, সি পি আই জানিয়ে দিয়েছে তারা বৈঠকে যোগ দেবে না। কারণ তেলেগু দেশম দুর্নীতিবাজ এবং তারা বিরোধী বৈঠকে বি জে পি–কে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

জাতীয় স্তরে সি পি আই যখন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী রামারাওকে সামন্ততান্ত্রিক স্বেরাচারী বলছে তখন সি পি এম রামারাওকে নীরবে বামপন্থী মেনে নেওয়ায় দুই শরিক দলের মধ্যে পরোক্ষ বিরোধের রূক্ষতি বড় হয়ে উঠেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভায় তেলেগু দেশমের ভূমি সংস্কার নীতির প্রতিবাদে সি পি আই ওয়াক আউট করলেও সি পি এম করে নি। ২৮ মে রামারাওয়ের ডাকা বিরোধী সম্মেলনে রামারাওয়ের আমন্ত্রণকেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন সি পি আই–এর রাজেশ্বর রাও।

জাতীয় স্তরে সি পি এম এবং সি পি আই–এর সম্পর্কে চিড় ধরার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বি জে পি। সি পি আই নেতৃত্বের ধারণা, সি পি এম মুখে যাই বলুক না কেন, ভেতরে ভেতরে বি জে পি–র সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে যা তাঁদের কাছে কোনভাবেই কাম্য নয়। তাছাড়া অন্ধ্র প্রদেশের একজন সি পি এম সদস্যকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনার জন্য বি জে পি–র সাহায্য নেওয়াটিকেও তাঁরা সহজ মনে মেনে নিতে পারেন নি।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনটিকেও যে সি পি আই নেতৃবৃন্দ সহজমনে মেনে নিতে পারেন নি তার প্রমাণ হয়ে গেছে নির্বাচনের ফল বেরনোর পর। সি পি আই–এর নেতৃবৃন্দ লিখিত বিবৃতি দিয়ে সংবাদপত্রে জানালেন–সি পি এম–এর জন্যই তাঁদের ৯৫টি আসন হারাতে হয়েছে। এ বিষয়ে সি পি আই দাবি করল দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকের। তা সত্ত্বেও সি পি এম নির্বিকার।

সি পি এম–সি পি আই সম্পর্ক নিয়ে সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত সি পি এম দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঠিক হয় দু'দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলা হবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোন চেষ্টাই সেভাবে কার্যকর হয়নি। এ·আই·টি·ইউ·সি ও সিটুকে সম্মিলিত ভাবে নিয়ে যৌথ আন্দোলনের জন্য যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব ওঠে, প্রাথমিকভাবে সিটু নেতা বি·টি· রনদিভে মেনে নিলেও, সিটু রাজ্য শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় তা নাকচ করে দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই সি পি আই এর ভিতরে এনিয়ে ক্ষোভ জমা হয়েছে।

বিকল্প সরকার গঠনের প্রশ্নেও সি পি আই–সি পি এম একমত হয়ে উঠতে পারেনি। দিল্লিতে বামপন্থী ছাত্র ফ্রন্টের একটি বৈঠকে সি পি আই ছাত্র সংগঠন সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে আগামী সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে প্রস্তাবিত আন্দোলনের কর্মসূচীতে তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবে না।

সি পি এম ও সি পি আই রাশিয়ার প্রতি অনুগত হলেও উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বেশ কিছু পার্থক্য রয়ে গেছে। সেই পার্থক্য এবং পারস্পরিক বিক্ষোভ সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় প্রকটিত হয়ে উঠেছে। সি পি এম একদিকে গর্বাচভের পেরিস্ত্রোয়িকা তথা গ্লাস্তনস্ত নীতিকে যেখানে সমালোচনা করছে, সি পি আই তাকে মর্যাদাসহ মেনে নিচ্ছে। বেশ কিছু মৌলিক নীতিতেও তারা পরস্পরের বিপরীত–এ কথা ঠিক, এতদিনের যে বিরোধিতা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল জাতীয়স্তরে হঠাৎ তাই–ই এখন প্রকট হয়ে উঠছে।

বিচ্ছেদের অপেক্ষা!

সি পি এম–সি পি আই–এর লড়াই সারা ভারতে কতটা ছাপ ফেলবে বলা দুষ্কর। কেননা কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ বাদে সব রাজ্যেই সি পি আই সি পি এমের থেকে দশগুণ শক্তিশালী। তেমনি শ্রমিকফ্রন্টেও সিটু থেকে শক্তিশালী এ আই টি ইউ সি। তাই ওই সমস্ত এলাকায় সি পি আই-ই বামনিয়ন্ত্রকশক্তি। তবে পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলের কথা আলাদা। এখানে সি পি এম–এর আত্মপ্রতিষ্ঠা বনাম সি পি আই–এর আত্মরক্ষার লড়াই। এ লড়াই চলবে কোন একটিকে অপরটি গ্রাস না করা পর্যন্ত। বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম প্রকৃতপক্ষেই প্রতিনিয়ত গ্রাস করতে চাইছে সি পি. আই কে। সি পি আই–এর যারা মেনে নিচ্ছেন, তাঁরা হয়তো রাজ্যসভার এম পি পদ কিংবা মন্ত্রীপদ পাবেন। যারা মানবেন না আত্মসমর্পণের, রাস্তা, তারাও বোধহয় আক্রান্তই হবেন। নারায়ণ চৌবে এবং এম এ রহমানকে তাই টিকে থাকতে গেলে প্রতিপদে আত্মরক্ষার লড়াই চালাতে হবে। বামফ্রন্টের সরকারি তকমা থাকলেও তাই নারায়ণ চৌবের মত লড়াকু নেতারা বিরোধী নেতার মতই ট্রিট পাবেন। অন্যথায় সি পি আই–সি পি এম বিচ্ছেদ হবে তরান্বিত।

ছবি: শারদী নাথ

চন্দন কাঠের আগুন

কমল চক্রবর্তী

আজ থেকে চার বছর আগে এক বিকেলে কেয়া তপোধীরকে বলেছিল, তোমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রইল, দেখো কোনদিন বোর হবে না। তুমি মিলিয়ে নিও বাবলু। তখন সবে ওদের চার পাঁচটি ডেটিং হয়েছে। কেয়া উনিশ বছরের বি-এ· পরীক্ষার্থিনী, তপোধীর পঁয়ত্রিশ বছরের, আর তত যুবক নয়, পুরুষ।

—আরে ধুর মেয়েদের সঙ্গে আবার কথা বলা যায় নাকি? গয়না, কাপড়, খাওয়া আর ইয়ে শোয়া (হাত নেড়ে) ব্যস ঐ ঐ—

—ও ছেলেরা বুঝি এক একজন আস্তো আস্তো আইনস্টাইন, নাটক, নভেল, সাহিত্য, বিজ্ঞান—মৃদু হাসির লহরে পরিবেশ ফের তুলে দিয়েছিল তপোধীরের হাতে, —হ্যাঁ খুব এক একজন যেন। আমার বাবা, দাদা, মেজদা, খুড়তুতো ভাই, কলেজের ছেলেদের দেখিনি।

—দেখেছো, দেখেছো, সব জানি। তবে কি জানো, মানুষ এবং মেয়েমানুষ এই হল দুটো আলাদা প্রাণী। ঐ আর কি মেয়েমানুষ। লক্ষ বছর ধরে মানুষ হতে চেয়েও যারা হতে পারে নি। ভাবতে পার আমার দেখা যত ঘর ইনক্লুডিং আমাদেরটিও, মাত্র দু-চারজন ওস্তাদ মেয়েছেলে আরামসে টুকরো টুকরো করে দিল।

—ও তাই বুঝি?

উনিশ বছরের মেয়েটি সেদিন পেছনে ঝুলে
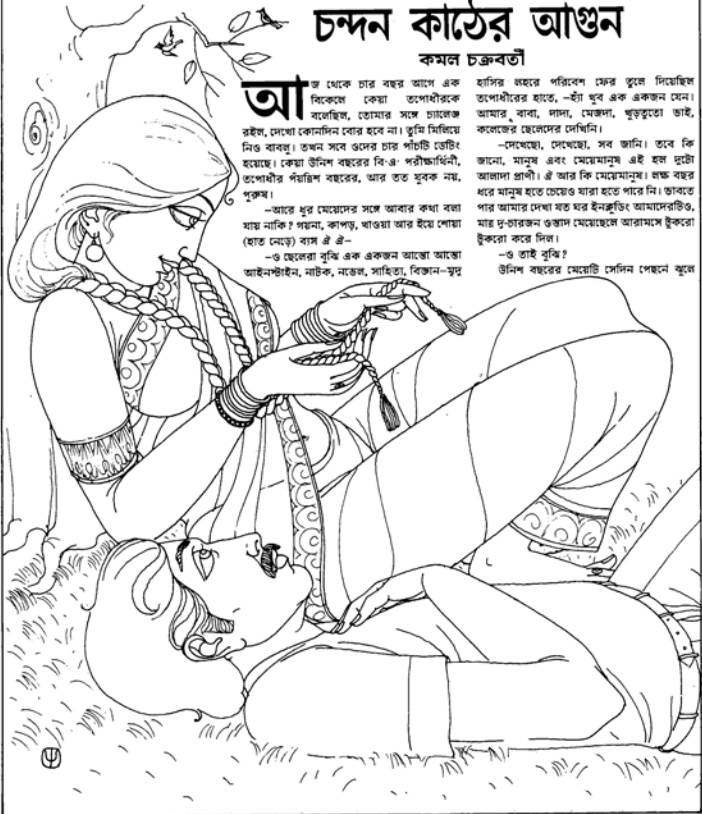
থাকা দুটো মোটা বেণী বুকের ওপরে কালো নাগিনীর মত দু'হাতের ফর্সা নরম পাপড়ি দিয়ে খেলাতে খেলাতে অত্র চুলের মত হেসেছিল—দূর বোকা তাও আবার হয় নাকি?

—দেখ তোমার আগে পাপিয়া, রমা, কৃষ্ণা, সত্যি বলছি এই তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তুমি অনেক পরে। অনেক বাচ্চা। খুকী। আমি ওদের কাউকে বিয়ে করতে পারতুম। করিনি। এই ছেলে যে ডিভোর্স বা বধূহত্যা তার আসবে না। নির্মাণ কোন মাংসের লাম্পের সঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। তুমি তো সেদিনের খুকী, সিগারেটের ধোঁয়ায় কেয়াকে প্রায় একটা বোরখা পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আসুন আমরা ভাল বন্ধু হতে পারি।

—না, কেয়ার চোখের শিরাগুলি লাল, জলে ঝিনুকের শূন্যতা টলমল করে উঠছে,—না বাবলু, তোমাকে আমি ছাড়ব না। তুমি ভাল জানো, এইখানে হাত রাখো, বলে তপোধীরের বাঁ হাতটা তুলে বুকে রেখে বলেছিল—ফিল করো, খুব কি মনে হচ্ছে প্রায় মানুষ হতে চাওয়া কোন প্রাণী?

সূর্য তখন ডুবুডুবু। গাছে পাখির বাড়ি ফেরতা কিচিরমিচির। গঙ্গার হাওয়া এসেছে আকাশের দিকে নীল পেরিয়ে। একজন সাদা জামাপ্যান্ট পরা মানুষ, ওদের ঝোপের আড়ালে বসে বুকে হাত দিতে দেখে ছুটে এল এবং বলল, এখানে আর আসবেন না।

অন্যদিন হলে দু জনেই রাঙা হয়ে যেত। বিশেষ করে তপোধীর, যে কিনা পঁয়ত্রিশ বছরের প্রায় বৃদ্ধ। কিন্তু দুজনে উঠে পড়ল। কেয়ার বুকে হাত রাখার সময় তপোধীরের হাতে পড়েছিল যুবতী চোখের জল, এবং যে চোখের জল অর্থ নয়, যশ নয়, শুধু লক্ষ কি কোটি নারী জন্মের বিপন্ন বিস্ময়ের অভিজ্ঞান।

—তুমি দেখ, তবু বলল। চলতে চলতে লোকের ছোট ভীড় পেরিয়ে—দেখ আমি তোমাকে—বোর হবো না। উনিশ বছরের একটা পবিত্র অগ্নিশিখা কেবল চন্দন কাঠের আগুন, ধুনো গুগগুলের মিঠে ধোঁয়া আকাশের নীচে তার সোনালী দু'হাত পল্লবিত করে বলল, দেখ আমাকে তোমার ভালবাসতে ইচ্ছে করবে। আমার অনেক আছে, অনেক।

চন্দন কাঠের আগুন সরু নীল বেণী হয়ে হালকা হাওয়ায় এভাবেই নীলাঙ্কিত হয়, যেভাবে সেদিন কেয়া হয়েছিল।

তার এক বছর পরে এম-এ- পড়তে পড়তে কেয়ার বিয়ে হয়ে গেল। তপোধীর চন্দনের নীলাভ সুগন্ধী শিখায় হাত পা সেঁকে ক্রমে অন্য মানুষ হয়ে যেতে লাগল।

হনিমুনে ওরা গিয়েছিল লাক্ষাদ্বীপে। বোম্বে থেকে সেই সমুদ্রযাত্রা, কিম্বা সেই নির্জন কাপাস তুলোর পৃথিবী ছিল রামধনু রঙের। আজও তপোধীর ভেবে অবাক হয়, হনিমুনের দ্বিতীয় দিন এ্যাটাচির তলা থেকে বেরোলো মুঠো মুঠো চকলেট লজেন্স, বাচ্চাদের ইজের, নিমা, ফেক্, নানা ধরনের ফুলের বীচি (কসমস, গাঁদা, সন্ধ্যামণি)।

—কি করবে? অবাক তপোধীর—এসব কি হবে রে পাগলা?

—দেখ না কি করি, কেয়া দু হাত শূন্যে তুলে প্রথমে একবার নাচল, —জানতুম এখানে বাচ্চারা সহজে কিছু পায় না, খুব গরীব, আমাদের হনিমুন যাতে মানুষের কাজে লাগে তাই। দেখবে চল, হাওড়া হাট থেকে তিন টাকা চার টাকা ডজনে সব কেনা। অথচ দেখ ওদের অবস্থা।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার কিছু পরে নতুন ইজের, নিমা গায়ে মুঠো মুঠো শিশুর প্রত্যেকের হাতে লেবেনচুষ। স্নান করা চুল থেকে মুক্তো ঝরছে কেয়ার। তপোধীরের রক্তে চন্দনের আগুন ঝিকমিক করে ঢুকে নাচতে লাগল।

পরদিন কেয়া মুঠো খুলে দেখাল আমের আঁটি।

—পুঁতবো, আর ছেঁপু হবে, বাচ্চারা বাজাবে। তপোধীর বিস্মিত, মুখের দিকে তাকিয়ে—কি এত আকাশ পাতাল ভাবছ? পাঁচ ছ'টি বীচি যদি লাগাই দুটো অন্তত গাছ বেরুবে। দুবছরে ঝাঁপড়া হবে, আম হবে, কত রাতপাখি বসবে, আঃ হনিমুন ট্রি।

কেয়ার দিন জেটিতে ভিড় করে লাক্ষাদ্বীপের অসংখ্য রোগা রোগা বাচ্চা ওদের না বুঝতে পারা ভাষায় কি একটা গান গেয়ে গেয়ে হাত নেড়েছিল।

—তোমার ভাল লাগছে বাবলু? বোর হচ্ছো না তো? কতদিন পর জাহাজের কেবিনে বসে কেয়া জিজ্ঞেস করেছিল। হয়ত ঐ কথা বলার ঐ আদর্শ জায়গা, নীল জলরাশি, স্কাইলাইট, শংখচিল উড়তে উড়তে সীমানা ছাড়িয়ে মানব জন্মের আকাশ ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায়। তুমি খুশি বাবলু? তপোধীর কেবিনের জানলার ধারে বালিশ রেখে বই পড়ছিল, কেয়া বুকের ওপর মুখ নামিয়ে যেন কোন আবেগের নরমে ঝংকার পৌঁছে দিচ্ছিল। তুমি সুখী বাবলু?

গত পুজোর আগে একদিন বলল, পুজোর বাজেট মানে আমাকে কত টাকার শাড়ি দিচ্ছো?

—এই ধরো পাঁচ ছ'শো, তপোধীর হাসল—আচ্ছা বাজেট আবার কি? তোমার যাইচ্ছে—

—তবে এক হাজার। ঠোঁটে দাঁত বসালো, চোখ চেপে বন্ধ, বেণী দুটোই ব্রা ব্যবহার না করা অফুরন্ত বুকের মাঝে।

—কি করবে এক হাজার? বোনাস পাব বড় জোর তিন হাজার, তাতে তোমাকেই এক হাজার। কি করবে? শ্বশুর শাশুড়ি?

—না, কেয়া রাগ করল না—একটা দুরবীন কিনব সার। বেড়াতে গেলে খুব কাজে লাগে, পাখি দেখা যায়, হঁ হঁ। তবে শাড়ি ছাড়ছি না, তন্তুজের রিবেটে এই দেখ, দেখ, আঙুল গুনে গুনে—একশ থেকে দেড়শ', এক পয়সাও বেশি নয়।

পয়লা বৈশাখে শ্বশুর মশাই পাঁচশ টাকা পাঠালেন। কেয়া সোজা শীপ্রভার্ড জিটেবোচারে গিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের দশটি ছবির বই নিয়ে এল। অফিস থেকে ফিরে তপোধীর দেখতে পেল, বালিশ বুকে চেপে গম্ভীর কেয়া—সামনে লিওনার্দো,

রেঁনোয়া। বাথরুমের দেওয়ালে সে স্পান লেডী ছবি লাগিয়েছে। মাছ ধরা খুনি দিয়ে ল্যাম্পশেড।

ইতিমধ্যে ঝগড়া কি হয়নি? শরীরে তেমন জুৎ নেই তবু জন্মদিনে ব্লাড ডোনেট করা চাই। তপোধীর বলেছিল, মেয়েদের এত ব্লাড যায় যে ব্লাড ডোনেট করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। কেয়া হেসে বলেছিল, আমার জন্য বছরে একজন মানুষকে সুস্থ করবে বাবলু, বছরে মাত্র তো একবার বাধা দিও না।

মারেজ অ্যানিভার্সারিতে প্রিয় বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে সরবৎ আর সন্দেশ খাওয়াল, সঙ্গে লটারী। লটারীর কাগজ খুলে দেখতে পেল ছ'টি চারার কিম্বা দুটি খাঁচার মাপ বা একটি চীনে মাটির ফ্লাওয়ার ভাস। পারে, সকলে বলল, কেয়া পারে।

তপোধীর আকুল নয়নে গম্ভীর স্বরে বলল, কেয়া তোমার আগে আমি তিনজন মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশেছিলাম, তুমিই প্রথম মানুষ।

কেয়া বলল, তোমাকে বলা হয়নি, তোমাকে দেব বলে একটা লাল গোলাপের চারা এনেছি, দেখবে চল।

ওরা দুজনে না-পোশাক নীল আলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাথরুমের জানলা অবধি গেল, যেখানে চীনে মাটির বিশাল ভাসে রক্ত গোলাপের শিশির খাওয়া কুঁড়ি। তপোধীর ঐখানে দাঁড়িয়েই পায়ের পাতা থেকে চুমু খেতে আরম্ভ করল, যখন মাথার চুল অবধি উঠে এল, তখন শেষ প্রহরের মুরগী হাসান মিঞার বাড়িতে কঁকর-কঁ কঁ কঁকর-কঁ।

(দুই)

কখনও বিকেলের দিকে হাসপাতালে ঝোলা ভরে আপেল, আঙুর, বেদানা, কমলা নিয়ে যাওয়াও ছিল একটা মজা। অফিস ফেরতা তপোধীর কিনে আনতো। কত পেশেন্টের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। আহারে। কারও বিয়ে বা জন্মদিনে এক জোড়া ষষ্ঠী বা এক ঝাঁক মুনিয়া কিম্বা দুটো রবার চারা দিতে পেরে সত্যি আনন্দ লেগেছে। তাই বলে কি কেয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়নি। ঝগড়াগুলি বেশিরভাগই তৈরি হত মা, মাসি, ছোড়দি বা বড় বৌদিদের কারখানায়। এমন নয় যে সকলে ওদের আনন্দ আহ্লাদে জ্বলে পুড়ে মরছে। কি করে কি করে যেন সকলেই কিছু না কিছু কাঁকর গোপনে বা প্রকাশ্যে চালে ছড়িয়ে যাবেই। এবং যথারীতি দু চারদিন কথাবার্তা বন্ধ, শরীর নিথর, ভাবনায় ঘুরে পড়ে, 'দূর শালা বিয়ে করার মত বাজে কাজ কিছু নেই।'

এরই মধ্যে একদিন বসন্তের বিকেলে তপোধীর ব্যালকনিতে কফি সিগারেটে মগ্ন। মাঝে মাঝে টবের সূর্যমুখী লংকা, ভীষণ ঝোপড়া হয়ে যাওয়া আঙুর লতায় দু চারটে ডাল ঘরের দিকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে, এই লতাটি তপোধীরের খুব আদরের। ওদের টবে একটাও ক্যাকটাস নেই, পছন্দ নয়। ওরা দুজনেই আজও ঘুম থেকে উঠে টবে লাগানো বেগুন, কপি, লেটুস, লংকা, টম্যাটো,

ধান, গম বা পেঁয়াজকলি দেখে খুশি হয়। অবশ্য এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়, কারণ কেউ গমের হলুদ শীষ দেখতে ভালবাসে, কেউ কাঁটা গাছ, তাতে কিছু যায় আসে! কেয়া বলে, ফলন্ত গাছের মত সুন্দর পৃথিবীতে খুব বেশি কিছু নেই।

তো তপোধীর কঞ্চির ফাঁকে ফাঁকে করলা হলুদ ফুলে ভরা লতাটিকে ঠিকঠাক সুতোর জাফরিতে বেঁধে দিচ্ছে। ভেতর থেকে ডাক এল, বাবলু, বাবলু।

–আসছি বসন্তে এদিককার প্রকৃতিতেও বেশ খানিকটা অনুরাগ, আহ্লাদ ছড়ানো থাকে। পল্যুসন এখনও জব্দ করতে পারে নি। ঘরের ভেতরে পা দিতে দিতেই শুনতে পেল খুব মৃদু মোৎসার্টের একটা আনন্দ লহরী টুং টাং বাজছে। ফের 'বাবলু' 'বাবলু'। ভেতরে গিয়ে দেখে বাথরুমে গোছ অবধি জমা জল। জলে কিছু ফাইটার, গোল্ডফিল, শ্ল্যাকমলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু গোলাপের ছেঁড়া হলুদ, গোলাপী পাপড়ি, দু চারটে লাল শালুক, তার মধ্যে একজন মৎস্য কন্যা।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে স্নানের শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লম্বা স্কাইলাইট দিয়ে শেষ বিকেলের বাসন্তী আলো, পাখিদের বাড়ি ফেরতা কাকলি, বাথরুমের সেলফে পেয়ে গেল পূরবী, খেয়া, বনলতা সেন। যেসব কবিতা কখনও ভালবাসেনি, কি করে যেন মুঠো মুঠো আনন্দ রঙ নিয়ে হাট করে খিল খুলে দিল।

ঐ মাছ, ফুল, জলপরীর সঙ্গে কাব্যগ্রস্থ। তপোধীর পরীর ভেজা গলায় মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদতেও চেয়েছিল। দেখেছিল কালো কুচকুচে শ্ল্যাকমলি এবং গভীর লাল গোল্ড ফিশ কিভাবে গোলাপী সেই নারীর না-পোশাক কোমল শরীরের ঢেউয়ে পাগলের মত খেলে বেড়ায়। মোৎসার্টের মৃদু তরঙ্গ, ওডিকোলনের সমাহিত গন্ধ, কখনও মনে হয়েছে জ্যোৎস্না রাতে জেব্রা চরে বেড়ানো সাভানা প্রান্তরে ওরা দুজন, কখনও মনে হয়েছে কোন প্রবাল দ্বীপে দুজন নরনারী শিপ রেকের পর নির্বাসিত।

কেয়া বলেছিল, এইখানে একটা চুমু খাও, এই চোখের পাতায়, তপোধীর জল দিয়ে পায়ের পাতা, পিঠ, জংঘায় লিখে দিয়েছিল 'বাবলু বাবলু'।

–ঘুমিয়ে পড়ি বরং মরে যাই বাবলু। আমার আঙুলের ডগায় কান পাতো, আমার পায়ের নিচে কান পাতো, দেখ কি ভীষণ গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, বাবলু আমি কি মরে যাচ্ছি?

রান্না করতে ভালো না লাগলেও, রান্না নিয়ে মজা করতে কেয়ার চিরদিন মজাই লাগে। যেমন মাংসে কাসুন্দি ঢেলে দেওয়া, কিম্বা মোচায় কিমা, অথবা অমন বিচ্ছিরি কুমড়োয় দু তিনটে ডিম ভেঙে দিয়ে একেকটা নাম লাগিয়ে দেবে বাবলু। আজ নারকোল কিমা, কিম্বা কাবলি প্রন। আসলে হয়েও যেত মজার, বাজার করার ব্যাপারে দুজনেই বেশ সরেশ। যত রকমের অখাদ্য কুখাদ্য ম্যাকরেল, শংকর, হাঙর মাছ থেকে শুরু করে গরু ঘোড়া তো চলবেই, সঙ্গে তপসে ভাজা হলে আঃ!

ভেতরে আসুন বাবু।

বোস কাকু বললেন, এই যে হারাণ মাঝি,–উনি ঐ নামেই ডাকেন, এবার পুজোয় কোথায় যাচ্ছ?

–ঠিক নেই কাকু, বুকিং না করে গেলে যা হয়। ওকে তো জানই, কামারহাটি কিম্বা খানাকুল হবে শেষ অবধি।

–তোরা ম্যাকলাকিসগঞ্জ যা না বাবা, আমার বাড়িটাও একটু ঝাড়পোঁচ হয়। কি যে হচ্ছে। আর ওখানে যে থাকার জায়গাটা ছিল, হাইল্যাণ্ড গেস্ট হাউস, সে টি তো গেছে, যা ঘুরে আয়। রাঁচির খুব কাছে, ভাল লাগবে। রাধুকে বলবি রান্না করবে, জল তুলবে। তোদের জন্য খুব ভাল।

শেষে ম্যাকলুকিসগঞ্জ। নতুন জায়গায় কত খেলা থাকে। নতুন রকমের অন্ধকার, তামাশা।

একদিন কিছুর মধ্যে কিছু নেই। কেয়া সব চাকর বাকরকে বলল, যা ছুটি, পরশু আসিস। তারপর আরম্ভ হল দুজন শাপভ্রষ্ট দেব দেবীর মর্ত্যলীলা।

সকাল থেকে খাবার দাবার, লুডো খেলতে খেলতে বেশ কিছুটা সময় গেল। তারপর ঠিক হল, বাগানটি বেশ হতকুচ্ছিত, যদি খানিকটা শ্রমদান করা যায়। কোদাল গাঁইতি, ঝুড়ি জোগাড় করা, ডান দিকে আঁচল ঘুরিয়ে গোছের ওপর তুলে শাড়ি। যৌনাঙ্গ ঠিকমত আড়াল করা যায় না এত খাটো কানি পরনে তপোধীর। খেলা জমে গেল। দেখতে দেখতে বাগানের চারপাশ জেগে উঠল, গাঁদা ফুলের বেড তৈরি, রঙ্গনের চারধার কোপানো, পুরনো গোলাপের ডাল ছাঁটা, বোগেনভিলিয়ার মস্তক মুণ্ডন, ঘাসে, চষা মাটিতে কি অপূর্ব দুজন দুজনের দিকে শেষে তাকিয়ে থাকে।

–দেখ আমি এখন দশ বালতি জল তুলব, কেয়া বলল।

–কুয়ো থেকে! তুই! এই ধাঁধাঁ দুপুরে! মরে যাবি পাগলা।

–ছি: মরব কেন? তুমি পেয়ারা তলায় বসে বসে দেখ বুঝতে পারবে কেন পুরুষেরা লুকিয়ে যুবতীদের জল তোলা দেখে, বলে খিলখিল হেসে বাদাম গাছে বসে থাকা দুপুরের বিশ্রামরত এক ঝাঁক টিয়াকে উড়িয়ে দিল। সত্যিই আদিবাসী কামিন। রোদে, ঘামে, তেল চুকচুকে চোখমুখ রাঙা, অমৃতের প্রলেপ লাগান।

সত্যি সেদিন কেয়ার জল তোলা, ঘাসে, শ্রমে,

রোদে ইনকো যৌবন, চোখ ফেরানো যায় নি। পেয়ারাতলায় তপোধীরকে ঘিরে স্বপ্নের নাচ। সেই জলে প্রথমে সাবান ঘষে ঘষে কেয়া তপোধীরকে স্নান করালো। শেষে নিজে স্নান করল। পুজোর পাহাড়, জঙ্গল ভগবতী আকাশে নীল ছায়াঘন আদুর দুপুর। পাখ পাখালির মৃদু মূর্ছনায় অপূর্ব।

—বাবলু, আর ফিরব না। চল এই শালবনেই শেষ হোক।

সেদিন কোজাগরী জ্যোৎস্নায় ম্যাকলুস্কিগঞ্জে এক সোনালী মানব এক সোনালী মানবী কোটি বছরের মানব সভ্যতাকে অস্বীকার করে সত্যি দেবতা হয়ে মসৃণ চন্দনের আলোয় ঘুরে বেড়াল।

—আমি চন্দনের শিখা, চন্দনের আগুন।

—হাঁ কেয়া, জ্যোৎস্নায় উদ্ভূত চুলে মুখ গুঁজে তপোধীর বলল, দেখ আমার ময়লা শরীরেও তোমার চন্দনের ধুলো জমেছে।

—আমার আগুন দেখাতে পাচ্ছো? কেয়া উঠে দাঁড়াল, দু হাত তুলে দিল। শিখা আকাশমুখী—আমি চন্দনের আগুন, দেখ সুগন্ধী। দেখ তোমার গত জন্ম মনে পড়বে। দেখ তোমার সব পাপ ধুয়ে যাবে। চোখের কিনারে গলা হাঁরে।

আগুনের শিখা দুহাতে জড়িয়ে তপোধীর পুড়ে ছাই হয়ে যেতে চাইল।

(৬)

আজ সেই ভয়ংকর শনিবার।

অন্যান্য দিনের মত সকালে উঠে স্নান সেরে কেয়া চা নিয়ে বিছানায়। এই একটা মোলায়েম খুনসুটির সময়। উরুতে মুখ গুঁজে তপোধীর একবার মুখ তুলে চুমুক দেবে, ফের উরুতে আশ্রয়। পোষা বদ্রী দুটি ডাকবে। ভোরের আলোয় অন্য পাখিরাও কখনও কমলার বীচি কিম্বা বেদানার বীচি জানলা দিয়ে ফেলতে চাওয়া, খেতে আসে। কখনও আপনিই রোদে নাচে।

—আজ বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে। মনে আছে তো? উরুতে মুখ তপোধীর।

—অ্যাভয়েড করতে পারো না, সোজা বলবে বাড়িতে অসুবিধে।

কেয়ার বিরক্তি।

—কিম্বা আগে থেকে অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—আমি চাকরি করি, দশটা লোকের সঙ্গে থাকতে হয়, বললে হলো। এম-ডি-র পার্টি। সকলে যাবে। আমি প্রায়ই যাই না। এবার না গেলে কেলো হবে। উরুতে একটু কামড়ে দিল।

হা: ন্যাকামি করো না। এম-ডি- বেশি হয়ে গেল?

এইভাবে শুরু এবং শেষ ভীষণ খারাপ ভাবে।

—এইজন্য আগের দিনের লোকেরা চাবুক হাতে মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলত। আস্কারা দিয়ে দিয়ে সব মাথায় উঠেছে।

—তুমি কি মনে করো? যা খুশি তাই বলে যাবে? দুটো খেতে দাও বলে এত কিসের! কি ভাব তুমি?

গত মে মাসে ওদের বিয়ের তিন বছর হয়েছে এবং কেয়ার চৌত্রিশ।

—যাবে তো বিনে পয়সায় মদ গিলতে আর তেল মারতে, তা আবার অত কথা কিসে। ঐ এক, যে ডাকলো, মদের গন্ধ পেলেই হল, জা জা।

কেয়ার একটা ড্রিংক অবসেসান আছে। বাবা কাকাদের একটা ধ্বংস সে প্রত্যক্ষ করেছে। তাছাড়া অনেকদিন বলেছে ঘরে বসে খাও যত খুশি, বাইরে নয়।

—নিজে তো কাঁড়ি কাঁড়ি মদ মাংস গিলবে আমি কি হাওয়া খেয়ে থাকব? একটু পরে এসে শুনিয়ে গেল।

সকাল থেকে কাজিয়া হওয়ার জন্য তপোধীর বাজারে যেতে পারে নি। না খেয়ে অফিসে চলে গেল।

—ফিরতে এগারোটা হবে। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে তপোধীর বলল।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরবে কেন, আর ফেরার সময় একটা খাট্টলি নিয়ে ফিরো, আমার মরা মুখ দেখবে, দেখবেই। অনেক চেষ্টা করেছি, তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। অসম্ভব।

তপোধীর চলে যেতেই কেয়া প্রাণপণ কাঁদল। দেয়ালে কপাল ঠুকল। দেখল পাখার সঙ্গে ঝুলতে হলে টুলটা টানতে হবে। কেরোসিন এক টিন আছে। অনেক খুঁজে পেতে তিনটের বেশি ঘুমের ট্যাবলেট পেল না। সে আজ মরবে। বাবলুকে কত ভালবেসেছে, কতরকম ভাবে কাছের করতে চেয়েছে, পারে নি। ঠিকই বছরে দুচারদিন, তাই বা কেন হবে?

কেয়া ঠিক করল মরে যাবার আগে ভাল করে ঘর সাজিয়ে, ফ্রিজ ভরে নানা রকম উপাদেয় খাদ্য রেখে দেবে, যাতে বাবলু অভাব বুঝতে পারে। ভাবতে পারে মদের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান ছিল কেয়া। কেয়া মূল্যবান, চন্দন কাঠের আগুন।

মনার মাকে দিয়ে কাটা পোনা, টক আপেল, মাংসের কিমা আনালো। আপেল, রুই, কিমা, চিংড়ে চচ্চড়ি, এমনি সব। কেয়া মেনু তৈরি করে ফ্রীজে রেখে দিল। সারা ঘরে আলপনা, রজনীগন্ধা, ধ্যাডিওলি, খস্ আতরের গন্ধ। ভাল করে ঘরের ঝুল নোংরা ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে দিল। বাবলু একা মানুষ, ব্যস্ত মানুষ পারবে না। পাঁচ ছ' দিনের খাবার করা রইল। মনার মাকে স্লিপ লিখে আনিয়ে রাখল হুইস্কি, সিগারেট—যেন কোথাও কোন অভাব বোধ না থাকে।

শেষে ডায়েরি লিখল, 'বাবলু তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি বাবলু। মরে গেলেও তোমাকে ভুলব না।'

গলির মুখে মি: বোস নামিয়ে গেলেও, রাত এগারোটায় এক পাল বয়া কুকুর অতিক্রম করে মলাপ অবস্থায় বাড়ি অবধি আসতে একটা রিকশার সাহায্য নিতে হল। কেয়ার পছন্দ লাল পাতায় মোড়া জুঁই ফুলের মালা। রিকশার টুং টুং।

সিঁড়িতে পা টলছে। সারাদিন একটা ভয় ছিল। কেন কেয়ার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, যদি সত্যি কিছু করে বসে, আত্মহত্যা! সঙ্গে একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল। সেই ভয়টা সিঁড়ির ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল। কেয়াকে ছাড়া সে কিভাবে থাকবে? সে তাকে কত দিয়েছে, কতদিনের সুখস্মৃতি!

দুবার টোকা দিতেই দরজা নিজেই খুলে গেল। ভেতরে শূন্যতা। খানিকটা বন্ধ হাওয়া ভস্ করে বেরিয়ে গেল। দু এক মুহূর্ত টলটলে পা ঠিক হতে পেতে শুনতে পেল যেন খুব দূর থেকে শান্তাপ্রসাদের তবলার সঙ্গে কেউ কথক নেচে চলেছে। ঘুঙুরের স্বর্গীয় রণন। নাকে লাগল, ধূপ, মদ, আতর, রজনীগন্ধা, সিগারেট মেশানো একটা চিটচিটে যৌনগন্ধ। কেয়ার দেখা নেই। এই পরিবেশ তপোধীরকে ভয় দেখাবার জন্য যথেষ্ট। কেয়া নেই। সমস্ত পরিবেশে সেই গুঞ্জন, ঐ ঘুঙুরে, তবলায়, 'কেয়া নেই'।

শোবার ঘরে দরজার ওপরে চোখ পড়তে দেখল বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'নাচ আউর গানা', পরের লাইনে 'পদ্মিনী জৌনপুরী (বুলবুলে হিন্দ)'।

বিস্মিত তপোধীর দরজা অবধি এগোতেই দেখতে পেল, সেই অনন্যা কেয়া। যে কিনা আজ পদ্মিনী জৌনপুরী সেজেছে।

—ভেতরে আসুন বাবু।

মোটা কাজল চোখে, লম্বা বেণীতে বেলকুঁড়ি মালা, থুতনিতে উল্কি, মুখ ভর্তি পান, অ্যাশট্রেতে জলন্ত সিগারেট, গেলাস, মদের বোতল, দেওয়ালে অর্ধনগ্ন যুবতীর ছবি, পিকদানিতে পিকের ছিটে।

সারা দুপুর ধরে কেয়া পদ্মিনী জৌনপুরীর ঘর তৈরি করেছে। যেন কোন প্রখ্যাত বাঈজীর ঘর। প্রত্যেকটি জিনিস অসাধারণ তৎপরতায় সাজানো।

—তুমি পারো কেয়া তুমিই পারো। জৌনপুরী না যৌনপুরী। তুমি পারো, তপোধীর কেয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

—পান খাবে? বোস। আগে একটু ঢালি। দুটি গ্লাসে ভরে হাতে একটি তুলে দিল—আমি জানতুম তুমি আমাকে ভালবাসবে বাবু, তোমার জন্য দেখ—হাত পা বুক তুলে দেখাল।

দু হাতের পাতা, পা, পদ্মপদ্মি, মেহেন্দির আলপনা। কেয়া সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিল। তখন তপোধীর কেয়ার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

—আর কখনও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, তুমি এত পারো। তপোধীরের চোখের জলে পায়েআঁকা মেহেন্দি ফুল সত্যি হয়ে ফুটে উঠল।

তুমি এত জানো কেয়া, এত রহস্য, এত রূপ তোমার। আমি আর কোনদিন কোথাও যাব না, কোনওদিনও না।

ততক্ষণে কেয়ার পায়ের নূপুর ঝুমঝুম করে বাজতে শুরু করেছে। সঙ্গে শান্তাপ্রসাদের তবলা। চন্দন কাঠের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। বলেছিলাম কোনদিন তোমার থেকে হতে দেব না বাবলু, বাবলু! তোমার ভাল লেগেছে?

সোনম

আনিলাম অপরিচিতার নাম : সোনম!

লেখাপড়ায় ব্যর্থ হয়ে ফিল্মে আসার সিদ্ধান্ত নেয় ষোড়শী সোনম। কোনরকমের সংস্কারমন্যতা নেই এই সুন্দরী নায়িকার। একটিও ছবি রিলিজ হবার আগে এতটা নাম ডাকও কেউ বোধহয় পাননি এর আগে। অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় এখানে সোনম প্রকাশ করে ফেলেছেন অনেক কিছুই।

প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক যশ চোপড়া এক সময় তাঁর নতুন ছবি 'বিজয়'-এর জন্য একটি নতুন মুখ খুঁজছিলেন। পুরোপুরি নতুন নারী মুখ। যে দেখতে সুন্দর তো হবেই সেই সঙ্গে দেহ সৌষ্ঠবও হবে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। যাতে টু-পীস বিকিনি পরেই স্যুইমিং পুলে একসক্লুসিভ ছবি দিতে পারে। এই চাহিদার পাশাপাশি তিনি এও চেয়েছিলেন সেই নবাগতা যেন এর আগে কোন ফিল্মে কাজ না করে। এমনকি কোন পত্র পত্রিকাতে তার ছবিও যেন ছাপা না হয়ে

'বিজয়' ছবিতে সোনম ও ঋষি কাপুর

ছবি: রথীজিৎ মল্লিক

থাকে। যাতে ফিল্মে আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্বটুকু প্রাপ্য হয় তাঁরই।

এই সময় বম্বের আবহাওয়ায় জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠা এক ষোড়শী পড়াশুনায় পুরোপুরি ফ্রাসটেটেড হয়ে ফিল্ম লাইনে কাজ পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। লেখাপড়ায় ব্যর্থ হয়ে ফিল্মে কাজ করার স্বপ্নে এক প্রোডিউসারের থেকে অন্য প্রেডিউসারের দরজায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় হঠাৎই যশ চোপড়ার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। চোপড়া সাহেব তার ছবি চেয়ে নেন। তারপর একসময় তাকে নিজের অফিসে ডেকে 'বিজয়'-এ কাজ করার জন্য সাইন করান।

ফিল্ম জীবনের শুরুতেই যশ চোপড়ার মত প্রযোজক পরিচালকের ছবিতে কাজ পাওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী অভিনেত্রীই সোনম।

একটা ছবিও দর্শকের কাছে পৌঁছানোর আগেই লোকমুখে চর্চিত নাম হয়ে ওঠা রীতিমত আশ্চর্যের। ফিল্মে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বহুল প্রচারিত নাম এখন সোনম। কোন কোন হিরোর বিপরীতে কাজ করেছেন? প্রশ্ন করা হলে সুন্দর দুই দীঘল চোখে কিছুটা চিন্তার রেশ খেলে যায়। বোঝা যায় যেন মুস্কিলে পড়ে গেছেন তিনি তার কথায়। 'এত নাম কি করে মুখস্থ রাখি বলুন?'

উত্তরের মধ্যে অহংকারের প্রলেপ মেশানো আছে মনে হলেও বাস্তবে কথাটি ঠিকই। কেননা এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি ছবিতে সাইন করেছেন সোনম। যার মধ্যে ৩০-৩৫টি ছবির কাজ ইতিমধ্যেই চলছে।

একটা ছবিও রিলিজ হয়নি এখনো। অথচ একের পর এক ছবিতে সাইন করে চলেছেন! এভাবে ছবি কনট্রাকট করা ও রাতারাতি চর্চিত নাম হয়ে ওঠা সোনমের আগে বা সাম্প্রতিককালের কোন অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে ঘটেনি।

সোনমের প্রথম ছবি 'বিজয়'। এই ছবিতে তার বিপরীতে নায়ক ঋষি কাপুর। এ পর্যন্ত সোনম বম্বের সুপার স্টার অমিতাভ বচ্চন থেকে ঋষি কাপুর, ধর্মেন্দ্র সকলের সঙ্গেই কাজ করে চলেছেন।

প্রেডিউসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রসঙ্গ আনতেই সোনমের মুখে খেলে যায় এক পরিতৃপ্তির হাসি। নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতেই বলেন 'সৌভাগ্যের কথা এখন কোন প্রেডিউসারের কাছে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না। আমার সঙ্গে তাঁদের আগে থেকেই যোগাযোগ হয়ে যায়।'

বম্বে ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে সোনমের ধারণা আর পাঁচজন সাধারণ অভিনেত্রীর মত নয়। কারো সম্পর্কে কুৎসা রটানোর পরিবর্তে শান্ত এবং স্পষ্ট ভাষায় অনেকেরই প্রশংসা করলেন তিনি। তাঁর মতে ফিল্ম ইউনিটের সকলেই কম বেশি ভাল—তারা কো-অপারেটিভ এবং প্রফেশনাল। তাঁর হাতের অনেক ছবির মধ্যে 'আজুবা'ও একটি। রোমান্টিক কমেডি ছবি 'আজুবা'তে সোনম দ্বিতীয় হিরোইন। এ ছবিতেও তাঁর প্রথম ছবি 'বিজয়'-এর নায়ক ঋষি কাপুরই তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন।

মীনাক্ষী শেষাদ্রি ও সোনম : প্রতিদ্বন্দ্বী

পুরুষ প্রধান বম্বের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কি নায়িকাদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে?

প্রশ্ন শুনে কিছুটা ভ্রু কুঁচকালেন সোনম। 'অবশ্যই। বম্বে ইণ্ডাস্ট্রি পুরুষকেন্দ্রিক ঠিক। কিন্তু আমাদেরও নিজের নিজের সুবিধা মত ভূমিকা পালনের সুযোগ আছে। তাছাড়া ফিমেল কো-স্টারদের বাদ দিয়ে একটা ছবির উত্তরণ তো ভাবাই যায় না। নারী না থাকলে সমস্ত ছবিই তো ধূসর, শুষ্ক।'

ফিল্মের সঙ্গে সোনমের পরোক্ষভাবে হলেও সম্পর্ক ছিল। সোনম অভিনেতা রাজা মুরাদের ভাগ্নী ও চরিত্র অভিনেতা মুরাদের নাতনি। এছাড়া তার মাসি হলেন সাবিয়া। প্রসঙ্গত সোনমকে ফিল্মে নামতে সাহায্যকারীদের মধ্যে তার আন্টি সাবিয়ার নামই অন্যতম।

শোনা যাচ্ছে আপনি কেরিয়ারের জন্য প্রেডিউসার বা পরিচালককে খুশী করতেই তাদের মত অনুযায়ী ইঞ্চি ইঞ্চি পোশাক কমিয়ে ফেলেন শরীর থেকে? আপনার কি মনে হয় এত স্বল্পবাস, কস্টিউমে আপনার অভিনীত ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য পাবে, আপনিও রাতারাতি স্টার হয়ে যাবেন?

সুন্দর নাকের ডগা তখন লাল, বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কারা বলে এসব!'

পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নেন সোনম— 'আপনিই বলুন ছবির প্রয়োজনে যদি কোন দৃশ্যে সুইমিং কস্টিউম পরতে হয় তাতে ক্ষতি কি? সাঁতারের দৃশ্যে নিশ্চয় কেউ বোরখা পরে না? তাছাড়া প্রেডিউসাররা আমার পেছনে পয়সা খরচ করেন, কারণ তারা জানেন আমি অভিনয় করতে পারবো, তারা পয়সা তুলে নিতে পারবেন। আমার স্বল্পবাসে জড়ানো শারীরিক ছবির জন্য নিশ্চয়

৮৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সিনেমার নব্যধারা আর আপোসী কুশীলবেরা

চলচ্চিত্রের সর্বভারতীয় পুরস্কার বিতরিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত ছবিগুলোর মান ও উপযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলা ছবির স্থান কোথায়? নব্যধারার পরিচালকেরা ক্রমেই আপোষের দিকে ঝুঁকছেন? একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন।

এ বছরের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ ছবি 'হলদিয়া চড়ায়ে বাওধান খায়'

১৯৮৭ সালে ভারতের বিভিন্ন ভাষার যে–সব ছবিতে ভারত সরকার এবছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেবার জন্য বিচারকদের সুপারিশ অনুযায়ী, নির্বাচন করেছেন, আপনারা ইতিমধ্যে সে-সব ছবির নাম জেনে গেছেন। সারা ভারতে এ বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেয়েছে অসমীয়া ভাষায় তৈরি 'হলধিয়া চরায়ে বাওধান খায়'। হ্যাঁ, আসাম এই প্রথম ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি তৈরি করার গৌরব অর্জন করেছে।

কিন্তু 'হলধিয়া চরায়ে বাওধান খায়' কি সত্যি ১৯৮৭–র শ্রেষ্ঠ ছবি ছিল? না-কি এই বিচার বিভ্রান্তিপূর্ণ বলে অন্য ভাষার কিছু ভাল ছবির দাবি উপেক্ষিত হয়েছে? যাঁরা ১৯৮৭ তে তৈরি ভারতের নানান ভাষার অন্যান্য ছবিগুলো দেখেছেন তাঁরা কিন্তু এই বিচারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। এই প্রতিবেদকেরও অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাই এখানে 'হলধিয়া চরায়ে বাওধান খায়' এবং অন্য আরও কিছু ছবির কথা আলাচনা করে দেখা যেতে পারে সত্যি এই বিচার যথাযথ হয়েছে কিনা।

আপনারা এও জেনেছেন যে কেরালার আদুর গোপালকৃষ্ণণ এ বছর আবার শ্রেষ্ঠ পরিচালকের গৌরব লাভ করেছেন–তাঁর বহু প্রশংসিত ছবি 'অনন্তরম'–এর জন্য। এই ছবিরই চিত্রনাট্য লিখে

গৌতম ঘোষ-এর 'অন্তর্জলী যাত্রা', থিম নির্বাচন কি যুক্তিযুক্ত।

আদুর গোপাল শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনার সম্মানও পেয়েছেন। তবে তাঁর 'অনন্তরম' ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে তো দূরের কথা, মালয়ালম ভাষাতেও শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়নি। সেই সম্মান পেয়েছে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এক ছবি 'পুরুষার্থম'। তাহলে দাঁড়াল এই: সবচেয়ে সেরা চিত্রনাট্য লিখে আর শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে

পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জির 'সরীসৃপ' ছবির একটি দৃশ্য

অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েও আদুর গোপালকৃষ্ণণ তাঁর 'অনন্তরম' কে কোনো পুরস্কারের জন্যই যোগ্য করে তুলতে পারলেন না। সম্মান এবং পুরস্কারের এমনি বিভ্রান্তি অনেক।

আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ছবির বিচারক হতে গেলে, ফিল্মের পরিভাষা বুঝতে হয়। ছবির ক্র্যাফটকে বোঝার ক্ষমতা রাখতে হয়। ফিল্মের মাধ্যম নিয়ে বিশ্বের চলচ্চিত্রসাধকেরা যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন তার খবরও এর জন্যই রাখতে হয় যে সাহিত্য বা শিল্পকলার সাধকদের মত আমাদের দেশের ফিল্মের সাধকেরাও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিশ্বের চিন্তাশীল পরিচালকদের উদ্ভাবিত নতুনতর ধারা নিজেদের সৃষ্টিতে প্রয়োগ করে হয়ত আমাদের ফিল্মের মানও উন্নত করে তুলতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের বিচারকদের মধ্যে ক'জন সেরকম অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি নিয়ে বিচারাসনে বসেন? নামকরা সাংবাদিক, প্রশাসক, কথাশিল্পী, কার্টুনিস্ট আর সমাজসেবী ফিল্মের ভাল সমঝদার বা বিচারক ও হতে পারেন। অনেকের মতে, আদুর গোপাল-কৃষ্ণণ এবছর তাঁর 'অনন্তরম'-এ ফিল্মের নতুন শৈলী, নতুন পরিভাষা নিয়ে যে সার্থক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা উপেক্ষিত হয়েছে।

'অনন্তরম' নিয়ে বিশদ আলোচনার আগে, আসুন এবছর যে ছবিটি ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবির গৌরব অর্জন করেছে সেই 'হলধিয়া চরায়ে বাওধান খায়' ছবিটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। অসমীয়া ভাষায় 'হলধিয়া চরায়ে বাওধান খায়' মানে হলুদ চড়ুই বাওধান খেয়ে যায়। বাওধান আসামের এক বিশেষ সময়ের ধান। যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে চাষীর আশা ভরসা। জীবনে যখন বিপর্যয় আসে তখনই

বিজয়া মেহেতার 'পেস্টনজি'

রাজা মিত্রের 'একটি জীবন'-এ সৌমিত্র চ্যাটার্জি

এরকমটা হয়, হলুদ চড়ুই ধান খেয়ে যায়। 'অনন্তরম'-এর চেয়ে এই ছবির ক্র্যাফট বা ট্রিটমেন্ট নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের নয়। বক্তব্যের গুণেই যে জানু বরুয়ার এই ছবিটিকে বিচারকেরা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সেই বক্তব্য কি তাই দেখা যাক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে জানু বরুয়া আসামের বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক হোমেন বরগোঁহাইর গল্প অবলম্বনে তাঁর এই ছবিতে এক সামাজিক বৈষম্যের প্রতিচ্ছবিই আমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যার দরুন সহজেই বিচারকদের রায় ছবিটির প্রতি যায়। কিন্তু ব্যাপারটা তা হয়নি। ছবিতে আমরা পাচ্ছি এক গরীব চাষী রাখেশ্বর আর ধনী সনাতন শর্মার ব্যক্তিগত বিরোধের কাহিনী। রাখেশ্বর বোরা এক সরল চাষী। এক খণ্ড জমিই তার সম্বল। দুই সন্তান আর বউ তরুকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। বৃষ্টির পর রাখেশ্বর যখন জমির ফলন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চাইল, তখনই ধনী সনাতন এসে জানাল যে এই জমি রাখেশ্বরের বাপ যে বন্ধক রেখে গিয়েছিল তা আজও ছাড়ানো হয়নি। আসামের গ্রামীণ জীবনে মানুষের মুখের কথার গুরুত্ব অনেক বেশী। রাখেশ্বরের বাপ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে জমি ছাড়িয়ে নিয়েছিল। লেনদেন শেষ হয়েছিল মুখের কথায়। কিন্তু সনাতনের শঠতায় সেই কথার আর কোন মূল্য রইল না। বন্ধক রাখার কাগজপত্র সনাতনের কাছে আছে। কিন্তু বন্ধক ছাড়ানোর লিখিত কোন প্রমাণ রাখেশ্বরের কাছে নেই। ল্যাণ্ড সেটেলমেন্টের কেরানী রাখেশ্বরকে বলল সাব ডিভিশনাল কালেকটরের সঙ্গে দেখা করতে। এই এস-ডি-সি-ই সরকারের প্রতীক। বিচার তিনিই করবেন। কেস লড়তে যথেষ্ট খরচ হল, অনেককে ঘুষ খাওয়াতে হোল। বলদজোড়াও বেচতে হোল রাখেশ্বরকে। পড়াশুনো ছাড়িয়ে ছেলেকে চাকরের কাজ করার জন্য ঢোকাতে হোল মোড়লের বাড়িতে। ইতিমধ্যে এলো বিধানসভার নির্বাচন। প্রার্থী সনাতন। কালেকটরের কাছে আর্জি পেশ করেও কিছু হয় না,

মালয়ালম ছবি 'পুরুষার্থম'

মাথার আর ঠিক নেই রাখেশ্বরের। অভাবে অনটনে জর্জরিত মানুষটা একদিন রাগের মাথায় বউকে মারধোর করে ফেলল। বড় হয়ে ওঠা সন্তানেরা রাখেশ্বর থেকে দূরে সরে গেল। ঘুষটুস দিয়েও যখন রাখেশ্বর কালেকটরের সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হলো, তখনই একদিন এক দৃশ্য সৃষ্টি করে ঢুকে পড়ল কালেকটরের ঘরে। দেখা গেল, কালেকটর লোকটা সহানুভূতিশীল! সব শুনে তিনি যখন বুঝলেন, রাখেশ্বরের হাতে বন্ধক ছাড়িয়ে নেবার কোন লিখিত প্রমাণ নেই, অথচ গণতান্ত্রিক সমাজে লিখিত প্রমাণ ছাড়া কিছু হবে না, তখন সনাতনের কবল থেকে রাখেশ্বরকে বাঁচাতে তিনি এক রাজনৈতিক চাল চাললেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি পার্টির সনাতন শর্মাকে তিনি বোঝালেন যে রাখেশ্বরের জমির ওপর দাবিটুকু যদি তিনি ছেড়ে দেন, তাহলে ভূমিহীন রাখেশ্বরকে এই করুণা দেখাবার জন্য তিনি অনেক বেশী ভোট পেয়ে যাবেন। আর তাতে বিরোধীপক্ষও জব্দ হবে। কথাটার ওজন বুঝে সনাতন দাবি তুলে নিলেন।' তবে রাখেশ্বর কিন্তু কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হলো না। সে তার বলদ জোড়া খুইয়েছে, বউকে মেরে সমাজের এবং সন্তানদের কাছে হয়েছে অপাংক্তেয়, তার আর আছে কি? সনাতনের নির্বাচনী পোসটার ছিঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে বলে ওঠে সে—'জমি ফিরিয়ে দিলে বলেই কি তুমি আমার ভোট পাবে?'

ব্যক্তির শঠতায় আরেক ব্যক্তির দুঃখ ও বঞ্চনার গল্পই আমরা এই ছবিতে শুনতে পেয়েছি। মানব রহস্যের কোন নিগূঢ় কথা বা বৃহত্তর কোন সামাজিক সত্যের উম্ঘাটন নেই। সনাতন আর রাখেশ্বর কেউই উৎপীড়ক আর উৎপীড়িতের শ্রেণীরূপ নিয়ে আমাদের কাছে ভূমিহীন কৃষক সমাজের বৃহত্তর এক সামাজিক সমস্যার প্রতীক হয়ে উঠতে পারেনি। সেই গভীর দ্যোতনা ছবিতে নেই। যেমন ছিল শ্যাম বেনেগালের 'নিশান্ত'-এ গৌতম ঘোষের 'দখল'-এ বা প্রকাশ ঝা-র ছবি 'দামুল'-এ।

তবে একমাত্র শ্রেণী বৈষম্যজনিত মানুষের সংগ্রাম ও সাধনার কথাই ছবির বক্তব্যকে গভীর করে তা নয়। মানুষের অতলান্ত মনের রহস্য, তার স্বভাব ও প্রকৃতির উন্মোচনেও একটা ছবি গভীর হয়ে উঠতে পারে। যেমন হয়েছে আদুর গোপালকৃষ্ণণের 'অনন্তরম'-এ। এই ছবিটি অজয়ন নামে একটি ছেলের গল্প, একজন মানুষের কথাই আমরা শুনেছি, তবে শুনতে শুনতে পৌঁছে গেছি মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের সঙ্গে সময়ের ধারার সম্পর্ক নিয়ে এক নিগূঢ়তায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তির স্বরূপ, অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সামগ্রিক অস্তিত্বের বিশ্লেষণ 'অনন্তরম'-এ আদুর গোপালকৃষ্ণণ যে সিনেমাটিক লজিকে তুলে ধরেছেন তা দেখতে দেখতে তারকোভস্কির বই 'স্কালপিং ইন টাইম' এর কথা মনে পড়তে পারে। বিশ্বের বিখ্যাত এই চলচ্চিত্র সাধক সিনেমা শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর ধ্যান ধারণার কথা বলে গেছেন। 'অনন্তরম' অনেক বেশী ম্যাচুয়র এবং ভাবোদ্দীপক তো বটেই—আমাদের সিনেমার পটভূমিকায় এ ধরনের ছবি একেবারে নতুন। মৃণাল সেন ঠিকই বলেছেন: 'অনন্তরম'-এর কনসেপ্ট ও ট্রিটমেন্ট অত্যন্ত অরিজিন্যাল।

আদুরের আগের চারটি ছবি 'স্বয়ম্বরম', 'কোডিয়াট্টম', 'এলি পাত্থায়ম', আর 'মুখমুখম'-এর মত 'অনন্তরম'-এর মধ্যেও মানুষের জীবনসন্ধান কখনও ভাবালুতার জলোচ্ছ্বাসে সম্পৃক্ত হয় না। বরং এ যুগের যা ধর্ম, সেই বুদ্ধিকে জাগ্রত রেখেই ছবির স্বাদ নিতে হয়।

'অনন্তরম' বলতে বোঝায়—'তারপর'। যেমন গল্প বলতে গিয়ে অমরা বলি 'তারপর'! এই ছবিতে অজয়নের স্বগতোক্তিতে আমরা তার জীবনের দুটি গল্প শুনেছি। প্রথম গল্পে আমরা জানতে পারি অজয়ন মায়ের এক অবাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত সন্তান। শিশুর তীব্র কান্নার মধ্যে শুরু হয় ছবি। পরিত্যক্ত শিশুকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন এক সহৃদয় ডাক্তার। তবে তাঁর সহৃদয়তা সত্ত্বেও অজয়ন যেন সবার থেকে একলা হয়েই থাকে। কারণ যে সমাজে সে বড় হতে থাকে সেই সমাজ সাধারণ মানুষই চায়। কোন প্রশ্নবাহুল্য চায় না। বুদ্ধির আতিশয্য চায় না। ক্লাসে, খেলার মাঠে, আসরে, এমনকি প্রাক যৌবনে পা দিতে একটি মেয়েকে ভাল লাগার অভিব্যক্তিতেও অজয়নের সেই একই অভিজ্ঞতা। ওর বুদ্ধির প্রাখর্য, ওর অসম্পৃক্ত

পুরস্কৃত ওড়িয়া পরিচালক মনমোহন মহাপাত্র

প্রায়পরম্পর ওকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারো সঙ্গেই যেন সখ্যতা গড়ে তোলা, কোনো সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। ঘাটের সিঁড়ি গুনতে গিয়ে সংখ্যাটা সবসময় বেজোড় হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় গল্পে আমরা যে অজয়নকে পাই সে দুচোখে গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে কিছু স্বপ্ন নিয়েও বড় হয়েছে। পালক পিতার অবর্তমানে তাঁরই ছেলে অর্থাৎ অজয়নের বৈমাত্রেয় দাদার সানন্দ উৎসাহে সে কলেজে পড়েছে। একদিন বাসে নলিনীকে দেখে অজয়নের ভাল লাগে। রিয়ালিটি থেকে ওর মন কখন ইল্যুসনে চলে যায় আমরা জানতেও পারি না। যেন আমাদের তা জানাবার দরকারও নেই। পরিচালক যেন আমাদের বলতে চান রিয়ালিটি আর কল্পনার মধ্যে সীমারেখা কে টানবে! কল্পনাটাও কি রিয়ালিটির বাইরে? ওতো আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ। তাই ছবিতে অজয়নের অবচেতন মনের ক্রিয়ায় পরপর আমরা ইমেজকে আসতে দেখি। ইল্যুসন আর রিয়ালিটি একাকার হতেই আমরা দেখি অজয়ন সমুদ্রের ধারে নলিনীর সঙ্গে হাঁটছে। পরপর কিছু হাঁটার দৃশ্যে বোঝা গেল প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। আরেক দিন, অজয়ন বসে আছে নলিনীর পথ চেয়ে। বাসের পর বাস চলে যায় কিন্তু নলিনী আর আসে না। তাহলে কি নলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সমুদ্রের ধারে বেড়ানো সবই অবচেতন মনের প্রক্ষেপ? নলিনী কি শুধু ইল্যুসন? না কি বাস্তব, যে এসেও হারিয়ে গেল। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী আর বুদ্ধির প্রক্ষেপে ব্যাখ্যা করার সুযোগ যখন দর্শকদের কাছে অবারিত হয়ে ওঠে তখনই শিল্পও হয় মহত্তর। অজয়ন ফিরে যায় কলেজে তারপর ছুটিতে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কাছে, যে তখন বিবাহিত। সেখানে অজয়নের আরেক সঙ্কট। বৌদি সুমা হুবহু নলিনী। আসলে যে স্বপ্ন চরিতার্থ হলো না, অবচেতন মনের সেই ইল্যুসনের

পরীক্ষামূলক মালয়ালম ছবি 'ওরু মেমাসাম্পুলারিল'-এ শ্রী ও পার্বতী

নলিনী আর দাদার সুখের দাম্পত্য জীবনের প্রতীক সুমা মিলেমিশে একই ব্যক্তির রূপ নিয়ে ফেলে। অতীতের নলিনী বর্তমানের সুমায় একীভূত হয়ে যায়। চেতন ও অবচেতন মনে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের—এক কথায় সময়ের অবিরত ধারায় ব্যক্তির যে সামগ্রিক অস্তিত্ব গড়ে ওঠে, সেকথাই বোঝাবার জন্য পরিচালক ছবির শেষ দৃশ্যে আমাদের দেখান শিশু অজয়ন আবার ঘাটের সিঁড়ি গুনছে। তবে গুনতে গুনতে এবার আর সে বেজোড় সংখ্যায় এসে দাঁড়াচ্ছে না। আর তাইতো হয়, সময়ের ধারায়—আমাদের লক্ষ্যইতো পারফেকসনে পৌঁছোনোর।

আদুর গোপালকৃষ্ণণের এই ছবির ট্রিটমেন্ট ও থিম ব্যাখ্যা করে বোঝানো বড় শক্ত। কবিতার মতই সুন্দর ও রমণীয় এর শৈলী। হ্যাঁ কবিতা, তবে আধুনিক। যার আবেদন হৃদয়ে প্রজ্ঞায় ও বুদ্ধির দরজায়। তবে মজার ব্যাপার হোল, যাঁরা অত কথা বুঝতে চান না, তাঁরাও এই ছবি দেখে অজয়নের জীবনের একটা গল্প পেয়ে যাবেন। সৃষ্টির আরেক সার্থকতা এখানেও। শ্রেষ্ঠ ছবির স্বীকৃতি 'অনন্তরম' পেল না। তবে অনেকেরই বিশ্বাস, পরিণত বুদ্ধির এক ম্যাচিওরড ছবি হিসাবে 'অনন্তরম' বিচারকদের সামনে অবশ্যই এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

১৯৮৭—র শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রের পুরস্কার পেল গৌতম ঘোষের 'অন্তর্জলি যাত্রা'। শতকরা একশ ভাগ অর্থ সাহায্য যুগিয়ে ছবিটি প্রযোজনা করেছে এন·এফ·ডি·সি·। দুই ভাষায় ছবি। হিন্দীতে এর নাম 'মহাযাত্রা'। ছবিটি কান উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছে।

ফিল্মকে একান্তভাবে শিল্পের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে যাঁরা জীবন নির্ভর নবধারার ছবি তৈরির সাধনায় মগ্ন হতে চাইছেন সেই অল্প সংখ্যক পরিচালকদের মধ্যে গৌতম ঘোষ অন্যতম। তরুণ গৌতম এই সাধনার তাঁর একাগ্রতাই শুধু নয়, দক্ষতারও স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর বহু আলোচিত ও প্রশংসিত দুটি ছবি 'দখল' আর 'পার'—এ।

'অন্তর্জলি যাত্রা'তেও গৌতম তাঁর অসাধারণ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় আবার দিলেন। পরিচালক হিসাবে গৌতম এই ছবিতে আরও বেশী পারফেকট। আরও উচ্চাঙ্গের। গঙ্গা সাগরের এক বিরল বেলাভূমিতে লোকেশন নির্বাচন থেকে চিত্রনাট্য রচনা, দৃশ্যের কম্পোজিসন, ক্যামেরার টেকনিক্যাল পারফেকসান, শ্মশান ভূমির অনুপম পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিল্পীদের দিয়ে কাজ আদায় করা পর্যন্ত পরিচালকের সব কাজ এক কথায় অসাধারণ। সিনেমাটিক ট্রিটমেন্ট বা ক্র্যাফটের

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র ছবি 'ফেরা'-র একটি মুহূর্ত

দিক থেকে 'অন্তর্জলি যাত্রা' বিশ্বের সাম্প্রতিক ছবিগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান করে নেবার যোগ্যতা রাখে।

শুধু প্রশ্ন 'দখল' আর 'পার'–এর পর গৌতম 'অন্তর্জলি যাত্রা'য় এলেন কেন?

প্রায় রামমোহন রায়ের সমকালের পট-ভূমিকায় কমল মজুমদারের গল্প অবলম্বনে ছবিতে আমরা শুরুতেই দেখি অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সনাতনকে মৃত্যুর আগে গঙ্গার ধারে এক শ্মশান ভূমিতে এনে রাখা হয়েছে। মৃত্যু লগ্নে গঙ্গাস্পর্শে গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে এই প্রাচীন বিশ্বাসে। ব্রাহ্মণ প্রধান বলেই সনাতনের অন্তিমযাত্রায় আরও কিছু ব্রাহ্মণ শ্মশান ভূমিতে এসেছেন। এসেছেন ব্রাহ্মণ গনৎকার অনন্তও। তিনি সনাতনের রাশি চক্র মিলিয়ে দেখে শ্মশানেই ঘোষণা করলেন সনাতন একা যাবেন না, দোসর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কন্যাদায়গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ এই সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়ে প্রায় মৃত সনাতনের কাছে এসে নিজের ষোড়শী কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব রাখলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে উদ্ধার করতে রাজী হলেন সনাতন। শ্মশান ভূমিতেই সাজানো হোল বিয়ের আসর। পাল্কি চেপে বিয়ের বেশে এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হল যশোবতী। প্রথমটায় কিশোরী মেয়েটি দ্বিধাগ্রিতা। কিন্তু তাকে যখন বোঝান হল সনাতনের সঙ্গে সহমরণের পর যশোবতী আর সনাতন আবার জন্ম নিয়ে এই মর্তালোকে অনন্তসুখ ভোগ করবে এবং তাতে পরিবারের আর সকলেরও অশেষ কল্যাণ হবে, তখন যশোবতী বিয়ে করতে এবং সহমরণে যেতে রাজী হল। মুমূর্ষু বৃদ্ধ সনাতনকে কোনমতে বসিয়ে মাথায় টোপর পরিয়ে যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিবাহ কার্যটি সম্পন্ন করলেন। এরপর অবধারিত পরিণতির জন্য শুরু হল অপেক্ষা। সনাতন মরবে, সতী হবে যশোবতী।

এই বিধানের একমাত্র প্রতিবাদী শ্মশানের চণ্ডাল বৈজু। সে ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারছে না। এমন রূপ নিয়ে যশোবতী সতী হবে, পুড়ে মরবে এ কি করে হয়? বৈজু তো হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের শরিক নয়।

এদিকে সনাতন বিয়ে করে চাঙ্গা হতে শুরু করল। বৃদ্ধ এখনই মরছে না দেখে অন্য ব্রাহ্মণেরা ফিরে গেলেন। যশোবতীর বাপ শ্মশানে রেখে গেলেন চাল, ডাল, তেল, নুন। যশোবতী রান্না করে স্বামীকে খাওয়ায়। নিজে খায়। শেষ পরিণতির জন্য প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করে।

চণ্ডাল বৈজু যশোবতীকে পালিয়ে যেতে বলে। তবে যশোবতী তার সিদ্ধান্তে অটল। দুদিন যায়। সনাতন আরও চাঙ্গা হতে দুধ খেতে চান। দুধ আনতে এই জনশূন্য শ্মশান ভূমিতে যশোবতীকে যেতে হয় বৈজুর ঘরে। বৈজু আবার ওকে পালাতে বলে। তবে বৈজুর কথায় কান দেয় না যশোবতী। কচি মেয়েকে ভ্রান্ত আদর্শে অটল দেখে এক চাঁদনীরাতে বৈজু ঠিক করে সনাতনকে মেরে
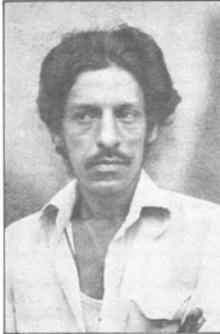
পরিচালক রাজা মিত্র

ফেলবে। প্রাণপণে বাধা দেয় যশোবতী। শুরু হয় বৈজুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি। নদীর ধারে আঠালো নরম মাটিতে ধস্তাধস্তি করতে করতে প্রাকৃতিক নিয়মেই দুই নারী-পুরুষ পরস্পরের দেহের কিনারায় পৌছে যায়। যুবতী যশোবতী এই প্রথম জীবনের অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত এক অমোঘ সুধা পান করে ফেলে।

তবু জীবন যশোবতীকে প্রলোভিত করে না। ব্রাহ্মণ কন্যা সহমরণের আদর্শে অবিচলিত থেকে যথারীতি স্বামী সেবা করে। অপেক্ষা করে মৃত্যুর। একদিন দুধ নিয়ে ফিরে আসার সময় যশোবতী কোন এক প্রগলভ মুহূর্তে হেসে ফেলে। সেই প্রথম হাসতে দেখি আমরা যশোবতীকে। দূর থেকে দেখেন সনাতন। বৈজুর সঙ্গে এই প্রগলভতায় যশোবতীকে কুলটাবলে ধিক্কার দিয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ। যশোবতীর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। বরং পরের দিনই যখন হঠাৎ বাধভাঙা বান এসে সনাতনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন তার 'ঠাকুর'কে বাঁচাতে গিয়ে যশোবতীও সনাতনের সঙ্গে জলসমাধি লাভ করে। বৈজু শত চেষ্টা করেও যশোবতীকে বাঁচাতে পারে না। ছবির শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি বিষণ্ণ সন্ধ্যায় এই ধূসর শ্মশান ভূমিতে একা বৈজু ক্ষোভে দুঃখে জানোয়ারের মত গোঙাচ্ছে।

গৌতম ঘোষের এই বিষয় নির্বাচন কিছু প্রশ্ন জাগায়। ছবিতে আমাদের কি ইতিহাসের এক বিষণ্ণ ঘটনা শোনানো হল? সেই সময়ের ইতিহাস যখন বৃটিশরা আইন পাশ করে সতীদাহ রুখতে চেয়েছে বলে ব্রাহ্মণ সমাজের কিছু গোড়াপন্থী ঘোরতর বিক্ষুব্ধ? না–কি শোনানো হোল সেই ইতিহাস যখন ভ্রান্ত আদর্শবশত মেয়েরা সতী হতে আপত্তি করত না?

আসলে একজন সাংবাদিক যা বললেন সেটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। 'সমস্ত ছবির মধ্যেই এক আপাদমস্তক 'সেনসেসানালিজম'। কচি এক যুবতী মেয়ে পঁচাশি বছরের এক ঘাটের মড়াকে বিয়ে করে সতী হয়ে স্বর্গে যেতে রাজী হল–বিদেশের প্রতিযোগিতায় বিচারকদের কাছে ভারতের এই দৃশ্য 'ট্রু–লি ইন্ডিয়ান এণ্ড ফ্যাবুলাস!' ···তাহলে কি লক্ষ্যটা বিদেশের স্বীকৃতি আর পুরস্কারের দিকেই? সমকালের মানুষের ভাবনা, প্রত্যয়, সংগ্রাম ও সাধনা নিয়েই তো শিল্পের পরিপ্রেক্ষিত সার্থক হয়। যদি শুধু ইতিহাসই তুলে ধরা ছবির উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও প্রশ্ন: সতীদাহের ইতিহাসে ক'জন মেয়ে স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়েছে?

বাংলা ছবি রাজা মিত্রের 'একটি জীবন' ১৯৮৭তে পরিচালকের প্রথম শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার পেয়েছে। রাজা মিত্রের এই ছবি কান উৎসবে পাঠাবার জন্য নির্বাচিতও হয়েছে। এই দুই স্বীকৃতি থেকেই ছবিটির গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে।

সাদামাটা পরিচ্ছন্ন ছবি। সুন্দরভাবে বুদ্ধদেব বসুর জোরালো কাহিনীটি ফিল্মের পরিভাষায় শুনিয়ে রাজা মিত্র আমাদের অভিভূত করে ফেললেন। এক মহৎ আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সংস্কৃত পণ্ডিত গুরুদাস ভট্টাচার্যের জীবন কাহিনী শোনার পর যখন তুলনা করে দেখি আমাদের এই শঠতা, প্রবঞ্চনা আর সস্তায় বাজীমাৎ করার যুগে এরকম মহৎপ্রাণের কত অভাব তখনই ছবিটি আরও ভাল লাগে। নিয়মনিষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত গুরুদাস ভট্টাচার্য একদিন বাংলা পড়াতে এসে দেখেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন 'ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন'। তুলনামূলক শব্দ হিসাবে 'চেয়ে' শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত পণ্ডিতকে ভাবিয়ে তুলল। চেয়ে দেখা মানেতো তাকিয়ে দেখা। 'চেয়ে' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হলো কেন? শুরু হল অনুসন্ধান। গুরুদাস জানতে পারলেন–পরিবর্তনশীল জীবনে মানুষ বলতে বলতে এমন অনেক কথা ভাষার সৃষ্টি করে ফেলেছে, যার ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার সঙ্গে হয়ত মিল নেই, তবে লোকে বলছে এবং এভাবেই ভাষা সমৃদ্ধ হচ্ছে, কলেবরে বাড়ছে। গুরুদাস ভট্টাচার্য খোঁজ নিয়ে এও দেখলেন যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্মত এমন এক অভিধান নেই যাতে নিত্য ব্যবহৃত অজস্র চলতি শব্দ যোগ করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঠিক করলেন নিজেই এক অভিধান লিখে মানুষের উপকার করে যাবেন। শুরু হলো ব্রত উদ্‌যাপনের মত এক নিবিড় সাধনা। বাধা এলো অনেক। মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিয়ের ক'দিন আগে মেয়ে টাইফয়েডে মারা গেল। ছেলের বিয়ে দিলেন। দুর্ঘটনায় মারা গেল একমাত্র জোয়ান ছেলে। নিঃসঙ্গ করে স্ত্রীও চলে গেলেন। কারো কাছ থেকে নিজের ব্রত উদ্‌যাপনে তেমন সমর্থন ও সাহায্য পান না। এক পাবলিশার

পাণ্ডুলিপি ছাপতে রাজী হলো, তবে অর্থের কিছু দায়িত্ব নিতে হবে গুরুদাসকে। তাই জমিটুকু বিক্রী করে ফেললেন গুরুদাস। পারিবারিক শোক, অর্থকষ্ট কোনো বাধাই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত যখন আধুনিক বাংলা অভিধান প্রকাশিত হল তখন বৃদ্ধ গুরুদাস রিক্ত, অবসন্ন এক শরণার্থী। বঙ্গীয় পরিষদ থেকে সাড়ম্বরে ক'জন এলেন ওঁকে মানপত্র দিয়ে সম্মান জানাতে। যে মহৎ প্রয়াসে গুরুদাস সমাজের কাছ থেকে তেমন সাহায্য ও সমর্থন পাননি সেই সমাজ যখন এসে দাঁড়াল মহৎ কাজের গৌরবের ভাগ নিতে, তখন বৃদ্ধ গুরুদাস বিধবা বউমাকে বললেন একটু আড়াল করে দাঁড়াতে। ওদের মানপত্র উনি ফিরিয়ে দিলেন।

'একটি জীবন'-এর কথা শুনে আমাদের এরকম আরও মহৎ ব্যক্তিত্বকে দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগে, ছবির সার্থকতা সেখানেই। রাজা মিত্রের চিত্রনাট্যের গুণই গুরুদাস ভট্টাচার্যের সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনীটি আমাদের এমন অভিভূত করে। এই ছবির এক বড় সম্পদ সৌমিত্র চ্যাটার্জীর অভিনয়। সৌমিত্র যে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম তা আবার প্রমাণ করেছেন।

এ বছরের শ্রেষ্ঠ হিন্দী ছবি হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে বিজয়া মেহতার 'পেস্টনজী'। এই ছবিরও পুরোপুরি প্রযোজক এন·এফ·ডি·সি·।

কেউ কেউ বলেন যে-কোনো ভাল ফিচার ফিল্ম যদি জীবন নির্ভর হয় তাহলে তা এক ভাল ডকুমেন্টারীও। 'পেস্টনজী'-তে দেশের পারসী সমাজের জীবনধারা, তাঁদের পোশাক আসাক, তাঁদের রীতিনীতি, বিয়ে, মৃত্যু, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর এক নিখুঁত ছবি বিজয়া মেহতা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পারসী সমাজকে যাঁরা ভাল করে জানেন না, তাঁরা এই ছবি দেখলেই এঁদের সম্বন্ধে অনেকটা জেনে যাবেন।

পরিচালিকা বিজয়া মেহতা নিজেই এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। আর একাজে তিনি অত্যন্ত সফল বলেই অন্তর্মুখ পিরোজের জবানীতে পেসি অর্থাৎ পেস্টনজী, পিরোজ, জেরু আর সুনু-এই চারটি প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্কের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী আমরা তন্ময় হয়ে শুনেছি বলব না, দেখেছি। কারণ এই ছবির ভিজুয়াল ইমপ্যাক্ট কথার চেয়ে অনেক বেশী।

পিরোজ এই ছবির কেন্দ্রবিন্দু। সবটাতেই ওর অভিযোগ লেগেই আছে। পেসি বা পেস্টনজী ওর শৈশবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্তর্মুখী পিরোজ আর বহির্মুখী পেসির এই কাহিনীর তিন ভাগ। প্রথম ভাগে আমরা দেখি প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই দুই বন্ধু বিয়ে করার কথা ভাবছে। ঘটক পাত্রীর সংবাদ নিয়ে এল পিরোজের কাছে। পাত্রীর নাম জেরু। জেরুর রূপ দেখে অন্তর্মুখী পিরোজ মনে মনে বলে: এত সুন্দরী মেয়ে আমার জন্যে! সময় চেয়ে নিয়ে পিরোজ ভাবতে বসে। তবে জেরুকে সে তৎক্ষণে হৃদয়ের আসনে বসিয়ে ফেলেছে। স্বভাবে ভিতু বলেই পিরোজ সিদ্ধান্ত নিতে যখন ইতস্তত শুরু করল তখন পেসি প্রায় ঝাঁপিয়ে এসে বিয়ে করে বসল জেরুকে। পিরোজ বন্ধুর সিদ্ধান্ত নীরবে মেনে নিল। বোম্বাই থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল ভুসাওয়ালে।

দেখা গেল, পেসি আর জেরু দুজন দুই ধাতের। পেসি বেপরোয়া উচ্ছল, জেরু কেমন নার্ভাস। সব সময় বিষণ্ণ। দরজা জানলা বন্ধ করে রাখতে ওর ভাল লাগে। বাচ্চাকাচ্চা একেবারে অপছন্দ। হাস্যময়ী সুনা জেরুরই বন্ধু। ওকালতি করে। বিধবা। সুনা প্রথমটায় কাজ উপলক্ষে পরে পেসির আকর্ষণে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করল। এক মন্তাজ সিকোয়েন্স দুই বন্ধুর পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ দেখানো হলো। এই সিকোয়েন্সে আমরা দেখলাম পিরোজ এখনও জেরুকে ভালবাসে। ওকে ভোলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। পেসির চিঠি এল। জেরু অন্তঃস্বত্বা। ছুটি নিয়ে পিরোজ বোম্বাইতে এলো জেরুর বাচ্চাকে দেখতে।

এসে দেখে ততদিনে জেরু ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেছে। বাচ্চাটা হওয়ার আগেই ভ্রূণ নষ্ট করা হয়েছে। পেসি ভীষণ উৎক্ষিপ্ত। পিরোজ ব্যথিত হলো জেরুর জন্য। তবে আবিষ্কার করল পেসি ঢলেছে সুনার দিকে। দুই বন্ধুর মধ্যে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। পেসি জানাল ওর অনন্ত নিঃসঙ্গতায় সুনাই সান্ত্বনা। জেরুর দুঃখে বিপর্যস্ত পিরোজ ফিরে গেল এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে সে জীবনে আর পেসির মুখ দেখবে না।

কাটল তিন বছর। তিন বছরে বন্ধুকে বুঝিয়ে বদলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল পিরোজ-শুধু জেরুর দুঃখের কথা ভেবে। তবে পেসি বদলাল না। নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে লিখল-তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

পিরোজ বোম্বাইতে ফিরে এলো ট্রান্সফার নিয়ে। দুই বন্ধুর মিলন হল দীর্ঘদিন পর। অনেক কথা হলো। পুরোন দিনগুলোয় ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো। পরের দিন সকালে খবর এলো পেস্টনজী-পেসি হার্ট এটাকে মারা গেছে।

জেরু আরও তীক্ত আরও বিষণ্ণ আরও নীরব হয়ে গেছে। পিরোজ দেখে, ওর ব্যক্তিত্ব মানসিক অবসাদের মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সুনার একটি ছেলে হয়েছে। এই সন্তান পেসিরই দান। ওর নাম রাখা হয়েছে পিরোজ।

একান্তভাবে মানব সম্পর্কের এই সুন্দর গল্পটি লিখেছে বি·কে· করঞ্জিয়া। সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষতার সমারোহ ঘটেছে বলেই ছবিটির সমস্ত বিভাগের কাজ এত উচ্চাঙ্গের হতে পেরেছে। ক্যামেরার দায়িত্ব নিয়েছেন '২৭ ডাউন' ও অন্য আরও অনেক ছবির সার্থক ক্যামেরাম্যান এ·কে· বীর, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বনরাজ ভাটিয়া, যাঁকে এ বছর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের সম্মান জানান হয়েছে। আর এডিটিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বাস্ত এডিটর রেণু সালুজা। বনরাজ ভাটিয়া অবশ্য শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচনার পুরস্কার পাচ্ছেন টি·ভি· সিরিয়ালের সেই বহু আলোচিত ছবি গোবিন্দ নিহালিনীর 'তামস'-এর জন্য। 'তামস' এবছর জাতীয় সংহতির ওপর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে নার্গিস দত্ত পুরস্কার পেয়েছে।

ভারতীয় সিনেমায় নতুন ধারা প্রবর্তনে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে পুণা ইনস্টিটিউটের কিছু প্রতিভাবান ছাত্রের। আদুর গোপালকৃষ্ণণ, গিরীশ কাসারাবল্লী, কেতন মেহতা, কুন্দন শাহ, সৈয়দ মীর্জা, মনি কাউল, জানু বড়ুয়া, মনমোহন মহাপাত্র, কে·আর· মোহনন, তনবীর আহমেদ এবং আরও অনেকে পরিচালক ভারতীয় সিনেমাকে কমার্শিয়াল ক্লিষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়ে শিল্পের স্তরে উঠিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এঁদের অনেকেই ছবি করেছেন হিন্দী ভাষায়। তারপর যে দুই ভাষায় নব ধারার ছবি সবচেয়ে বেশী হয়েছে তা হলো বাংলা আর মালয়ালম। মালয়ালম ছবি এ পর্যন্ত চারবার ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেয়েছে। মালয়ালম ভাষায় ছবি করে এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান তিনবার করে পেয়েছেন আদুর গোপালকৃষ্ণণ আর জি· অরবিন্দন।

দেখে ভাল লাগল বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এখনও আনকম্প্রোমাইজিং। পরিচালক হিসেবে উনি ওঁর নিজের এক আলাদা ইমেজ বজায় রাখতে পেরেছেন। ওঁর প্রথম ছবি 'দূরত্ব' থেকে 'নিম অন্নপূর্ণা', 'গৃহযুদ্ধ', 'শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি' ও "অন্ধী গলি' পর্যন্ত ওঁর সব ছবিতেই উনি একান্তভাবে জীবন নির্ভর। ওঁর দেখা পরিচিত জীবনের কুশ্রীতা, অক্ষমতা ও অবক্ষয়-এসবই ওর ছবির বিষয়। আর সব ছবিতেই উনি যুগের কথা বলেছেন সিনেমার আধুনিক পরিভাষায়। তাই খুব সঙ্গতভাবেই ওঁর ছবি 'ফেরা' বার্লিন উৎসবের প্রতিযোগিতায় পাঠানো হচ্ছে। ছয় বছর পর এই প্রথম এক ভারতীয় ছবি যোগ দিতে যাচ্ছে বার্লিনে।

এমনি আরেকটি শিল্প সম্মত পরিচ্ছন্ন ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন নবেন্দু চ্যাটার্জী। ছবির নাম 'সরীসৃপ'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় কাহিনীর এমন সার্থক চিত্রায়ণ আবার একথাই প্রমাণ করল, যে কোনো ভাল ফিচার ফিল্ম এক ভাল গল্পেরই পূর্ণতৃপ্তি। নবেন্দু চ্যাটার্জীও নবধারার এক একনিষ্ঠ পরিচালক।

নবধারার ছবির অনেক কমিটেড চলচ্চিত্র সাধকই এখন তাঁদের কমিটমেন্ট থেকে দূরে সরে গিয়ে গ্ল্যামার আর সেনসেশনালিজমের চোরাবালিতে পথ হারাতে বসেছেন। তবে ভরসা এই আদুর গোপালকৃষ্ণণ, অরবিন্দন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গিরীশ কাসারাবল্লী, সৈয়দ মীর্জার মত পরিচালক এখনও আছেন। এবং গৌতম ঘোষ, জানু বড়ুয়া, উৎপলেন্দু আবার আমাদের ভাবিয়ে তোলার মত ছবি নিশ্চয়ই উপহার দেবেন। নবধারার আরেক নতুন ধারা হয়ত আবার অন্য এক রূপ নিয়ে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে নতুন আরেক অধ্যায়ের সূচনা করবে।

দিব্যেন্দু গুহ

'আখরি আদালত'-এ সোনম-'শরীর প্রদর্শনে কোনও ভনিতার প্রয়োজন নেই'

৭৮ পৃষ্ঠার পর

সুযোগ দিচ্ছেন না? এ সব কথা হাস্যকর।'

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বিতীয় বিয়ে বা একসট্রা এফেয়ারের ব্যাপারে আপনার মত কি?

'দেখুন বিয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। আমি তো ঠিক করেছি বিয়েই করবো না। তবে প্রতিটি মানুষেরই সুখে থাকার অধিকার আছে। সেক্ষেত্রে একজন মানুষ যদি একটা বিয়েতে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতেই পারে, বা তার নিজের শান্তির জন্য অন্য কারো সাথে এফেয়ারে জড়িয়ে পড়তেই পারে, এতে আমি তো কোন দোষ দেখি না।'

সোনমের প্রিয় রং হলুদ। তবে পোশাকের ক্ষেত্রে যে কোন ভাল পোশাকই পছন্দ করেন। ব্রুস স্প্রিংস্টিন ম্যাডোনা সোনমের প্রিয় গায়ক গায়িকা। তাঁর মতে এঁরা খুবই উঁচুমানের সঙ্গীতজ্ঞ। চাইনীজ খাবার খেতে পছন্দ করেন সোনম।

শোনা যায় আপনি নাকি ভনিতা খুব পছন্দ করেন?

মুচকি হাসেন সোনম। 'হ্যাঁ নিজের সম্পর্কে আমারও তেমন ধারণা আছে। তবে শুধু আমি নই-এখানে আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি সময়ে প্রয়োজনে এটা করি। একরকম বলা যায় করতে হয়।'

সমকামিতা ব্যাপারটি কেমন লাগে? এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি?

প্রশ্ন শুনে চোখে চোখ রাখলেন সোনম। বেশ অস্বস্তির সুরে বলে গেলেন দু'চারটি কথা। তাঁর মতে ব্যাপারটি খুবই নোংরা। 'এ সব আমি ভাবতেই পারি না। ভাবলে বমি আসে। তবে আমার মনে হয় নারীদের থেকে পুরুষরাই বেশি সমকামিতায় ভোগে।'

বয়স খুবই কম। এজন্য সোনমের ফিগার নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। শরীর ফিট রাখেন কিভাবে? জানতে চাওয়া হলে সোনম হেসে ফেলেন। দীর্ঘ আয়ত দুই চোখে আসে আত্মতৃপ্তির আবেশ।

'সত্যি বলতে কি আমার ব্যায়াম ট্যায়াম করার প্রয়োজন হয় না। এমনিতে আমার ফিগার ভাল সকলেই বলেন। তার উপর বয়স কম। এখনও শরীর নিয়ে তেমন চিন্তার জট আসেনি।'

সোনমের প্রিয় অভিনেত্রী কে? জানতে চাওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন 'রেখা'। এরপর এক নিঃশ্বাসে রেখার প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর মতে রেখার মত সুন্দরী আর একজনও এখন হিন্দি ফিল্মে নেই। রেখা এই বয়সেও যেভাবে নিজের ফিগার ঠিক রেখেছেন এটা ভাবতেই তাঁর আশ্চর্য লাগে। রেখার প্রশস্তির মধ্যে হারিয়ে যান সোনম। শেষে যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর-'হায় যদি আমার চোখ দুটোও রেখাজীর মত হতো।'

প্রিয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভের 'দীবার'-এর অভিনয় দেখে সোনম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অমিতাভের সঙ্গে কাজ করছেন 'ইন্সানিয়াত' ছবিতে। তাঁর মতে গুরু দত্তের মত অত বড় অভিনেতা আজও যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে সে বিনা পয়সাতে ওঁর সঙ্গে ছবি করতেন।

একরাশ ছবির শুটিং এর মধ্যে এখন ডুবে আছেন সোনম। তথাপি ছুটির দিন তো অন্য দিনগুলি থেকে আলাদা। এই সমস্ত ছুটির দিনে বা শুটিং-এ যখন একদম ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি একান্তে গান শোনেন। গান তার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত নিঃসঙ্গতাকে দূর করে দেয়।

দু'চোখে স্বপ্নের ইমারত সাজিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন সোনম। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হলে বেশ কিছুটা আত্মস্থ হয়ে পড়েন-'আমার কেরিয়ারই আমার স্বপ্নের জাদু স্পর্শ। সেই গাঢ় স্পর্শের জন্য কাজ করে চলেছি। কেরিয়ারের দিকেই আমার এখন প্রথম লক্ষ্য। আমি নিজেকে একজন সফল নায়িকা হিসেবে প্রমাণ করতে চাই।'

সুন্দরী সোনমের কামনা বাসনার এই কথাগুলি যেন তাঁর আত্মবিশ্বাসের সুর শুনিয়ে দেয়। 'আখরি গুলাম' এ অভিনয় করছেন মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে। এই সব ছবি ছাড়াও 'আখরি আদালত', 'পত্থর কি ইন্সান,' 'না-ইন্সাফ,' 'এ্যাকশান' প্রভৃতি ছবিতে চুটিয়ে কাজ করে চলেছেন দুরন্ত সোনম।

খুব তাড়াতাড়িই সোনমের বেশ কয়েকটা ছবি রিলিজ করছে। ফিল্ম ইউনিটে পরিচিত নাম সোনম কিভাবে বড় পর্দার দর্শকের মনে জায়গা করতে পারেন তারই প্রতীক্ষা এখন।

বম্বে ব্যুরো

চাংকি পাণ্ডে ও সোনম

ছবি: ধরম দুলচন্দানী

৬৭ পৃষ্ঠার পর

পেপার দিয়ে আপাদমস্তক মোড়া রয়েছে একটি মৃতদেহ। মোটা নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। মৃতদেহটিকে বাঁধার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, যে সেটির অবস্থা খারাপ। অজয়বাবু ছেলের মৃতদেহ দেখতে চাইলেন। কিন্তু ইন্দ্রনীল আর অন্যান্য বন্ধুরা তা দেখাতে কিছুতেই রাজি নয়। বলে কি আর দেখবেন?

অজয়বাবু বললেন, তবু একবার দেখতে চাই।

জোর করায় শেষ পর্যন্ত ওরাই মুখের কাছে পলিথিন পেপারটি সামান্য সরাল। মুখটা বিকৃত। অমিতাভের মুখের সঙ্গে এর সামান্যতম মিল পর্যন্ত নেই। মাথায় কোন সেলাই নেই। তার মানে স্কাল ওপেন করা হয় নি? অথচ পোস্ট মোর্টেমে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হল স্কাল ওপেন করা!

সন্তানের শোকে হতবুদ্ধি মা-বাবা যে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ইন্দ্রনীল আর শুভাশিস পুলিশ স্টেশন থেকে সইসাবুদ করে মৃতদেহ নিল। সরকারের অনুমোদিত নয় এমন একটি শ্মশানে মৃতদেহটি তড়িঘড়ি দাহ করে ফেলল—অমিতাভের ছয় ডাক্তার বন্ধু, হোটেলের ম্যানেজার অমল বোস, চন্দ্রশেখর হোতা, সুকান্ত হালদার এবং পঞ্চপাড়া গ্রামের অঞ্চল প্রধান চিন্তামণি রাউত ও কয়েকজন গ্রামবাসী। অজয়বাবুর আকুল অনুরোধ সত্ত্বেও ইন্দ্রনীল মৃতদেহের কোন ছবি তোলার ব্যবস্থা করেনি, এমন কি সন্তানহারা পিতামাতার হাতে ছেলের অস্থিটি পর্যন্ত তুলে দেবার দায়িত্বটুকু পালন করে নি কেউ।

২৭ তারিখ রাতে প্রায় তিনটের সময় শূন্যহাতে কলকাতায় ফিরে এলেন ডাঃ অজয় বসু আর তার স্ত্রী। তাদের একমাত্র সন্তান অমিতাভ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র অমিতাভ বসু ভিন প্রদেশেই হারিয়ে গেল চিরদিনের মত।

কিন্তু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পেড্রিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের ছাত্র এবং কলেজের হাউস স্টাফ, হোস্টেল 'বনফুল'—এর ২০ নং ঘরের ডাঃ অমিতাভ বসুর রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে শুরু হল এক নতুন নাটক। চাঁদিপুরের আনন্দময়ী হোটেলের পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে অমিতাভের মৃত্যু হয়েছে একথা ঘোষণা করা হলেও নির্দিষ্ট কিছু অসংগতি—সূচক কারণে এই বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে বাবা ডাঃ অজয় বসুর মনে। অমিতাভের মৃত্যুর ব্যাপারে তার বন্ধুদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, দ্রুত মৃতদেহ সৎকার, রহস্যজনক পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিপরীত বক্তব্য, হোটেল কর্তৃপক্ষের অভাবিত ব্যবহার—এর পরিপ্রেক্ষিতে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তিনি চক্রান্তের অভিযোগ আনেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ৬ জন ডাক্তারের বিরুদ্ধে। কলকাতা এবং উড়িষ্যার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট দিয়ে তদন্ত করিয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছন যে তাঁর ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। অমিতাভের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িয়ে থাকে

বাঁদিক থেকে: ইন্দ্রনীল, শুভাশিস, চিরঞ্জীব, তারক, অমিতাভ, কাঞ্চন।

পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা দুটি প্রদেশের প্রশাসন বিভাগ, ডাক্তার, হোটেল কর্তৃপক্ষের প্রসঙ্গ। ১২·২·৮৮ তারিখে ডাঃ অজয় বসু বহু বাজা থানায় অমিতাভের সহকর্মী কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছয় ডাক্তাদর ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, অভিজিৎ দত্ত, তারক নাথ ব্যানার্জী, শুভাশিস ব্যানার্জি, কাঞ্চন কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কেস নং ৬২, তাং ২৬·২·৮৮।
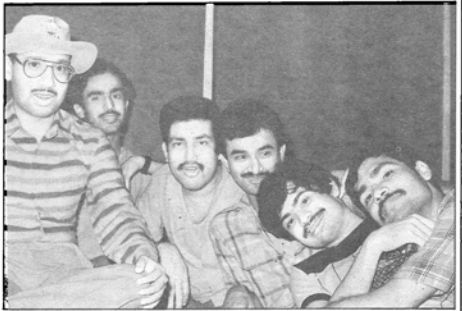
এছাড়াও তিনি ৭·১০·৮৭ তারিখে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়ক, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং প্রমুখকে ছেলের তথাকথিত মৃত্যুর ব্যাপারে সঠিক তদন্তের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টনায়ক সহ সকলেই চিঠির উত্তর দিলেও পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এ বিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব থাকেন। ডাঃ বসুর অভিযোগ—জ্যোতি বসুর কাছ থেকে কোন সহানুভূতি সূচক বার্তাও এসে পৌছয় নি। ডাঃ বসু আদালতে আরও অভিযোগ করেন—পুত্র অমিতাভ বসুর তথাকথিত রহস্যময় মৃত্যুর তদন্ত গাফিলতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পুলিশ কমিশনার, লালবাজার, উড়িষ্যার বালেশ্বর এস পি, ডি আই জি, কটকের ডি আই জি–সি আই ডি বিভাগও জড়িত। ইউ এস ৩৬৪/৩০২/১৪৯/৩৪/১২০ বি ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে অভিযোগ নথিযুক্ত করা হয়েছে। লালবাজার পুলিশ এই কেসটাকে উড়িষ্যার ঘাড়ে চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাইছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কোর্টে আবেদন করেন যাতে ১৮·২·৮৮ তারিখের দাখিলকৃত পিটিশনকেই

তিনি ৭·১০·৮৭ তারিখে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টপনায়ক, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং প্রমুখকে ছেলের তথাকথিত মৃত্যুর ব্যাপারে সঠিক তদন্তের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়ক সহ সকলেই চিঠির উত্তর দিলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব থাকেন।

মহিলাদের একমাত্র সম্পূর্ণ পত্রিকা

মনোরমা

জুলাই ১৯৮৪
মূল্য ৬·০০

গৃহশিল্প
বিশেষ সংখ্যা
গৃহকর্মনৈপুণ্যের
শিল্পকোষ

প্রচ্ছদকাহিনী

বর্তমান বঙ্গসমাজ বধূ ও বিধবাদের জতুগৃহ?

দ্রৌপদী সমেত
পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারতে
কৌরবরা গড়েছিল জতুগৃহ,
হালফিলের বাঙালি
সমাজ কি গৃহবধূ ও বিধবাদের
জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিত্তবান
পরিবারে সামাজিক
অন্যায়ের জতুগৃহ বানিয়ে
রেখেছে?
জীবন্ত সতী বানাতে
বিধবাদের ওপর কিভাবে
ধর্মীয় শোষণ চালানো হচ্ছে?
আধুনিকতার আড়ালে
সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বে ঘুণধরা অবক্ষয়ী
বঙ্গসমাজের আজকের
রিপোর্ট।

গৃহশিল্প শিক্ষার ১০০ নির্দেশিকা

গ্রীটিংস কার্ড, উপহারবন্ধনী, টুকরো কাপড়ের কারুকাজ, আলপনার বাহার, সুপার গ্রাফিক্স, ইকেবানা, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, কাঁথাস্টিচের কাজ, প্যাচওয়ার্কের নতুনরূপ, এপ্লিকের বাঁকুড়ার ঘোড়া, ফ্যাব্রিক পেন্টিং, অ্যাপ্রন ও দস্তানা তৈরি, কোলাজের ওয়াল হ্যাঙ্গিং, ফুল পাতা শুকতে ইত্যাদি।

কলকাতায় হাতের কাজ শেখানোর স্কুলগুলি

সল্টলেকের 'অনন্যা', বেহালার 'তৈরি', গড়িয়াহাটের 'নারীসেবা' ধর্মতলার 'ওয়াই·সি·এ', বাগবাজারের 'শাকাম্বরী', বালিগঞ্জের 'সরোজিনী শিল্প বিদ্যালয়' যোধপুর পার্কের 'শিক্ষা সংসদ' প্রমুখ মেয়েদের হস্তশিল্প শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কিভাবে মেয়েরা হাতের কাজ শিখছেন? এসব শিখেই কি ঘরে বসে আয় করা যাবে? মেয়েদের অর্থনৈতিক মুক্তির বাস্তবপথটি নিয়ে পর্যালোচনা।

নারী ভাবের না ভোগের সম্পত্তি?

নারী ভাবনার বিশ্লেষণধর্মী বিতর্কে এই প্রথম গোলটেবিলে মুখোমুখি হয়েছেন মোহনবাগান, মহামেডান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলোয়াড়রা।

কর্মরতা মেয়েদের গৃহসমস্যা ও কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে বৃহত্তর কলকাতায় আসা কর্মরতা মেয়েদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। ব্যক্তিগত লেডিজমেস ও সরকারি লেডিজ হোস্টেলগুলিতে মেয়েদের নিরাপত্তা কতটা? খাওয়াদাওয়া কতটা সুষম? অসহায় কর্মরতাদেব আবাসের জন্য সরকারি উদ্যোগ কি কি? বিভাগীয় কর্মকর্তা ও আবাসন মন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নগর কলকাতার জ্বলন্ত সমস্যার দিকে আলোকপাত।

'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনে গৃহকর্মনিপুণার কদর কেন?

কলকাতার বিত্তবান ও সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারগুলিতে কয়েকজন গৃহকর্ত্রী ও বিবাহযোগ্য পাত্ররা বলেছেন তাদের একান্ত পছন্দের কথা।
এর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসব, ঠাকুরবাড়ির বাদলভোজ, ছুটির দিনে শ্রীদেবী, ক্রেপ-ডি-শীন শাড়ি, যোগাভ্যাস, সংগীত শিক্ষা, দিগদর্শীয় দিগদর্শন ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

মনোরমা গৃহশিল্প বিশেষ সংখ্যা

কমবাজেটে ঘর সাজানোর সহজ দিকনির্দেশিকা।

কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এফ·আই·আর মেনে নিয়ে পুনরায় তদন্ত শুরু করে।'

১৯·২·৮৮ তারিখে সি ১৯৫ নং কেসে এটি রেজিস্টার্ড হয় কলকাতা পুলিশের লালবাজারস্থ ডি·সি·, ডি·ডি·–র দপ্তরে।

মৃত্যুর প্রায় আট মাস পরে কৃতী ডাক্তার অমিতাভ বসুকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হলেও আসল ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। মেডিক্যাল কলেজের হাউস স্টাফদের হোস্টেল 'বনফুল'–এর ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য সহ কয়েকজন ডাক্তার ঠিক করে তারা উড়িষ্যার চাঁদিপুরে বেড়াতে যাবে। সেইমত ৪৯ নং গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু, কলকাতা–১৩ অফিস থেকে এজেন্ট সুকান্ত হালদারের কাছে আনন্দময়ী হোটেলের চারটি ঘর বুক করে। পরিকল্পনা মত অমিতাভ ও তার ছ'জন সহকর্মী বন্ধু ১৬ সেপ্টেম্বর চাঁদিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭। ঘড়িতে তখন সকাল ৯টা। হঠাৎই বালেশ্বর সরকারি হাসপাতাল থেকে ট্রাংককল এল অমিতাভের খড়দার বাড়ির ঠিকানায়। অমিতাভের বাবাও পেশায় ডাক্তার। কাঁচাপাড়া রেলওয়ে হস্পিটালের ডি·এম·ও। তিনি ড্রাগ ল্যান্ড ওষুধের দোকানে নিজস্ব চেম্বারে রোগী দেখছিলেন। বাড়িতে অমিতাভর মা গায়ত্রীদেবী ছেলের জন্য নারকোল নাড়ু বানাচ্ছিলেন। অমিতাভ নাড়ু খুব ভালবাসে। ২৮ তারিখে ছেলের চাঁদিপুর থেকে সোজা বাড়ি আসার কথা। তিনিই ট্রাংক কল রিসিভ করেন। অমিতাভের বন্ধু ফোনে ডাঃ বসুকে চায়। গায়ত্রীদেবী বলেন, তিনি চেম্বারে চলে গেছেন। ইন্দ্রনীল দোনোমোনো করে জানায়–মাসীমা, একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আজ সকালে আমরা সমুদ্রে স্নান করতে যাই। সে সময়ে অমিতাভ সমুদ্রে ডুবে যায়। আমরা ওকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। এখন ও ভালো আছে।

ছেলের দুর্ঘটনার খবরে গায়ত্রীদেবী কান্নাকাটি শুরু করে দেন। দুঃসংবাদ পেয়ে অজয়বাবু বাড়িতে এসেই বালেশ্বর সরকারি হাসপাতালে ট্রাংককল বুক করেন। ইন্দ্রনীলই ফোন ধরে। অজয়বাবু ঘটনা কি ঘটেছে জানতে চান। ইন্দ্রনীল বলে–অমিতাভ আজ সকাল ৭·৩০ মিনিট নাগাদ হোটেলের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়।

–ওকে কি কোন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে?

–হ্যাঁ, ডাক্তাররা আছেন। ট্রিটমেন্ট চলছে। ও ভালো আছে।

চাঁদিপুর গিয়ে অজয়বাবু অমিতাভর বন্ধুদের ব্যবহার আশ্চর্যান্বিত হন। তাদের বক্তব্যগুলিও কেমন পরস্পর বিরোধী মনে হয় ডাক্তারের কাছে। থানায় ছেলের মৃতদেহ দেখতে চাইলেও তারা তা সম্পূর্ণভাবে দেখাতে চায় না। অজয়বাবুর জেদাজেদিতে যখন মৃতদেহের মুখটুকু তারা খোলে, তখন দেখা যায় অমিতাভর মুখের সঙ্গে মৃতের বিকৃত মুখের কোন সামঞ্জস্য নেই। ডাক্তার হিসাবে অজয়বাবু জানেন এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন মুখ এভাবে বিকৃত হতে পারে না। মৃতদেহ মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে পোস্টমর্টেম করা হয়ে গেছে শুনে তিনি রীতিমত আশ্চর্য হন। ইন্দ্রনীল বলে–'ডেড বডির অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া আগামী কাল রবিবার। পোস্টমর্টেম বন্ধ থাকবে। পোস্টমর্টেম হতে হতে সোমবার লেগে যাবে। তাই আজই পোস্টমর্টেম করিয়ে নিয়েছি।'

ইন্দ্রনীলের কথায় অজয়বাবুর প্রথম সন্দেহ হতে শুরু করে। কারণ ২৭ সেপ্টেম্বরই ছিল রবিবার। মৃতদেহের মাথাটি দেখে সে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। অজয়বাবু লক্ষ্য করেন ডেড বডির স্কাল ওপেন করা হয় নি। জলে ডোবা মৃতদেহের ক্ষেত্রে যা অবশ্যই করণীয়।

সহকর্মী বন্ধুদের তো বটেই, দেখা যায় পুলিশের বক্তব্য, ডাক্তারের রিপোর্ট, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, হোটেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সব কিছুই অসংলগ্ন।

বালেশ্বর সরকারি সহস্পিটালের মেডিক্যাল অফিসার সি আর দাস জানান–২৭·৯·৮৭ তারিখ কসাল ন'টার সময় ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ও শুভাশিস ব্যানার্জি নামে দুই যুবক একটি মৃতদেহ নিয়ে আসে। মৃতের নাম এন্ট্রি হয় অমিতাভ বসু, পিতার নাম অজয় বসু। কেস নং ৪৯/৮৭'। ওড়িশার সি আই ডি অফিসারের জেরায় তিনি বলেন–ওইদিন একটি মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল ঠিকই তবে তাকে কোন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় নি। কিন্তু ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য বলে অমিতাভকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। এদিকে অমিতাভের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয় একটি ৩২ বছরের হৃষ্টপুষ্ট সুগঠিত যুবক জলে ডুবে মারা গেছে। রিপোর্টে বলা হয়–দ্য কাজ অব ডেথ অ্যাজ এসফাইক্সিয়া ফলোয়িং একসিডেন্টাল ড্রাউনিং। অথচ রহস্যজনক ঘটনা ছিল অমিতাভ কখনোই হৃষ্টপুষ্ট নয়, চেহারায় সে স্লিম। তাছাড়া তার বয়েস কখনোই ৩২ নয়, ২৪ বছর। তাছাড়া পোস্টমর্টেম করার আগে ও পরে মৃতদেহের ছবি তুলে রাখা একান্ত জরুরি, কিন্তু অমিতাভের ক্ষেত্রে তা হয়নি। আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মত, অমিতাভের মৃতদেহ পোস্টমর্টেম হবার পর আরও দুটি আনক্লেমড্ ডেড বডি পোস্টমর্টেম করা হয়েছে এবং রিপোর্টে সময় লেখা হয়েছে ৪-৪৫ মিনিট। ডাক্তার মহান্তির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি করে এত দ্রুত তৈরি করা যেতে পারে সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বালেশ্বর হাসপাতালের চিফ ডি·এম· ও ডাঃ ডি কে নন্দী, ডাঃ মহান্তির তৈরি করা রিপোর্ট বিষয়ে বলেন–অমিতাভ যে জলে ডুবেই মারা গেছেন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে তা প্রমাণিত হয় না। রিপোর্টে পেটের মধ্যে বালি কিংবা পাঁকের কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া এক্ষেত্রে যে যে রিপোর্ট থাকা জরুরি তার অধিকাংশই নেই।

বালেশ্বর (টাউন) থানার তদন্তকারী অফিসার বি এইচ দাস (এ এস আই) ২৭ তারিখের ঘটনার রিপোর্ট জমা দেন ২৮·৯·৮৭ তারিখে। রিপোর্টে লেখা হয়–অমিতাভ জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। অথচ বালেশ্বর থানার ও সি ৩·১০·৮৭ তারিখে অজয় বসুকে জানান–তদন্ত তখনো চলছে, তদন্তকারী অফিসার চাঁদিপুর গেছেন। এসে রিপোর্ট দেবেন।

ডি এস পি (ক্রাইম) বালেশ্বর ২৪·১০·৮৭ তারিখের একটি রিপোর্টে জানান–চারজন বন্ধু মিলে অমিতাভ ২৭·৯·৮৭ তারিখ সকাল ৬টা নাগাদ সমুদ্রে স্নান করতে যায়। হোটেলে ফিরে আসে ৭-৩০ নাগাদ। নোনা জলে স্নান করার পর মিষ্টি জলে স্নান করার জন্য হোটেলের পুকুরে নামে। সেখানে সাঁতার দেওয়ার সময় অমিতাভ জলে ডুবে যায়। যেখানে ডুবে যায় সেখানে জলের গভীরতা ছিল ৪ ফিট। অন্যপক্ষে বালেশ্বর থানার ২৮·৯·৮৭ তারিখের রিপোর্টে আছে–অমিতাভ জলে ডুবে ছিল সকাল ৬টায় আর যেখানে জলে ডুবেছিল তার গভীরতা ছিল ১০ ফিট। কিন্তু জলের গভীরতা ১০ ফুট কিংবা ৪ ফুট যাই হোক না কেন এই জলে অমিতাভের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি রহস্যজনক। অমিতাভ ভালো সাঁতার জানত।

ডি এস পি (ক্রাইম) বালেশ্বর ২৪·১০·৮৭ তারিখের একটি রিপোর্টে জানান–চারজন বন্ধু মিলে অমিতাভ ২৭·৯·৮৭ তারিখ সকাল ৬টা নাগাদ সমুদ্রে স্নান করতে যায়। হোটেলে ফিরে আসে ৭-৩০ নাগাদ। নোনা জলে স্নান করার পর মিষ্টি জলে স্নান করার জন্য হোটেলের পুকুরে নামে। সেখানে সাঁতার দেওয়ার সময় অমিতাভ জলে ডুবে যায়। যেখানে ডুবে যায় সেখানে জলের গভীরতা ছিল ৪ ফিট।

কলকাতার একটি সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের সার্টিফিকেটও অমিতাভের আছে।

ডাক্তার, পুলিশ ও অমিতাভের বন্ধুদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে ডাঃ অজয় বসু বিস্মিত হয়ে ডিটেকটিভ সংস্থা দিয়ে তদন্তের শুরু করেন। কলকাতার ইউনিভার্সাল সিকুরিটি ডিটেকটিভ এজেন্সি এবং ওড়িশার ডিটেকটিভদের তদন্ত রিপোর্টে বিচিত্র তথ্য বেরিয়ে আসে।

আনন্দময়ী হোটেলের কলকাতার এজেন্ট সুকান্ত হালদার ঘটনার পর রহস্যজনক ভাবে দীর্ঘ ন'বছর চাকরি করার পর আচমকা চাকরি ছেড়ে দেন। ২৭ তারিখ রাতে চাঁদিপুর থেকে চলে আসবার সময় সুকান্ত হালদার নিজ হাতে নিজের কলকাতাস্থ যে ঠিকানাটি অজয়বাবুর হাতে দেন খোঁজ নিয়ে জানা যায় সেই ঠিকানাটিও ভুল। আবার ২৭ তারিখ ৯টার সময় অমিতাভের বাড়িতে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য 'অমিতাভ হসপিটালাইজড্' বলে ট্রাংকল করার আগেই কলকাতা মেডিকেল কলেজের হাউসস্টাফদের 'বনফুল' হস্টেলের ২০ নং ঘরে অন্য দুই আবাসিক ডাঃ অচিন্ত্য আস আর ডাঃ স্বপন জানার কাছে চাঁদিপুরের আনন্দময়ী হোটেল থেকে অমিতাভের মৃত্যু সংবাদটি ট্রাংককলে জানায় অভিজিৎ দত্ত এবং তারক ব্যানার্জি।

ডাঃ অজয় বসুর কাছে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুধু গোপন করাই নয়, চাঁদিপুরে অমিতাভের ডাক্তার বন্ধুদের গতিবিধিও রহস্যময়। অমিতাভকে যখন ইন্দ্রনীল ও শুভাশিস হসপিটালে নিয়ে গেল তখন অন্যরা নিশ্চিন্তে হোটেলে বসেছিল। হাসপাতালেও একবার যায় নি। ইন্দ্রনীল একবার বলেছে অমিতাভ সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে তার আধঘন্টার মধ্যে আবার বলেছে হোটেলের পুকুরে ডুবে মারা গেছে।

বালেশ্বর ডি এস পি (ক্রাইম) শাখায় ২৪·১০·৮৭ তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ আছে হোটেলের পুকুরে সাঁতার কাটছিল চারজন, অন্যদিকে হোটেল স্টাফেদের বক্তব্য-পুকুরটিতে সাঁতার কাটছিল দুজন।

একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিল হোটেলের নেপালী এক দারোয়ান। তবে তার জবানবন্দীতে সে বলেছে, দুর্ঘটনার সময়ে বন্ধুটি কোনরকম চিৎকার করে নি। তারই চিৎকারে হোটেলের অন্যান্য লোক ছুটে আসে।

হোটেলের পুকুরে স্নান করা নিয়ে আনন্দময়ী কর্তৃপক্ষের বক্তব্যও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাদের কাছে অমিতাভের বন্ধুরা নাকি সাঁতার কাটার অনুমতি নিতে গিয়েছিল, কিন্তু তারা তা অনুমোদন করেনি। ২৭ তারিখ সকালে তাদের অনুমতি ছাড়াই দুই বন্ধু সাঁতার কাটতে যায়। অথচ ইন্দ্রনীল সহ অন্যরা বলে যে হোটেল কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমোদন নেবার পরই পুকুরে সাঁতার কাটতে গেছিল।

খড়দার বাড়িতে বসে ডাঃ অজয় বসু বললেন,

অমিতাভের বন্ধুরা যে চরম উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্থ সে বিষয়ে অজয়বাবুর মতে সন্দেহের কিচু অবকাশ চিল না। ২৭ তারিখে রাতে যখন খবর পেয়ে ডাঃ অজয়বাবুর দুই আত্মীয় হাসপাতালে পৌঁছন তখন তাদেরকে বলা হয় শ্মশানে মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে।

তাঁর কাছে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর আছে—ঘটনার আগের দিন রাতে অমিতাভের বন্ধুরা হোটেলের মধ্যে উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করে যার জন্য অমিতাভ রুম চেঞ্জ করে। অমিতাভ কোন নেশাই করত না। কিংবা তার চারিত্রিক কোন দোষও ছিল না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই তাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাতো। আসলে হাউস স্টাফদের হোস্টেল 'বনফুল'-এর পরিবেশে সে মানিয়ে নিতে পারছিল না। দশ বছর আগে অমিতাভের একমাত্র বোন একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর থেকেই সে ভীষণ একা হয়ে পড়ে। হোস্টেলের আবাসিকদের কোন গুপ্ত কীর্তির কথা হয়তো বা সে জেনে ফেলেছিল। সম্ভবত সেই কারণেই অমিতাভ বন্ধুদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে।

অমিতাভের বন্ধুরা যে চরম উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্থ সে বিষয়ে অজয়বাবুর মতে সন্দেহের কিছু অবকাশ ছিল না। ২৭ তারিখে রাতে যখন খবর পেয়ে ডাঃ অজয়বাবুর দুই আত্মীয় হাসপাতালে পৌঁছন তখন তাদেরকে বলা হয় শ্মশানে মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে। তাঁরা দুজন শ্মশানে গিয়ে দেখেন, সেখানে বন্ধুরা কেউ নেই। জ্বলন্ত চিতার পাশে একটি নতুন ধুতির উপর পড়ে আছে কয়েকটি খালি মদের বোতল আর সিগারেটের কিছু পোড়া ফিল্টার।

১১ নং জে কে চ্যাটার্জি রোডের বসু বাড়িতে সহসাই অন্ধকার নেমে এসেছে। অসহায় পিতামাতা যে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ১০ বছর আগে মেয়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ভুলেছিলেন, সেই একমাত্র সন্তানও আজ চোখের সামনে নেই। সেই অভিশপ্ত ২৭ সেপ্টেম্বর '৮৭-র ঘটনার পরেও তাঁদের স্থির বিশ্বাস তাঁদের একমাত্র ছেলে আজও বেঁচে আছে। অজয়বাবু নিজে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। তিনি সবিশেষ জানেন যে জলে ডোবা রুগীর কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করার ব্যবস্থা চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে। তাছাড়া সমুদ্রের নোনা জলে ডোবা রুগীকে দুর্ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বাঁচিয়ে তোলা যায়। নিজের সন্তানের রহস্যময় ঘটনার হদিশ পাওয়ার জন্য গভীর পড়াশুনো পর্যন্ত শুরু করেছেন ডাঃ বসু। তিনি একথাও জেনেছেন সমুদ্রের জলে ডুবে যাওয়া রুগী বেঁচে থাকলে ৭/৮ মাস অবধি স্মৃতিভ্রষ্ট থাকতে পারে।

অজয় বসু আদালতে লিখিত ভাবে আবেদন করেছেন যে, ইন্দ্রনীল সহ ছ' ডাক্তার বন্ধুকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ইন্দ্রনীল সহ অন্যান্যরাই ২৭ তারিখের দুর্ঘটনা-নাটকের কুশীলব। তারাই ডাঃ অজয় বসুকে মৃতদেহটি না দেখাবার কৌশল উদ্ভাবন করেন। শ্মশানে অমিতাভের মৃতদেহ বলে যে মৃতদেহটিকে পোড়ানো হয় আদৌ তা অমিতাভের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জেগেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ডেডবডির বয়স, স্বাস্থ্য এবং অমিতাভের বয়স ও স্বাস্থ্যের অসামঞ্জস্য তো আছেই।

ডাঃ অজয়বাবু তাঁর লিখিত অভিযোগে বলেন—"ইন্দ্রনীলের বাবা পান্নালাল ভট্টাচার্য ছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর প্রাক্তন সেক্রেটারি কিংবা ডেপুটি সেক্রেটারি। যার অদৃশ্য প্রভাবে অপরাধটির বিষয়ে সঠিক তদন্তের ধারাটি পরিচ্ছন্ন পথে সম্ভবত এগোতে পারছে না।"

তিনি আরও অভিযোগ তুলেছেন যে, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যই অভিযুক্তদের মুখ বন্ধ করে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সন্তানহারা পিতা-মাতা আজ একটিই মাত্র আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জে বি পট্টনায়ক, কেন্দ্রিয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং-এর কাছে—২৭ তারিখের রহস্যময় দুর্ঘটনার যথার্থ তদন্ত হোক। যেহেতু ঘটনাটি দুটি প্রদেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাই কেন্দ্রিয় গোয়েন্দা ব্যুরো দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তে আসল রহস্য প্রকাশ পাক। অমিতাভের মৃত্যু রহস্যে কোন অদৃশ্য প্রভাব আছে কি নেই সে অন্য কথা কিংবা শেষ অবধি মূল অপরাধী শাস্তি পাবে কি না সে প্রসঙ্গও সতন্ত্র। নিতান্ত মানবিকতা বোধে সন্তানহারা পিতা মাতার আবেদন অনুযায়ী যদি ঘটনাটির সত্যানুসন্ধান আধুনিকতম উপায়ে করা যায় তাহলে তাঁদের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে সামান্যতম শান্তির প্রলেপ পড়বে। কলকাতার মেডিকেল কলেজে সহকর্মীতে বিরোধ থাকতে পারে, বন্ধুত্বের চিড় ধরতে পারে বিশেষ কারণে, বন্ধু যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে না তাও নয়। হতেও পারে। একমাত্র নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই প্রকৃত রহস্যের উন্মোচন হওয়া সম্ভব। পুত্র হারা ডঃ বসু অভিযোগের আঙুল তুলেছেন রাজ্য প্রশাসনের বিগ হাউসের দিকে, কলকাতার মেডিলেক কলেজের ডাক্তারদের দিকে—এই সন্দেহেরও অবসান হওয়া দরকার। নতুবা অবিশ্বাস, অভিযোগ আর কুৎসার জল্পনা কল্পনা চলতেই থাকবে।

MORE CITIES

Pan Am can fly you to New York and to over 30 cities throughout the USA, including Los Angeles, San Francisco, Chicago, Miami, Dallas, Washington DC plus many other destinations.

MORE SERVICE

Pan Am flies only 747s from Delhi and Bombay. And every flight offers you three classes to choose from. And once you're aboard, you feel right at home because our flights feature Indian attendants, delicious Indian cuisine, as well as announcements made in both Hindi and English.

MORE CONVENIENCE

Connections to flights across America are quick and easy when you land at the Pan Am Worldport.® This is the only terminal at Kennedy Airport in New York that has all international and domestic flights right under one roof. It's as simple as one ticket, one check-in.

MORE EXTRAS

Pan Am offers First and Clipper® Class passengers free limousine service to and from midtown Manhattan. And once returning home, you'll enjoy the exclusive use of our new Private Terminal at Worldport. There you'll experience a level of comfort and personalized service reminiscent of a fine hotel.

So if you're looking for more on your next flight to the USA, that's just what you can expect from Pan Am.
For information and reservations call your Travel Agent or Pan Am in New Delhi at 3325222, 3327804; in Bombay at 2029048, 2029020

EXPECT MORE FROM PAN AM

এলাহাবাদের ঐতিহাসিক নির্বাচনের ফল কি সর্বভারতীয় রাজনীতির মোড় ঘোরাবে?

বিজয়ী বিশ্বনাথ প্রতাপ

গত একটি মাস শুধু ভারতবর্ষের নয় বিশ্বের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও মিডিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এলাহাবাদের দিকে। এই উপ-নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন শাসকপক্ষ আর বিরোধীপক্ষের প্রায় প্রত্যেক শীর্ষনেতা। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের এই বিজয় কি অতঃপর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চলেছে? সরজমিন পর্যবেক্ষণ সহ একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন পেশ করেছেন দীপ বসু।

১৬ তারিখ রাত থেকেই কংগ্রেসীপক্ষ পশ্চাপসরণ শুরু করেছিল। এলাহাবাদের চৌরঙ্গী সিভিল লাইনস-এ কংগ্রেসের বিশাল তোরণ খুলে ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল সেদিন বিকেলেই। তাঁদের কেন্দ্রিয় নির্বাচনী অফিস ঘিরে অন্ধকার, জনমনিষ্যির দেখা নেই। শুধু প্রার্থী সুনীল শাস্ত্রীর কার্ডবোর্ডে তৈরি বিশাল প্রতিকৃতিটি অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল একধারে। পি ডি ট্যান্ডন পার্কের সামনে সন্ধ্যের আলোয় ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে উল্টো করে রাখা কংগ্রেসের বিশাল বিশাল হোর্ডিংগুলো কারা যেন কোথায় ঠেলে নিয়ে চলেছে! আমার সঙ্গের ফোটোগ্রাফার রাজেন্দ্র গাড়ির বনেটের ওপর লাফিয়ে উঠে ক্যামেরা তাক করল, 'কামাল কি ফোটো আয়েগী, কাংগ্রেস উলট গয়া!'

সেদিন ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের রোদ্দুরে দিনভর আমরা ছুটে বেরিয়েছি নৈনী, মেজা, বারা, জশরা, শঙ্করগড়, সত্পুরা, করচনা আর এলাহাবাদ শহর। চোখে পড়েছে দেশী বিদেশী অসংখ্য প্রেসের স্টিকার আঁটা গাড়ি, আর বুথে বুথে অসংখ্য মানুষের ভীড়। ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় নৈনী এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের বুথে গিয়ে দেখি ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে, ব্যালট বক্সের তালা খোলা! সেই তালা বন্ধ হল আটটায়, প্রতিবাদ করার পর। রাস্তায় শঙ্করগড়ের কাছে গাড়ি থামিয়ে এক উর্ধ্বশ্বাস স্কুটার আরোহী

জনমোর্চা সমর্থকদের বিজয় মিছিল

ফোটো: ওয়াসিমুল হ

বিশ্বনাথ প্রতাপ ও দেবীলাল, এই বিজয় কি দেবীলালের ব্যক্তিগত বিজয়?

খবর দিলেন সত্পুরায় গত রাতে বন্দুক দেখিয়ে বুথ ক্যাপচার হয়েছে। নারীবাড়ি পুলিশ স্টেশন অবশ্য স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারলনা।

মধ্যপ্রদেশ হয়ে সত্পুরার পাহাড়ি রাস্তা, বিচ্ছিন্ন একটা গ্রাম। কয়েকজন ভয়ার্ত গ্রামবাসী বেরিয়ে এলেন, বললেন—সকালে ঐ অবস্থাতেই পোলিং শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে তা বাতিল হয়। ইতিমধ্যে এক জার্মান টেলিভিশন টিমের সঙ্গে এসে হাজির হলেন অরুণ নেহরু। এই কেন্দ্রে আবার ভোট নেওয়া হয়েছিল পরদিন।

দুপুরের দিকে নেওয়াদা—সোমরাগড় এলাকার বুথে গোলমাল চরমে ওঠে। নির্বাচন কমিশনের আপত্তি এড়িয়ে নাসায় আটক কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতিকারীকে ভোটের অব্যবহিত আগে মুক্তি দেওয়া হয় জেল থেকে! এদেরই একজন স্থানীয় মাফিয়া লিডার তুক্কল মহারাজের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বাহিনী আক্রমন চালায় এখানে, বুথ দখল করে। আমাদের চোখের সামনেই বেধড়ক গুলি চলে, গাড়ি ভাঙচুর হয়, (জনমোর্চার) বিধায়ক নরেন্দ্রপাল সিংহ আক্রান্ত হন, দেড়-দু'ঘন্টা ভোট বন্ধ থাকে।

বারা বিধানসভা কেন্দ্রের গড়সিয়া-খুর্দ এলাকায় নীল পতাকার নীচে কয়েকজন রুক্ষ শুষ্ক মানুষ, মুখ চুন করে বসে। বহুজন সমাজ পার্টির এই গরীব মানুষগুলো জানালেন, তাঁদের কাউকেই ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। লালউ ভগবান দীন নামের অপুষ্ট চেহারার লোকটি বলে উঠলেন, 'সাহেব, রেডিও টি-ভি-তে আমাদের কথা কেউ বলবে না, আপনারাই কিছু লিখুন।' কিছু দূরে এগিয়ে চোখে পড়ল 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর বিদ্যা সুব্রহ্মণীয়মকে ঘিরে ধরেছে একদল কংগ্রেসী ভলান্টিয়র। ছোটোখাটো চেহারার এই তরুণী সাংবাদিক বললেন, তিনি রিগিং-এর কিছু প্রমাণ জোগাড় করতে পেরেছেন। বিদ্যাকে গাড়িতে তুলে দেবার আগে পেছন থেকে আওয়াজ এল, 'আপলোগ ঝুট লিখতে হ্যায়। আভি ইহাঁসে চলে যাইয়ে···'। কিন্তু আগাগোড়াই যে জনতার মধ্যে একটা সচেতনা, একটা প্রতিবাদী ভাব দেখা গেছে সেটা আর এবার 'ঝুট' ছিলনা। মিথ্যে ছিলনা 'ভি-পি-লহর'ও।

হরিয়ানা থেকে আসা গ্রীন ব্রিগেড

ফোটো: ওয়াসিমুল হক্

কংগ্রেস (ই) প্রার্থী সুনীল শাস্ত্রী: দেবতার আশীর্বাদই ভরসা!
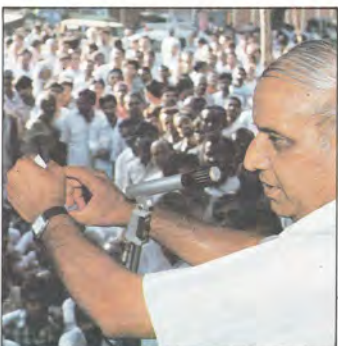
বহুজন সমাজ পার্টির কাঁশিরাম, উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ

ফোটো: ওয়াসিমুল হক্

১৮ তারিখ রাত নটা। কালেক্টরেটের সামনে গিসগিস করছে জনতা। জনমোর্চার গোলাপী কুর্তা, হরিয়ানা থেকে আসা সবুজ কুর্তা আর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে হলুদ শার্টের স্বেচ্ছাসেবকেরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। পুরো একটি রাত বিনিদ্র পাহারা দিয়েছেন তাঁরা ব্যালট বক্সগুলিকে। হঠাৎ বাঁধভাঙা উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ল চারধারে, গণনা শেষ। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ বিজয়ী হয়েছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৪৬ ভোটে। কংগ্রেস (ই) প্রার্থী সুনীল শাস্ত্রী পেয়েছেন ৯২,২২১ ভোট, বহুজন সমাজ পার্টির কাঁসিরামের পক্ষে ভোট ৬৮,৮৩৬।

গোলাপী আবির, জয়ধ্বনি আর মুঠো মুঠো মিষ্টি বিলোনোর সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে পটকার আওয়াজ। এলাহাবাদের জনতার ঐতিহাসিক রায় মেনে নিতে কংগ্রেসের কোন নেতাই তখন আর শহরে নেই!

অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশমের সমর্থক বাহিনী এলাহাবাদের রাস্তায়

এলাহাবাদের নির্বাচনী ইতিহাস ও জাতিগত সমীকরণ

বর্তমান উপ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এলাহাবাদে মোট দশবার লোকসভা নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে একমাত্র ১৯৭৪ ও ১৯৭৭ এই দুবার ছাড়া এই আসনটি কংগ্রেসের দখলেই থেকেছে। তবে ১৯৮৪তে অমিতাভ বচ্চনের ক্ষেত্রেই একমাত্র কংগ্রেসী বিজয় প্রায় দু লক্ষ ভোটের ব্যবধান ঘটেছে (অমিতাভ হারিয়েছিলেন হেমবতী নন্দন' বহুগুণাকে), অন্য প্রতিবারই নির্বাচন ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। ১৯৫২তে জহরলাল নেহরু এই আসনে জেতেন ৩১,৮৭১ ভোটের ব্যবধানে। এরপর ১৯৫৭ ও ১৯৬২ এই দুবারই এখান থেকে নির্বাচিত হন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তাঁর এই জয় ছিল যথাক্রমে ৫৬ হাজার ও ৬৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে। ১৯৬৭তে নির্বাচিত হন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মেজ ছেলে হরিকিষণ শাস্ত্রী মাত্র ১৪,৫৪৪ ভোটের ব্যবধানে। বর্তমানে কংগ্রেসের বিপক্ষে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এর আগে আরও দুবার। ১৯৭৭ এ তিনি জনতা প্রার্থী জনেশ্বর মিশ্রের কাছে পরাজিত হন। বিজয়ী হন ১৯৮০র নির্বাচনে। কংগ্রেস প্রার্থী সুনীল শাস্ত্রীর পরিবার এই আসনে এনিয়ে মোট চার বার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন। এর আগের তিনবারই তাঁর পরিবারের সদস্যেরা এখান থেকে নির্বাচিত হয়ে গেছেন লোকসভায়। কিন্তু এবার আর বিজয় সহজসাধ্য ছিল না। এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছেও এই ঘটনাটি ছিল খুব স্পষ্ট।

১৯৮৪র ২৪ নভেম্বর অমিতাভ বচ্চন যখন কংগ্রেসী প্রার্থী হয়ে এলাহাবাদের নির্বাচনী সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন ছিল ইন্দিরা হত্যার অব্যবহিত পরের 'সহানুভূতি লহর'। সেই স্রোতে রুপোলি পর্দার নায়কের মতই অমিতাভ বেরিয়ে এসেছিলেন নির্বিকল্প বিজয়ী হয়ে। কিন্তু এবার প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল হাওয়া 'সত্তা'–র উল্টোদিকে বইছে। বিশ্বনাথ সমর্থকদের স্লোগান এলাহাবাদ শহর আর গ্রামগঞ্জ ছেয়ে

বিশ্বনাথ প্রতাপের সমর্থনে গ্রামে গঞ্জে ভাষণ দিয়েছেন এন টি রামা রাও

ফেলেছে–'রাজা নহী ফকীর হ্যায়। দেশ কা তকদীর হ্যায়।'

উত্তরভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের প্রশ্নটি সবসময়েই বড় হয়ে দেখা দেয়। মূলত পাঁচটি জাতিভিত্তিক বিভাজন হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ, ঠাকুর (রাজপুত), কায়স্থ ও বেনে, মুসলমান, হরিজন ও অনুন্নত বর্গ। মূলত উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে ব্রাহ্মণবাদ ও ঠাকুরবাদ এই দুটি জাতিগত 'বাদ' সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। ১৯৮৪র নির্বাচনে অমিতাভ বচ্চন প্রার্থী হওয়ার পর 'কায়স্থবাদ'ও একটা মুখ্য ফ্যাকটর হয়ে দাঁড়ায়। এবারের প্রার্থী সুনীল শাস্ত্রীও কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত (লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পৈতৃক পদবী শ্রীবাস্তব। কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে তিনি সংস্কৃতে 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন)। একটা মোটামুটি হিসেব করলে এবারের উপনির্বাচনে এলাহাবাদের ভোটার সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় ছিলেন ব্রাহ্মণেরা–১ লক্ষ ৩৮ হাজার, ও হরিজনেরা ১ লক্ষ ৯১ হাজার। শহরে কায়স্থ ভোট ৬০ হাজার ও ঠাকুর ভোট ৫৬ হাজার। এছাড়া ভোটারদের মধ্যে ৮৫ হাজার মুসলমান ও ৮১ হাজার আহীর (যাদব) ভোটারও ছিলেন। সাড়ে আট লক্ষ ভোটারের মধ্যে এই সংখ্যাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নগণ্য মনে হলেও, এই ভোটগুলি একইসঙ্গে একজন প্রার্থীর পক্ষে পড়ে বলে সংখ্যার হেরফের দাঁড়ায় অনেকটাই।

এলাহাবাদে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃত্বের সঙ্গে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

এলাহাবাদের মোট ১১টি লোকসভা নির্বাচনে ব্রাহ্মণ প্রার্থীরা জেতেন পাঁচ বার, কায়স্থ প্রার্থীরা চার বার (শাস্ত্রী পরিবার থেকে তিন বার, একবার অমিতাভ বচ্চন), এবং ঠাকুর প্রার্থী বিজয়ী হন দুবার (দুবারই প্রার্থী ছিলেন বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ)।

কসমোপলিটনিজম তথা নগর–মানসিকতা ও শিল্পোদ্যোগ বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস না থাকার দরুন, এছাড়া সামন্ততান্ত্রিক ইতিহাসপরম্পরায় বিবর্তিত হওয়ার দরুন উত্তর ভারতীয় রাজনীতি এখনও মূলত জাতপাতকেন্দ্রিক। হরিজন ও মুসলমান শ্রেণীর ভোটদাতাদের কংগ্রেসী ভোটব্যাঙ্ক বলেই মনে করা হত এতদিন। কিন্তু হরিজন ভোটদাতাদের একটা বিশাল অংশ স্বাধীনতার পর এই চল্লিশ বছরেও কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছ থেকে আশানুরূপ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এবারের নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টির কাঁশিরাম জাতিগত সংবেদনশীলতায় যেভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন তাতে কংগ্রেসের চিরাচরিত ভোট ব্যাঙ্কের একটা বড় অংশ গেছে বহুজন সমাজ পার্টির পক্ষে। এছাড়াও কাঁশিরাম যেভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা হরিজন ও সংখ্যালঘু (মুসলমান ও খৃস্টান)দের উপর একাধিপত্য ও শোষণের অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন জনসভায় ও তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহারে, তাতে মুসলমান ভোটারদের কিছু অংশ ভোট দিয়েছে বি এস পি–র হাতি চিহ্নে। কুর্মী-যাদব শ্রেণী যদিও ঠাকুরদের সমর্থক, তবু ঠাকুরদের চেয়ে এরা অনেক পিছিয়ে পড়া জাতিবর্গ। এদেরও কিছু ভোট গেছে কাঁশিরামের পক্ষে।

কংগ্রেস এবার এলাহাবাদে কায়স্থ ভোটের ব্যাপারে ছিল নিশ্চিত। এলাহাবাদ-উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটিতে মূলত কায়স্থদের সংখ্যাধিক্য। অমিতাভ বচ্চন নির্বাচিত হবার পর রাজ্যের রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেভাবে কায়স্থবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা নিশ্চিতপক্ষে উৎসাহিত করেছিল কায়স্থবর্গকে। সুনীল শাস্ত্রীর প্রার্থীপদ তাদের সামনে আরেকটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। অতএব কায়স্থ ভোটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কংগ্রেসী নেতৃত্ব এবারের নির্বাচনী প্রচারে জোর দিয়েছিল ব্রাহ্মণ ভোট আদায়ে। প্রবীণ কংগ্রেসী কমলাপতি ত্রিপাঠী অশক্ত শরীর নিয়ে ছুটে এসেছিলেন এলাহাবাদে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে পার্টিতে তরফ থেকে নির্বাচনী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের 'ব্রাহ্মণ' কংগ্রেসী নেতাদের নামে। শহরের বিভিন্ন 'ব্রাহ্মণ' ছাত্রনেতা-চন্দ্রাবলী ত্রিপাঠী, রাজেন্দ্র মিশ্র, ওম প্রকাশ ত্রিপাঠীর পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে তরুণ ভোটদাতাদের কাছে রাজীব গান্ধীর হাত মজবুত করার আহ্বান জানান হচ্ছিল।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের পক্ষে ঠাকুর ভোট ছিলই। কিন্তু খুব একটা খোলাখুলিভাবে জাতপাতের প্রশ্ন তাঁর নির্বাচনী প্রচারে অবশ্য কখনই ওঠেনি। তাঁর নির্বাচনী প্রচার ছিল মুখ্যত ইস্যুভিত্তিক। কংগ্রেসী নেতৃত্বের উচ্চতম স্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদি ভঙ্গিটি জাতপাতের সীমা ডিঙিয়ে 'ঢেউ' তুলতে সক্ষম হয়েছে। তবু প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বিশ্বনাথ প্রতাপও জাতপাত–এর গুরুত্বটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে গিয়ে তিনি এমনভাবে নির্বাচনী ভাষণ দিয়েছেন যাতে ব্রাহ্মণ্যগর্ব ভোটারদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঠাকুরদের তো নীতিগত বিরোধ কোনদিনই ছিল না। আগে ব্রাহ্মণেরা জয়টিকা পরিয়ে রাজপুত (ঠাকুর) রাজাদের পাঠাতেন সংগ্রামক্ষেত্রে। তিনি আশীর্বাদ চাইতে এসেছেন। বিশ্বনাথপ্রতাপ যে মোটর সাইকেলটির পেছনে চড়ে (১৯৭৯ মডেলের বুলেট) গ্রামে গঞ্জে তাঁর নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন সেটি প্রথমদিকে চালিয়েছেন এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কংগ্রেসী ছাত্রনেতা শিরোমণি শুক্লা। কিন্তু শেষের দিকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর চালকেরা তাঁকে মোটরবাইকে নিয়ে ঘুরেছেন।

মুসলিম মহিলা বিল–নিয়ে বিতর্কে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করার পর প্রগতিপন্থী আরিফ মহম্মদ খান ছিলেন 'বিদ্রোহী' বিশ্বনাথ প্রতাপের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এলাহাবাদের নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে চোখেই পড়েনি। এর প্রচ্ছন্ন কারণ নিশ্চয়ই মুসলমান ভোট হারানোর ভয়। এরপর জনতাপার্টির নেতা ও বাবরি মসজিদ এ্যাকশন কমিটির প্রধান সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ও জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি এলাহাবাদে এসে বিশ্বনাথ প্রতাপের পক্ষে সভা করেন। মোরাদাবাদ থেকে আসা মুসলিম নেতারা মোরাদাবাদ দাঙ্গায় (বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই দাঙ্গা হয়) ভি·পি· সিং–এর সেসময়ে নিরপেক্ষ ও কার্যকরী ব্যবস্থাগ্রহণের প্রশংসা করেন বিভিন্ন সভায়। রামধন, রামবিলাস পাসোয়ানের মত নেতারা হরিজন ভোটারদের কাছে বিশ্বনাথপ্রতাপকে সমর্থনের আবেদন জানান। তবু এলাহাবাদের এই উপনির্বাচনী বিরোধীপক্ষের প্রচারে জাতপাতকে প্রাধান্য কখনই দেওয়া হয়নি। বরং বোফোর্স, জার্মান সাবমেরিন, সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এইসব প্রসঙ্গই ঘুরে ফিরে এসেছে, এমনকি দূরদুর্গম গ্রামেগঞ্জেও। গ্রামের লোকজন এখন পয়সাকড়ি নিয়ে গণ্ডগোলের স্থানীয় ঘটনা ঘটলেই বলছে 'পয়সউয়া বোফোর্স হোই গবা' (পয়সা বোফোর্স হয়ে গেছে)। ইস্যুভিত্তিক নির্বাচন ভি পি সিং–এর ক্ষেত্রে জাতপাতকে ছাপিয়ে গিয়েছে এটা তাঁর বিপুল বিজয় থেকে স্পষ্ট।

'রাজা মান্ডা' ও শাস্ত্রী পরিবার

১৯৮০তে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে এই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহই সুনীল শাস্ত্রীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এর আগে সুনীল ছিলেন ব্যাঙ্কের কর্মচারী। ভি·পি· তাঁকে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

কংগ্রেস (ই) সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গোলাম নবী আজাদ

ভি·পি· সিংহের সমর্থনে কমিউনিস্টেরা

আর এই সবই ছিল শাস্ত্রী পরিবারের প্রতি বিশ্বনাথের গভীর অনুরাগের নিদর্শন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর এই ২২ বছরে কংগ্রেসী নেতৃত্ব কবার স্মরণ করেছেন তাঁকে সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অথচ বিশ্বনাথ প্রতাপ তাঁর পরিবারের পূর্বতন 'রাজা' মাণ্ডাতে 'লালবাহাদুর শাস্ত্রী সেবা নিকেতন' স্থাপন করেছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী নামে যে ট্রাস্ট রয়েছে বিশ্বনাথ প্রতাপ তারও একজন ট্রাস্টি। এলাহাবাদ শহর, যেখানে হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রায় সব সরকারী প্রতিষ্ঠানই নেহরু পরিবারের কারোর না কারোর নামাঙ্কিত সেখানে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের এই প্রয়াস অবশ্যই ব্যতিক্রমী উদাহরণ। যমুনা নদীর উপর নির্মীয়মান যে শাস্ত্রী ব্রীজ তারও শিলান্যাস করেছিলেন প্রাক্তন জনতা প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অসুস্থা স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বনাথের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ ও শুভেচ্ছার কথা জানিয়েছেন। শাস্ত্রীজী বিশ্বনাথকে তাঁর 'পঞ্চম পুত্র' বলে মনে করতেন। দুই দশকেরও বেশি সময় যে স্লোগান শোনা যায়নি, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সেই স্লোগান 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ এবার শোনা গেছে মুহুর্মুহু। শিবিরগুলিতে পাড়ায় পাড়ায়। বেজেছে ক্যাসেটবদ্ধ গান, 'লাল বাহাদুর কা লাল ভোট মাঙ্গনে আয়া হ্যায়। ইনহে জিতাকর ইলাহাবাদ কা গৌরব তুমহে বাড়ানা হ্যায়।'

এই ব্যক্তিগত পারিবারিক সৌহার্দের দরুনই যখন কংগ্রেস পক্ষ থেকে প্রস্তাব ওঠে যে শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীকে এলাহাবাদের আসনে কংগ্রেস প্রার্থী করা হোক, তখন বিশ্বনাথও জানান যে সেক্ষেত্রে তিনি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হবেন না। শেষ পর্যন্ত সুনীল শাস্ত্রী ও বিশ্বনাথ প্রতাপ দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হলেও কারোর বিরুদ্ধে কেউই কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। কংগ্রেসী রাজ্য নেতৃত্বের তরফ থেকে দলত্যাগী, 'বেইমান' ভি·পি· সিংহের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হবার জন্য সুনীলের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করা হলেও সুনীল কিন্তু কখনই বিশ্বনাথ প্রতাপের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। বিশ্বনাথ প্রতাপ বা বিরোধী নেতৃত্ব যাঁরা তাঁর সমর্থনে প্রচারে নেমেছিলেন তাঁরাও কংগ্রেসী শাসন ও কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আনলেও সুনীল শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণ শানাননি। বিশ্বনাথ প্রতাপ তাঁর নির্বাচনী প্রচারে নামার আগে দিল্লিতে যান শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীর আশীর্বাদ নিতে। এলাহাবাদে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তিতে মালা পরিয়ে। ২২ তারিখে রাতে দিল্লিতে শাস্ত্রী পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ।

মাণ্ডাতে বিশ্বনাথ প্রতাপ বিজয়ী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে রাজপুত প্রথায় আঙ্গুল কেটে একদা রক্ততিলক পরিয়েছিলেন। নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়া শুরু হতেই শাস্ত্রীজীর চার ছেলে এলাহাবাদ ছেড়ে দিল্লি রওনা হয়ে গেলেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ যে

বিশেষ প্রতিবেদন

ভাষণরত মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংহের সঙ্গে একই সভায় স্থানীয় মাফিয়া লিডার গুম্ফশোভিত ভুক্কল মহারাজ

ললিতাজীর আশীর্বাদ নিতে দিল্লি গিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এবার আশ্বস্ত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন পরলোকগত শাস্ত্রীজীর 'আত্মা'ও! শহরজুড়ে মাইকে মাইকে তার যে নাম ঝালাপালা করে বাজছিল বাইশ বছর পরে, তা আবার নিশ্চুপ। রাজনীতির পরিহাস এমনই ১৯৭১ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পুত্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মীরাটে, তখন বিশ্বনাথ প্রতাপ কংগ্রেসে। আজ দাবার ছকটাই পুরো গেছে বদলে।

মনোনয়ন দাখিল নিয়ে নাটক

২৩ মে এলাহাবাদের উপ নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ। সঙ্গে এসেছিল বিশাল মোটর সাইকেল বাহিনী। কাছারি (কালেক্টরেট)—এর সামনে তখন থিকথিক করছে ভিড়। খবর ছিল অমিতাভ বচ্চনই আসছেন ভি·পি· সিংহের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে। সেদিন এলাহাবাদে হাজির ছিলেন উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও এলাহাবাদ উপ নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত গোপীনাথ দীক্ষিত সহ হরেক দপ্তরের মন্ত্রী, রাজ্যের দূর দূরান্তের এম এল এ—রা। এলাহাবাদে পুলিশ সুপার ডি পি সিং—কে প্রশ্ন করতে তারিক্কি চালে জানালেন, তাঁর কাছে খবর আছে অমিতাভ আসছেন, দিল্লি থেকে। লক্ষ্ণৌ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিং—ও এসে পৌছোচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। খবর পেয়ে বমরৌলি এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে গেলেন পুলিশ—এর বড়-মেজ কর্তারা, কংগ্রেসী নেতারা, অমিতাভ বচ্চন ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনের রবি বধওয়ান সহ অজস্র কংগ্রেসী ও অমিতাভপ্রেমী। বেলা আড়াইটে নাগাদ বমরৌলিতে যে প্লেনটি এসে থামল তা থেকে বেরিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিং, তাঁর পেছনে পেছনে কেন্দ্রিয় জনকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী ও তাঁর ছেলে অশোক বাজপেয়ী। অমিতাভ সমর্থকদের মুখ কালো হয়ে গেল। কারণ অশোক বাজপেয়ী শুরু থেকেই অমিতাভ বচ্চনকে এলাহাবাদে প্রার্থী করার ঘোরতর বিরোধী।

তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে 'হাইডেল রেস্ট- হাউস' থেকে দলবল নিয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে এলেন সুনীল শাস্ত্রী। কে·পি· তিওয়ারি সহ উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের মুখ গেল শুকিয়ে। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল, 'সুনীল শাস্ত্রী ওয়াপস যাও। অমিতাভ বচ্চন কো লেকর আও।' 'বীরবাহাদুর মুর্দাবাদ।' মনোনয়নপত্র দাখিলের পর মুখ্যমন্ত্রী সুনীল শাস্ত্রীকে নিয়ে কাছারির সামনের ডায়াসে উঠে আসেন। সেখানেই মঞ্চের ওপর ঘুঁষোঘুঁষি শুরু হয়ে যায়। এক মোক্ষম ঘুঁষিতে ছিটকে পড়েন কে পি তিওয়ারি। মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুরকে ধাক্কা মেরে মঞ্চের ওপর ফেলে দেন কেউ। কংগ্রেস সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকেরা মুখ্যমন্ত্রী আর সুনীল শাস্ত্রীকে ঘিরে কর্ডন তৈরির চেষ্টা করেন। হুড়োহুড়িতে একসময় মঞ্চটা ভেঙে পড়ে। কাছ থেকে কেউ একটা মোষকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে মঞ্চের দিকে, 'বীর বাহাদুর ক্যায়সা হো। গোরখপুরকা ভৈসা হো।' উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংহের

রাজনৈতিক ক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলা।

রাতে বিশ্বনাথ প্রতাপ হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন, কারণ তিনি আগেই বলেছিলেন—অমিতাভ বচ্চন দাঁড়ালে, তবেই তিনি এলাহাবাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। সিভিল লাইনস এলাকার অশোক রোডে ভি পি সিংহের বাংলো 'আয়েশ মহল'—এ বিদ্যাচরণ শুক্লা, রামধন, দেবীলাল তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন তিনি সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী। 'অমিতাভ ভাগ গয়া', কিন্তু যাঁকে ময়দান ছাড়লে চলবে না, কারণ এ লড়াই দুর্নীতিবাজ কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদলের সম্মিলিত লড়াই। এই সম্ভাবনাও ব্যক্ত করা হল যে সুনীল শাস্ত্রী 'ডামি ক্যান্ডিডেট'। ২৬ তারিখ, যেদিন মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন তার আগে সুনীল তাঁর প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নেবেন, ময়দানে আসবেন 'শাহানশাহ' অমিতাভ বচ্চন।

২৬ তারিখ মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনেও যখন অমিতাভ এলেন না তখন ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশন বম্বেতে ফোন করার পর সুনীল শাস্ত্রীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে আরও খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় ২০ তারিখ রাতে অমিতাভ রাজীব গান্ধীর সঙ্গে নৈশভোজ সারেন। মধ্যরাত পার হয়েও তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে। ১৭ তারিখ অমিতাভ বিদেশ যান, এবং কুড়ি তারিখে দেশে ফিরে আসেন। এর আগে কেন্দ্রিয় সরকারের চারটি গুপ্তচর সংস্থা এলাহাবাদের ভোটারদের মানসিকতা নিয়ে গোপন অনুসন্ধান চালায়। এতে প্রকাশ পায় যে অমিতাভ দাঁড়ালে তাঁর হারার সম্ভাবনা সর্বাধিক, সব মিলিয়ে ৩০ শতাংশ ভোটও তিনি পাবেন কিনা সন্দেহ। এলাহাবাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আগে থেকেই এলাহাবাদ ঘুরে গিয়েছিলেন শ্রীপত মিশ্র, তরুণকান্তি ঘোষ, পি এন সুকুল, জীতেন্দ্র প্রসাদ। এঁরা রাজীব গান্ধীকে জানান, জনমনে তো অমিতাভের ভাবমূর্তি খারাপ হয়েই আছে, স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও অমিতাভ নির্বাচন প্রার্থী হলে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হবেন। তাঁরা আরও জানান ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনের নামে একটি অরাজনৈতিক সংস্থা সেক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসী রাজনৈতিক সংগঠনের রাজনৈতিক পদ্ধতিটিকে গৌণ করে দেবে। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংও চাইছিলেন না, অরাজনৈতিক কোনও ফিল্মওয়ালা প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু হবার সুবাদে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে খবরদারী করুক। গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সবদিক থেকে তথ্যবিস্তৃতিতে বাধ্য হয়ে রাজীব গান্ধী ঠিক করেন—এলাহাবাদে অমিতাভকে আর নয়। পরিবর্তে প্রার্থী কে হবেন এই প্রশ্নে শ্যামসুরৎ উপাধ্যায় ও সুনীল শাস্ত্রী এই দুটি নাম বিবেচিত হয়। শেষপর্যন্ত রায় সুনীল শাস্ত্রীর পক্ষেই যায়। কারণ সুনীলের পিতা লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও মেজ ভাই হরিকিষণ শাস্ত্রী মোট তিনবার এই আসনটিকে এনে দিয়েছেন কংগ্রেসের পক্ষে।

অমিতাভ বচ্চন বেচারা বম্বের সাহার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে 'লীলা পেন্টা' হোটেলে দুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশায়। কারণ ২২/২৩ তারিখে তাঁর কাছে খবর ছিল—শেষপর্যন্ত হয়ত তাঁকেই এলাহাবাদে প্রার্থী করা হবে।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা দাঁড়ায় মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংহের। গতবছর জুলাই মাসে এই সুনীল শাস্ত্রীকেই দুর্নীতি আর অক্ষমতার অভিযোগে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করেছিলেন তিনি। প্রত্যুত্তরে সুনীল শাস্ত্রী তাঁকে অভিহিত করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ ও 'নাকাম' মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু হাইকম্যান্ডের আদেশ শিরোধার্য। অতএব মুখ্যমন্ত্রী ম্লান হাসি হেসে বলেন, 'ভইয়া, রাজনীত মে ই সব চলথৈ' (ভাই, রাজনীতিতে এ সবই চলে)।

নির্বাচনী প্রচার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ নির্বাচন প্রার্থী হন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। তিনি শুরুতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে চাইলেও বিরোধী নেতারা এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলেন না। বিশ্বনাথ কংগ্রেসের বিপক্ষে লড়তে
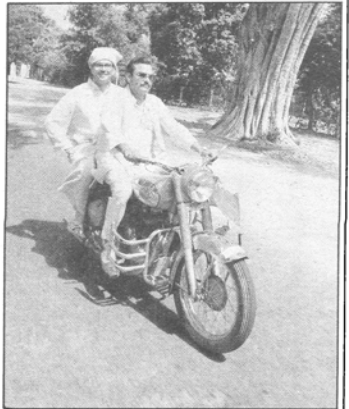
দ্বিচক্রবাহনে নির্বাচনী প্রচারে বিশ্বনাথ প্রতাপ

অস্বীকার করার অর্থ বিপক্ষের কংগ্রেস বিরোধী লড়াইয়ের ময়দানে কংগ্রেসের ওয়াক ওভার পেয়ে যাওয়া। তাঁরা বিশ্বনাথকে বোঝালেন, 'অব লড়াই ফ্রিফ শাহানশা সে নহী রহ গয়া। অভী তো লড়াই খুদ শাহ সে' (এখন আর লড়াই 'শাহানশাহ' ফিল্মের নায়কের বিরুদ্ধে নয়, লড়াই এখন খোদ দেশের শাহেব (রাজীবের) বিরুদ্ধেই)।

কংগ্রেসীরা স্লোগান তুলল, 'শত্রু ফাঁসা শিকঞ্জে মেঁ/মোহর লাগেগি পাঞ্জে মেঁ' (শত্রু ফেঁসেছে ফাঁদে/ভোট লাগবে হাতে)।

মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর কাছে এই নির্বাচনের ফল গিয়ে দাঁড়াল তাঁর অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে। উল্লেখ্য যে এলাহাবাদের লোকসভা ছাড়াও রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্র ছাপরৌলি আর টাণ্ডাতেও হেরেছে কংগ্রেস (ই)। সুনীল শাস্ত্রীর প্রার্থীপদ ঘোষিত হতেই এলাহাবাদের উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর হবার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ সীতারাম কেশরী এলাহাবাদে এলেন ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার নির্বাচনী বাজেট সঙ্গে করে।

খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভাগুলিতে ভাষণের বয়ান দাঁড়াল এইরকম—

'ম্যায় আপকো বাতানো চাহতা হুঁ কি অগর আপকে লিয়ে কোই কুছ কর সক্‌তা হ্যায় তো ওহ সরকার হ্যায়, কুছ দে সক্‌তা হ্যায় তো ওহ সরকার হ্যায়, অগর সরকার সে কোই কাম করবা সক্‌তে হ্যায় তো ওহ কংগ্রেস (ই) কা প্রতিনিধি ইয়া এম·পি। কিঁউকি সত্তা কংগ্রেস কী হ্যায়।' অপরদিকে দেওয়ালে বিরোধী পক্ষের লেখা চোখে পড়তে লাগল।

'ইয়ে ভারত হ্যায় ভারতওয়ালো কা
নাহিন শ্বশুর অউর শালো কা।'
(এদেশ ভারতবাসীর/শ্বশুর আর শালাদের নয়।)

'তখৎ বদল দো তাজ বদল দো/বেইমানো কা রাজ বদল দো।'

বিশেষ প্রতিবেদন

(সিংহাসন বদলে দাও, মুকুট বদলে দাও/বেইমানদের শাসন বদলে দাও।)

নির্বাচন ঘোষিত হবার পর যখন এলাহাবাদের গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলি, তখনই বোঝা গিয়েছিল অমিতাভের বিরুদ্ধে জনতার উষ্মা প্রকট। জনৈক চাষী বললেন, 'অমিতাভ ঈহাঁ ফিল্মী কলাকারী দিখায়ে গয়ন। বায়দে তো বহুত কিহিন, লেকিন মুহো নায় দিখায়ন, অওর অবহি তো রাজনীত ছোড় দিহিন।' (অমিতাভ এখানে ফিল্মি সংযাত্রা দেখিয়ে গেছে। প্রতিশ্রুতি তো অনেক দিয়েছিল, কিন্তু মুখই দেখা যায়নি তার। আর এখন তো রাজনীতিই ছেড়ে দিয়েছে।)

বীরবাহাদুর সিংহের সম্পর্কে এইসব প্রতিক্রিয়াও শোনা যেতে লাগল গ্রামবাসীদের মুখে।

'বীরু উস্তাদ কহিন এঁহ্‌ করি, 'ওঁহ্‌ করি। বাত মে ঝুট কা ফুল বনা দেহিওঁ।' বীরবাহাদুর বলছেন তো এ করব, সে করব। কথা দিয়েই মিথ্যের ফুল বানাচ্ছেন)।

বিরোধী পক্ষ থেকে দেবীলাল, অজিত সিংহ, চন্দ্রশেখর, এন টি রামা রাও, সমর মুখার্জি, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, অটলবিহারী বাজপেয়ী, রামকৃষ্ণ হেগড়ে, রাজেশ্বর রাও, পি উন্নিকৃষ্ণন, দত্তা সামন্ত, পি উপেন্দ্র সহ বাঘা বাঘা সব বিরোধী নেতাই এলাহাবাদে ছিলেন মজুত। কংগ্রেস পক্ষে প্রায় সব কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সহ কংগ্রেসের কেন্দ্রিয় নেতৃত্বেরও প্রায় পুরোটাই। রাজীব গান্ধী ছাড়া তাঁর মন্ত্রীসভার আর কোনও সদস্য এলাহাবাদে অনুপস্থিত ছিলেন কিনা সন্দেহ। ২৬ তারিখের পর থেকে গত তিন সপ্তাহ এলাহাবাদের অনেক এলাকার লোকজনই রাতে ঘুমোতে পারেননি। দিন নেই রাত নেই পাড়ার মাইকে ঘুরে ফিরে বাজছে একই গান।

'···বিশসূত্রী কার্যক্রমোঁ কো আগে হমেঁ বঢ়ানা হ্যায়,
নবযুবক নেতা সুনীল শাস্ত্রী কো বিজয়মাল্য পহনানা হ্যায়।'
কিংবা,
'ইলাহাবাদ কে ভৈয়া বহনী শুনলো হমরী বাতেঁ,
পঞ্জা তো হ্যায় দোনোঁ হাথ।
রাজীব ভাইয়া সুনীল কহিয়া অবকী আয়ে হ্যায়ে সাথ,
হোনহার বীরওয়ান কে হোত চিকনে পাত।'

সুন্দর ভাবে সিনথেসাইজ করা এরকম কংগ্রেসী গানের ক্যাসেট নাকি পঞ্চাশ হাজার তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ দিল্লির কোনও মিউজিক-স্টুডিওতে।

ভি·পি· সিংহ যখন ১৯৭৯ মডেলের বুলেট মোটরসাইকেলের পেছনে মাথায় ফেট্টি বেঁধে বসে শহরের আনাচে কানাচে, গ্রামে এলাহাবাদের ৪৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন শহরের অলিতে গলিতে কংগ্রেসীরা ক্যাসেট বাজাচ্ছেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী আর সুনীল শাস্ত্রীর ছবিওয়ালা পোস্টার লাগাচ্ছেন, তেরঙ্গা তোরণ তৈরি করছেন, কোনও গলির ভেতরের ছোট্ট নির্বাচনী অফিসে বসে কেউ ঘামতে ঘামতে বলছেন, "অমিতাভউয়া হোতে তো দো চার পত্থা অওর লাগবা দেতে।"

কিছুদিন পর থেকে অবশ্য বিরোধী পক্ষের শিবিরেও প্রচার তুঙ্গে ওঠে যখন দেবীলাল, এন টি রামা রাও আর জনতা পার্টি ও বি জে পি–র কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব বিশ্বনাথ প্রতাপের সমর্থনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

চণ্ডীপাঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় ব্রহ্মা দিলেন ব্রহ্মাস্ত্র, শিব দিলেন ত্রিশুল, বিষ্ণু দিলেন গদা···র মত দেবীলাল আর এন টি রামা রাও দিলেন কয়েক লক্ষ পোস্টার, সবুজ কুর্তা আর হলুদ শার্টের ক্যাডারবাহিনী, জনতা পার্টি, লোকদল আর ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের সহযোগিতা।

জায়গায় জায়গায় তোলা হল গোলাপী রঙের সব তোরণ। কোনওটার নাম 'বোফর্স গেট', কোনটা 'ফেয়ার ফ্যাকস গেট', কোনটা 'পনডুব্বি (সাবমেরিন) গেট'। কলকাতা ও কর্ণাটক থেকে এলেন অঙ্কন আর মূর্তিশিল্প বিশারদেরা কার্টুন আর মাটির তৈরি শয্যাচালা কিষাণের প্রতিমূর্তি তৈরি করতে।

স্থানীয় বিরহা (লোকগীতি) গায়কদের দল ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় অবধীতে গানের ক্যাসেট তৈরি করল। যেন রাজীব গাইছেন,

সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এলাহাবাদের দিকে

'অরে হায়-হায় রাজা মাণ্ডা
তৈনে ফোড়া মেরা ভাণ্ডা।'

(হায় হায় মাণ্ডার রাজা (বিশ্বনাথ প্রতাপ), তুমি আমার হাঁড়ি হাটে ভেঙে দিয়েছ।)

কখনও পরিচিত গানের সুরে, 'আজ দেশ কী জনতা সারী, হর্মে বাতায় চোর/চলো ভাগ চর্লে ইটালি কে ওর।...'

স্থানীয় পাইকারী বাজার কাটরা আর চৌকের ব্যবসায়ীরা নিজেদের উদ্যোগে বাঁশ কাগজ আর কাপড় দিয়ে তৈরি করল বোফোর্স গেট, জার্মান সাবমেরিন...।

শুরুতে বিশ্বনাথ প্রতাপ যেভাবে বলেছিলেন তিনি কংগ্রেসী 'ধন-আধারিত' রাজনীতি' (ধনকেন্দ্রিক রাজনীতি)র পরিবর্তে 'জন-আধারিত' রাজনীতি' জনতা কেন্দ্রিক রাজনীতি)কেই তাঁর নির্বাচনী প্রচারে জোর দেবেন। তার পুরোটা আর হল না, দুটো মিলেমিশে গেল।

তবু বিশ্বনাথ প্রতাপ নিজে থেকে প্রায় কিছুই খরচ করেননি। তাঁর পূর্বতন রাজমহল 'মাণ্ডা কুঠি' বা এলাহাবাদের 'আয়েশ মহল'-এর সঙ্গীন দশা দেখেই বোঝা যায় বিশ্বনাথ নিজে থেকে পয়সা খরচ করার অবস্থায় নেই। প্রচারের টাকাপয়সা কোত্থেকে এসেছে তা আগেই বলেছি। আর শুরু থেকেই বিশ্বনাথের পক্ষে আগাগোড়াই একটা কংগ্রেসবিরোধী হাওয়া দেখা গেছে এবার সর্বত্র। বারা, মেজা, করচনা, ঘুরে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি নির্বাচনের আগের ১৫ দিন। প্রায় আশি-শতাংশই বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা 'রাজা' কে সৎ বলেই মনে করেন। নির্বাচনের দিন নারীবাড়ি পুলিশ আউটপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে জনৈক গ্রামবাসী বললেন, 'সাহাব, আপনি যা বলছেন সব ঠিক, ভি·পি·আর কংগ্রেস কেউই আমাদের অবস্থা রাতারাতি ফেরাতে পারবে না। কিন্তু মানুষ যখন 'নারাজ' হয়ে যায়—তব কুছ ভি কর বৈঠতে। আপনি জানেন আমাদের এলাকার এম·এল·এ—র মুখ পর্যন্ত এখনও অনেকে দেখেনি।'

কোথাও কোথাও স্লোগান উঠেছে,
রাজা নহী আঁধী হ্যায় আজ কী গাঁধী হ্যায়।'

(বিশ্বনাথ প্রতাপ) রাজা নন—ঝড়, তিনি আজকের গান্ধী।

বহুজন সমাজ পার্টির কাঁশিরামের প্রচার অবশ্য ছিল পুরোপুরিই তীব্র জ্বালাময়ী, উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে। এলাহাবাদের সিভিল লাইনসের 'তাওসি' হোটেলের ৬টি বাতানুকুল কামরা ভাড়া নিয়ে তাঁর নির্বাচনী অফিস। শহর আর সন্নিহিত গ্রামের আনাচে কানাচে তাঁর নীল পতাকাবাহী সাইকেল বাহিনী যেখানেই খালি দেওয়াল পাচ্ছে নীল রঙের হাতি এঁকে বেড়াচ্ছে। পাঞ্জাবের রোপড় জেলার খাওয়াসপুর গ্রামের কাঁশিরাম 'ঠাকুর বামন কায়থ চোর। বাকি সব ডি এস ফোর (বহুজন সমাজ পার্টির আরেকটি নাম)' স্লোগান নিয়ে 'হরিজন আর মসলমান সংখ্যালঘুদের ওপর বর্ণহিন্দুদের কায়েমী শোষণ আর অত্যাচার'—এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সভায় সভায়। হরিজন মহল্লায় 'এক ভোট এক নোট'—এর চাঁদা আদায় অভিযান করেছেন। মুসলমানদের বুঝিয়েছেন তাঁকে জেতালে রামজন্মভূমি—বাবরি মসজিদ বিতর্ক মিটিয়ে বাবরি মসজিদ তাঁদের হাতে তুলে দেবেন। এমন বিস্ফোরক ভাষণও দিয়েছেন—অত্যাচারিত শ্রেণীর লোকেদের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের। সতবন্ত সিং মনে করেছিল যে অপারেশন ব্লু স্টার করে ইন্দিরা গান্ধী তাদের সংখ্যালঘু শ্রেণীর ওপর অবিচার করেছেন। সে প্রতিশোধ নিয়েছে।...

প্রতিরক্ষা বিভাগের পুনাস্থিত বিস্ফোরক সংক্রান্ত ল্যাবরেটরীর প্রাক্তন কর্মী কাঁসিরাম তীক্ষ্ণ জাতিবাদ বিস্ফোরক ভিত্তিক প্রচার চালিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি।

রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী বলেছিলেন—এলাহাবাদের মোট ভোটার সংখ্যার ২৩ শতাংশ হরিজন। কাঁশিরাম নিজে হরিজন না হয়েও তাঁদের উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় যেভাবে অবতীর্ন হয়েছেন তাতেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন জয় সম্ভব নয়। তাই সাম্প্রদায়িক ভাবনার সৃষ্টি করে মুসলমানদের টানতে চেয়েছেন স্বপক্ষে।

প্রতিবারের মতই এবারও হেরেছেন কাঁসিরাম। কিন্তু কোনওরকম রাজনৈতিক মতাদর্শ আর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছাড়াই এই স্বয়ম্ভু নেতা পেয়েছেন ৬৮,৮৩৬ ভোট। ১৯৮৪—এর এলাহাবাদ লোকসভার নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থীর পাওয়া ১৭৬০ ভোটের ৫০ গুণ।

এলাহাবাদে 'কলকাতা'!

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে নির্বাচনপ্রার্থী জেমস কালাহানের পক্ষ থেকে পোস্টার ছাপানো হয়েছিল বাংলায়। এলাহাবাদের এবারকার লোকসভা উপনির্বাচন অবশ্য বাংলায় ছাপা কোনও পোস্টার চোখে পড়েনি, তবে কংগ্রেস (ই) বা জনমোর্চা (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) উভয়ের পক্ষ থেকেই কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপা হয়েছিল বাংলায়।

'এলাহাবাদের ভোটারদের মধ্যে বাঙালি ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এই সংখ্যাটি খুব একটা নগণ্য নয়। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে বাঙালিরা যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জনৈক বাঙালি নির্বাচিত হয়েছিলেন, এই তথ্যটি হয়তো অনেকেই জানেন না। সুচেতা কৃপালনী সেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্যের পুলিস ইনসপেকটর জেনারেল (পি সি লাহিড়ী) থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে ছিলেন বা আছেন বাঙালিরা। এলাহাবাদে বাঙালির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। বহু পরিবার বেশ কয়েকপুরুষ ধরে এখানে বসবাস করে উত্তরপ্রদেশ নিবাসীই গেছেন। এলাহাবাদ শহর মুখ্যত বিশ্ববিদ্যালয় আর হাইকোর্ট কেন্দ্রিক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, শহরের কলেজগুলিতে বাঙালি অধ্যাপকেরা একসময় ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নিযুক্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বাঙালি অধ্যাপক। আদালতেও বাঙালিরা একসময় ছিলেন গরিষ্ঠসংখ্যায়, এখনও আছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্তমান চিফ জাস্টিস অমিতাভ ব্যানার্জি। চিকিৎসকের পেশায়ও বাঙালি এখানে রয়েছেন বহুসংখ্যায়। এছাড়াও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও (বাঙালিদের যেক্ষেত্রে কিছুটা দুর্নাম অন্যত্র রয়েছে) বাঙালিরা এলাহাবাদে অগ্রগণ্য। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও রয়েছেন লোকদলের জি·সি· ভট্টাচার্য বা যুব কংগ্রেসের অমিতাভ মুখার্জির মত নেতারা।

তবু এবারের নির্বাচনেই বোধহয় প্রথমবার বাঙালিদের একটি আলাদা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে ভোট চাওয়া হল। ১৯৮৪-র নির্বাচনে অমিতাভ পত্নী জয়া বাঙালি ভোটারদের ভোট প্রার্থনা করেছিলেন, তবে বাঙালি সেন্টিমেন্ট-এ এমনভাবে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়নি সেবার।

এবার কংগ্রেসের পক্ষে বাঙালি ভোটারদের সমর্থন আদায়ে পশ্চিমবাংলা থেকে এলাহাবাদের নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, অজিত পাঁজা আর মমতা ব্যানার্জী। এছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সন্তোষ মোহন দেব। সাউথ মালাকা, মীরাপুর, ট্যাগোর টাউন,

১০৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

৩৪ পৃষ্ঠার পর

কি অবস্থা হত কে জানে। পুলিশ তল্লাস চালিয়ে বথামের ফ্ল্যাট থেকে নেশাকারক মারিজুয়ানা পায় আর এই অভিযোগে তাকে ১০০ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয়। ড্রাগ নেওয়ার কথা নিজের মুখে স্বীকার করায় তাকে দু'মাসের জন্য ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট দল থেকে সাসপেণ্ড করা হয়। বথাম একদিকে যেমন পৃথিবীর সেরা এক অলরাউণ্ডার। অন্যদিকে তেমনি তার মত ডাকাবুকো মানুষ অনেক কম দেখা যায়। নিজের ইচ্ছে মতন চলেন, লোকলজ্জার পাত্তা দেন না, কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে যেমন একটুও দ্বিধা করেন না, তেমনি বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য অথবা অসুস্থ অসহায় মানুষদের সাহায্য করতেও তিনি সবার আগে এগিয়ে আসেন।

আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিজের মনমতো না হলে ক্রিকেটের অনেক অধিনায়ক আর খেলোয়াড়দের মেজাজ হারাতে দেখা যায়। গত পাক ইংল্যাণ্ড সিরিজে পাকিস্তানের কুখ্যাত আম্পায়ার শকুর রানা আর মাইক গ্যাটিং–এর মধ্যে অশ্লীল বাক্য বিনিময় হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ভিভিয়ান রিচার্ডসকে গত ভারত সফরে বেশ কয়েকবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আম্পায়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। যে কোন ভাবে জেতার অসম্ভব প্রতিযোগিতার জন্য আজকাল খেলোয়াড়রা খেলোয়াড়চিত ভদ্রতা হারিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভদ্র ব্যবহারের জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনেক সুনাম কুড়িয়ে এসেছেন কিন্তু ইদানিং কিছু তরুণ ক্রিকেটারকে হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় চেতন শর্মার। বেশ কয়েকবার বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার বচসা হয়েছে। একবার অস্ট্রেলিয় উইকেটকীপার টিম জোহরারের সঙ্গে মাঠের মধ্যেই মারপিট হবার উপক্রম হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এক দর্শককেও পিটিয়ে ছিলেন তিনি। স্টীল ট্রফির খেলায় মনিন্দর সিং আর মনোজ প্রভাকরের মারামারি এইরকমই আর একটি দৃষ্টান্ত। দর্শকের ব্যবহারে মনসংযোগের ব্যাঘাত হলে সুনীল গাভাসকারেরও মাথা গরম হয়ে যেত। বর্তমান ভারতীয় অধিনায়ক রবি শাস্ত্রীও গুয়াহাটিতে ভি আই পি স্ট্যাণ্ডে বসে থাকা মহিলা দর্শককে অশ্লীল গালাগালি করতে পিছপা হন নি। যা নিয়ে সরকারি পর্যায়েও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল। হাজার হাজার দর্শকের সামনে ক্রিকেট স্টারদের এই ধরনের অভব্যতা উঠতি খেলোয়াড়দের সামনে বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

খেলার দুনিয়ায় সবচেয়ে মাথা গরম খেলোয়াড় কে এ প্রশ্ন করলে সবাই একবাক্যে উত্তর দেন–জন ম্যাকেনরো। ম্যাচের সময় আম্পায়ার, লাইন্সম্যান, দর্শক, সাংবাদিক কেউ তার গালিগালাজ থেকে রেহাই পান না। পান থেকে চুন খসলেই তার মাথা গরম। র‍্যাকেট ছুঁড়ে ফেলা, অশ্লীল গালিগালাজ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি এসব ম্যাকেনরোর প্রত্যেকটি ম্যাচেই দেখা যায়। অভব্য

জাভেদ মিয়াঁদাদ

আয়ান বথাম

আচরণের জন্য কতবার যে তাকে টেনিস জগত থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, জরিমানা হিসাবে যে কত হাজার ডলার দিয়েছেন তার হিসেব রাখাই মুসকিল। আর শুধু যে অন্যদের সমালোচনা করেন তাই নয়, ম্যাচের সময় নিজেকেও নিজে গালি দিয়ে যান উচ্চস্বরে। উইম্বলডনের ১১২ বছরের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র চ্যাম্পিয়ন যাকে টুর্নামেন্টের শেষে নৈশ ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় নি তার অভদ্র ব্যবহারের জন্য। টেনিস কোর্টে ম্যাকেনরোর বদ মেজাজকে কেউ বলেন পাগলামি কেউ বলেন ছেলেমানুষী। লাইন্সম্যানের কল তার বিপক্ষে গেলে লাইন্সম্যানকে উপদেশ দেন–'হাঁ করে গ্যালারীর দিকে মেয়ে না দেখে কোর্টের দিকে তাকাও।' আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তার মনমতো না হলে জিজ্ঞেস করেন 'কাল রাত্রে ভোজটা একটু বেশি হয়েছিল নাকি?' গ্যালারীতে কোন বয়স্কা দর্শকের আওয়াজ তার কানে এলে খেলা বন্ধ করে তাকে জানিয়ে দেন 'ওল্ড এজ হোম'এর ঠিকানাটা। খেলার সময় মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে গেলে বল ছুঁড়ে মারেন দূর আকাশে প্লেনকে লক্ষ্য করে।

বিচিত্র টেনিস দুনিয়ার অনেক খেলোয়াড়কেই খেলার সময় মাথা গরম করতে দেখা গেছে। হাজার হাজার দর্শকের আর ক্যামেরার সামনে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াই চালিয়ে যান ঘন্টার পর ঘন্টা। কোন কোন ম্যাচ চার পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত চলে। ক্রমশ বেড়ে ওঠে টেনশন। এ অবস্থায় অনেকেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। ইলি নাস্তাসে, জিমি কোনর্স, নাভ্রাতিলোভা, হেলেনা সুকোভা অনেক টেনিস তারকাই টেনিসকোর্টে মেজাজ হারিয়েছেন এজন্য তাদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে অথবা জরিমানা দিতে হয়েছে কিন্তু জন ম্যাকেনরো, বদমেজাজের যা রেকর্ড রেখে গেলেন তা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে সর্বকালের একজন সেরা হওয়া সত্ত্বেও ম্যাকেনরো প্রশংসার চেয়ে নিন্দা কুড়িয়েছেন বেশি। টেনিস জীবনের এই শেষ বেলায় মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আবার টেনিসের এক নম্বর হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছেন জন ম্যাকেনরো, কিন্তু ইতিমধ্যে টেনিস কোর্টে তার চেঁচামেচি যেমন কমেছে তেমন শ্লথ হয়েছে তার ভয়ংকর সার্ভ। পিছনে ছেড়ে আসা এক নম্বরে আবার পৌঁছনো তার পক্ষে মুশকিল।

'ওকে বোঝাবার চেষ্টা কোর না খালি দেখে যাও। ও সবাইকে আনন্দ দেয়। ও মানুষের ক্রিকেটার। তারা ওকে ভালবাসে আমিও তাই করি' ক্রিকেটের সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র ইয়ান বথাম সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন পৃথিবীর সেরা ব্যাটস্‌ম্যান ভিভিয়ান রিচার্ডস। এই কথা শুধু বথাম নয় এই রকম রাগী বিতর্কিত বর্ণময় জিনিয়স সব খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ এদের ব্যবহার না পছন্দ করতে পারেন; কিন্তু এদের যোগ্যতাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই। এরা কি যৌবনের প্রতীক? যারা পুরনো চিন্তাভাবনা ভাবধারাকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছেমতন চলতে চায়। কোন কিছু মনোমত না হলে কোন খেলোয়াড় কেন বিদ্রোহ করে? কেউ চিৎকার করে প্রতিবাদ করে, আর কেউ শান্তিভাবে মেনে নেয়। কেন এমন হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর মনস্তত্ত্ববিদরা দিতে পারবেন। খেলা মানে তো খালি জয়-পরাজয় নয়। খেলার মাধ্যমে মানবিক গুণের বিকাশ আর চরিত্রগঠনও। সেখানে খেলোয়াড়রা খেলার মাঠে অভদ্রতা দেখালে খেলার প্রতিযোগিতা নীতিশাস্ত্রহীন রাস্তার লড়াই–এর পর্যায়ে নেমে আসে।

ছবি। বিমল সাক্সেনা

১০২ পৃষ্ঠার পর

বেরানা প্রভৃতি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় এঁরা প্রচার চালিয়েছেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে এর প্রভাব হয়েছে উল্টোটাই। স্থানীয় বাঙালিরা এখানে এখন আর নিজেদের আলাদা জাতি হিসেবে গণ্য করাতে চান না। হিন্দি ভাষাকে তাঁরা পড়াশুনোর মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধার স্বার্থে। সংস্কৃতিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও জীবনের প্রতিটি পর্বে তাঁরা চলেছেন উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে। রেডিও স্টেশন থেকে শুরু করে রেলওয়ে স্টেশনের ঘোষক, হিন্দি সংবাদপত্রের কর্মী প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের জায়গা দখল করে নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবেই। এক্ষেত্রে জাতপাতের প্রশ্ন তুলে পরোক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের ভাবনা থেকেই যে উঁকি দেবে না আসাম-বিহার বা উড়িষ্যার মত সম্ভাবনা—সে কথা কে বলতে পারে! এছাড়া স্থানীয় বাঙালিরা এক জ্যোতি বসু ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার নামের সঙ্গে তেমন পরিচিতও নন। খুব একটা উৎসাহিতও নন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ব্যাপারে। সেক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি ও প্রিয়রঞ্জনের এই প্রথম এলাহাবাদ সফর স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে কতটা কংগ্রেসী প্রভাব ফেলতে পেরেছে তা সন্দেহের।

বিরোধীপক্ষ কিন্তু এই প্রবৃত্তিতে আগাগোড়াই ছিল সচেতন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের পক্ষে এলাহাবাদে প্রচারে এসেছিলেন অশোক সেনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের জনমোর্চা-র নেতারা। তাঁরা কিন্তু তাঁদের বক্তৃতায় কোনও বাঙালি সেন্টিমেন্ট রাখেননি। ভাষণ দিয়েছেন হিন্দিতে এবং শহরের যে কোনও এলাকায়-গ্রামে গঞ্জে। সি পি আই (এম)-এর পক্ষ থেকে এসেছিলেন সমর মুখার্জি, সইফুদ্দিন চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন নেতা। এঁদের প্রচারও ছিল ইস্যুভিত্তিক। এঁরা মূলতঃ ভাষণ দিয়েছে ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকদের জমায়েতে, গ্রামে ও নৈনীর শিল্পক্ষেত্রে। এলাহাবাদ লোকসভার অন্তর্গত মেজা ও বারা বিধান সভা ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট পকেট।

নির্বাচনী ফল ও সর্বভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশের ভূমিকা বোধহয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভা আর রাজ্যসভায় সর্বাধিক পরিমাণে সাংসদ পাঠায় এই রাজ্য। এখন পর্যন্ত মোরারজি দেশাইকে বাদ দিলে আর সব প্রধানমন্ত্রীরই রাজনৈতিক ক্ষেত্র এই উত্তরপ্রদেশ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একসময় বলেও ছিলেন, 'উত্তর প্রদেশ ইজ ইন্ডিয়া'। কথাটার মধ্যে কিছুটা অত্যুক্তি থাকলেও অসারতা নেই। এলাহাবাদের এবারের উপ-নির্বাচন সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশকে আরেকবার নির্ণায়ক ভূমিকায় এনে দিল।

ভারতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দক্ষিণপন্থী বি জে পি, বা কট্টরপন্থী মুসলিম মজলিশ, 'বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি' থেকে শুরু করে সি পি আই (এম), সি পি আই, অতি বাম দল ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট একযোগে নির্দলীয় প্রার্থী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের পক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরোধিতায়। তাদের সামনে ছিল একটিমাত্র ইস্যু 'দুর্নীতিবাজ' কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পর একমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি নৈতিক দায়িত্ব মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ ত্যাগ করেছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পক্ষে এটা ছিল একটি রেল দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া, আর বিশ্বনাথের পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসনের উচ্চতর মহলের দুর্নীতি আর 'দুষ্টাচার'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ।

অমিতাভ বচ্চনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করাটা বিশ্বনাথ প্রতাপের প্রথম বিজয়। তাঁর দ্বিতীয় বিজয় ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি বিরোধী দলের তাঁর পক্ষে সক্রিয় হওয়ার ঘটনা। সেক্ষেত্রে তাঁর এই বিজয় বিরোধী দলগুলিরও সম্মিলিত বিজয়। কারণ বিশ্বনাথ প্রতাপ তাঁর দল 'জনমোর্চা'র হয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হননি, হয়েছেন বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে। ভারতীয় রাজনীতির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগত প্রকরণ সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যা তা হল প্রতিস্পর্ধী বিরোধী দলের অভাব। ফলে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েও কংগ্রেস কেন্দ্রে তার একচ্ছত্র শাসন চালিয়ে গেছে। বাকি ৬৫ শতাংশ ভোটদাতার আশা আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত কিছু সময় ছাড়া সবসময়েই থেকে গেছে অপ্রতিফলিত। তবু একের পর এক রাজ্য বেরিয়ে গেছে কংগ্রেসের হাত থেকে। দক্ষিণের সব কটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার।

এইসব দিক ধরলে বিশ্বনাথ প্রতাপের এই বিজয় কংগ্রেসী রাজনীতির মূলে একটা বড়সড় আঘাত। কংগ্রেসী নেতৃত্ব এতদিন জোর গলায় বলে এসেছে—কংগ্রেস ছেড়ে যে-ই এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে সেই শেষ হয়ে গেছে! বিশ্বনাথ মুখের উপর জবাব দিয়েছেন ১,১০,২৪৬ ভোটে জিতে।

কিন্তু প্রশ্ন হল বিশ্বনাথ প্রতাপের সমর্থনে বিরোধীদের এই ঐক্য কতটা মজবুত? সি পি এম কি সহজে বি জে পি-র সহাবস্থানকে মেনে নেবে? রামনন্দের হাওয়ায় ভেসে গিয়েও কি অতটা 'আত্মিক চণ্ডাল' ভাবে গদ গদ হতে পারবে ভারতের কম্যুনিস্ট দলগুলি!

আর হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবীলাল যেভাবে বিশ্বনাথের সমর্থনে বিশাল ভাবে এগিয়ে এসেছেন তা কি একটা দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে না, লোকদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নিজেকে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী করে বহুগুণাকে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কায়দায় অপিনিহিত করে দেওয়া। যে ঘটনার পর উত্তরভারতের শক্তিশালী কৃষক বাহিনীর একচ্ছত্র নেতা হিসেবে তিনি হবেন সম্ভাব্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ দাবিদার। চরণ সিংহ তনয় অজিত সিংহ জনতায় বিলীন। চরণ সিং পরলোকগত। এন টি আর কিংবা জ্যোতি বসু সর্বভারতীয় নেতৃত্বের দাবিদার হতে পারেন না। জনতার রামকৃষ্ণ হেগড়ের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের 'প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা'তো এখন প্রকাশ্যেই। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহও জনমোর্চার পতাকাতলে নির্বাচিত হননি। তাঁর জনমোর্চার সঙ্গীরা খুব একটা যে পরিপক্ক রাজনীতিক তাও নয়, এক অরুণ নেহরুকে বাদ দিলে। অতএব ভারতীয় রাজনীতির 'প্রাজ্ঞ' (সোজা কথায় ধাঁধু) রাজনীতিকেরা ভি-পি-সিং-কে তাঁদের উচ্চাশার পথে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করবেন না সে নিশ্চয়তাই বা কোথায়? কিন্তু কংগ্রেসী পক্ষের গোলাম নবী আজাদ, সীতারাম কেশরী, বীরবাহাদুর সিংহের মত নেতাদের দেখলেই বা এখন কি মনে হয় যে এরা দেশকে আর এগিয়ে নিয়ে যাবার দুঃসাহস আস্থা রাখতে পারেন।

তবে সব মিলিয়ে এই উপ-নির্বাচন একটা জিনিসকে স্পষ্ট করে দিয়েছে তা হল জনতার ঐক্যবদ্ধ মানসিকতার প্রকাশ। ১৬ জুন এলাহাবাদের দুর্গম গ্রামে গঞ্জে ঘুরেও দেখেছি জনতার মধ্যে সচেতনতাকে। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ঘোমটায় ঢাকা গ্রাম্য বধূও স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন, 'আমি জানি আমি ভোট দিলেই গরীবি দূর হয়ে যাবে না।

ইব্রাহিমপুরের এক গ্রামীণ কৃষক বললেন, 'বোফর্স জানি না বাবু, কিন্তু এখানে এম এল এ-রা একবার নির্বাচিত হয়ে আর আমাদের মনে রাখে না

এই সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে কাঁশিরামের পক্ষে হরিজন ভোটারদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যার সমর্থনেও। এতদিন তাঁদের শুধু মূক ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই দেখে এসেছে বিভিন্ন দল। এবার কাঁশিরামের মত একজন স্বয়ম্ভু, স্পষ্ট পরিচয়হীন নেতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তাঁদের হতাশা আর উচ্চাশার প্রতিফলন।

কংগ্রেসী নেতৃত্বের চল্লিশ বছর, প্রাক-স্বাধীনতাপর্বের কংগ্রেসী ভাবমূর্তির প্রতি অভিভূত অবস্থাটাকে মুছে দিতে পেরেছে। অন্ধ অনুসরণের পথ ছেড়ে জনতা যে সচেতনার যৌক্তিকতার অনুগামী হয়েছে দিনের পর দিন, ভারতীয় রাজনীতির এইটেই সবচেয়ে আশাবাদী লক্ষণ। যাঁরা ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবকিছু বিচার করেন, তাঁদের কাছে ভি-পি-সিংহের বিজয় অনেক অনাস্থার সম্ভাবনার আভাস অবশ্যই দিতে পারে। কিন্তু একটি আভাস স্বতঃই স্পষ্ট—মানুষ পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষী। এই উপ-নির্বাচনের ফল তাই অনেক শুভফল প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। আর ইতিহাস তো পরিবর্তনের ধারা-প্রবাহেরই সমষ্টিগত রূপ।

ফোটো: [illegible]

অনুপম সাজে সজ্জিত করুন আপনার জীবনধারা
স্বকীয়তায় উজ্জ্বল
রাজ এন্ড রাজ ফার্নিচার

Regd. NO. AD-212 ALOKPAAT
Lic. NO. U/AD-1 July 1988
RNI NO. RN 42171/86
Rs. 6.00 Per Copy

চুষে নিন, চেটে নিন, বেশ করে ফেটান, খেয়ে নিন...

...নয়ত একনিশ্বাসে ঢকঢক করে খান

এই নিন রসনা-র এক নতুন উপহার,
যা সফ্ট ড্রিঙ্কের চেয়েও আরো মজাদার—
শাহী গুলাব, কুল খস্, কেশর এলাচি,
আর ম্যাঙ্গো রাইপ —রসনার চারটি প্রিমিয়াম
স্বাদগন্ধ যাতে আপনি তৈরী করতে পারেন
ফেনাওয়ালা মিল্ক শেক, মুখরোচক
আইসক্রীম, স্বাদেভরা লস্যি। একেবারে
সেই তেষ্টা মেটানো রসনার মতই মজাদার।

আজো হ্যাঁ, রসনার এই চারটি প্রিমিয়াম
স্বাদগন্ধ পরখ করে দেখুন না!
প্রাণ ভরে রসনা খান, খাওয়ান...
পান করুন, পান করান!

রসনা প্রিমিয়াম স্বাদগন্ধ

- শাহী গুলাব
- কুল খস্
- কেশর এলাচি
- ম্যাঙ্গো রাইপ

ভা র তে র-স ব চে য়ে-বে শি-বি ক্রী র
স ফ্ট-ড্রি ঙ্ক-ক ন সে ন ট্রে ট